




মকতুবাতে

মাসুমীয়া



হজরত

খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রহঃ)

হে আমাদের প্রতিপালক,
তুমিতো কোনো কিছুই সৃষ্টি করেনি অনর্থক।
তুমিই পবিত্র। আমাদের পরিত্রাণ দাও তোমার অসঙ্খ্যের আজীব থেকে।

– সূরা আলে-ইমরান

মকতুবাতে মাসুমীয়া

মূলঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম
সেরহিন্দী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আনিসুর রাহমান

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ ।

মকতুবাতে মাসুমীয়া
[প্রথম খণ্ড]

প্রকাশক :

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া
ভুইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণ :

শওকত প্রিন্টার্স

১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।

মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭

০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ :

আব্দুর রোউফ সরকার

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ ইং

তৃতীয় প্রকাশঃ আগস্ট, ২০০৮ ইং

বিনিময় : আশি টাকা মাত্র।

MUKTUBATE MASUMIA: The selected sacred letters of Hazrat Khwaza Mohammad Masum (Rh.) translated into Bengali by Anisur Rahman and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk. 80/- U.S.\$ 10.00

ISBN 984-70240-0024-5



সে আলোর বিকিরণ ছড়িয়ে রয়েছে সবখানে—
রওনক তার রওশন করে দূর আসমানে ।
জেগে ওঠে প্রতি-ধূলিকণা সারা বিশ্ব-চরাচরে-
সে আলোর খোঁজে ছুটে আসে মখলুক সবভুলে,
তৃষিত হৃদয় করে পান জন্ম জন্ম প্রাণ ভরে—
আলোর ইশারা ওঠে জেগে জীবনের কুলে কুলে/
কোকাক্ষ আঁধারে সে কিরণ ভীষণ আঘাত হানে
সে আলোর বিকিরণ তিমির-হনন সবখানে ।

সে আলোর বিকিরণ জড়িয়ে রয়েছে সবখানে
জীন্দেগির পরতে পরতে বিশ্বাসে আর বিধানে/

আঁধারের ভয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘোর অমানিশা নাশি-
হাজির হয়েছে সুবে-সাদেকের পবিত্রতা আসি,
বেরিয়ে এসেছে দীপ্ত তেজ কুয়াশার বাঁপ খুলি
দেখা যায় ঐ দিক-দিগন্ত চেয়ে আছে মুখ তুলি/
সওদার ভারা উঠিছে ভরিয়া ইশকের টানে-
সে নূরের জ্যোতিঃ পৌছে গেছে হৃদয়ের সবখানে/

সে আলোর দ্যুতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে
সেরহিন্দ নয়, হিন্দুস্তান নয়-তামাম জাহানে/



প্রবৃত্তিপীড়িত পৃথিবীবাসীদের আরোগ্য-অভিযানে সঠিক নেতৃত্ব যঁারা দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরাই নবী এবং রসুল-অন্য কেউ নয়। জীবনকে পূর্ণ নিরাময় করতে পেরেছিলেন তাঁরাই, যঁারা ছিলেন তাঁদের সফল অনুকারক। নিষ্ফলতায় নিমজ্জিত হয়েছে বিরুদ্ধবাদীরা। প্রকৃতপক্ষে নবী রসুলদের জ্যোতির্ময় আদর্শের বিরুদ্ধাচরণকারীরাই যুগে যুগে ডেকে এনেছে পৃথিবীতে জীবনবিমুখতার দীর্ঘ দৃষ্টান্ত বার বার। তবু থেমে থাকেনি এই মহাঅভিযান আজো। হজরত আদম আ. থেকে শুরু শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ স. পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিলো যে জীবন-শুশ্রূষার সংগ্রাম- তার ধারাবাহিকতা বহমান এখনো। মহানবী মোহাম্মদ স. এর উম্মতগণের মধ্য থেকে দ্বীনদার আলেম এবং কামেল পীর দরবেশরা এখনো করে চলেছেন এই দুর্বীর অভিযানের সফল সেনাপতিত্ব। নবী করিম স. এর এই সব উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত এ অভিযান চলবে। চলবেই।

পতনের পথের পথিকগণ, থামুন। ভেবে দেখুন একটি বারের জন্য- কী বিস্তার ব্যবধানে সরে এসেছি আমরা সত্য পথ থেকে। অনিকেত জীবন থেকে ফিরে আসবার সময় হয়নি কি এখনো? নিশ্চিত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে বাসনায় এখনো কি অন্তরে জ্বলে উঠেনি অনুতাপের অনিবার্ণ আগুন? পথ প্রদর্শক পীর মোর্শেদ খুঁজবো কবে? কবে আমরা গ্রহণ করবো বায়াতের পবিত্র শপথ। দ্বিধার দেয়াল ভেঙ্গে কতোদিন পরে আর আমরা অর্জন করবো আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার? প্রবৃত্তির প্রতাপ আর শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কবে আমরা পালন করতে শিখবো খাঁটি বিশ্বাসীদের মতো প্রতিবাদী ভূমিকা?

প্রিয় বিশ্বাসী ভ্রাতা ভগ্নিবৃন্দ। সমকালীন শত্রুদেরকে চিনতে হবে আমাদেরকে। কাফের মোশরেকদেরকে চেনাতো সহজই। কিন্তু মুসলমান মুখোশধারীদেরকে চেনা সহজ নয়। শিয়া, কাদিয়ানি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতো মওদুদী মতবাদের অনুসারীরাও যে পথভ্রষ্ট একটি সম্প্রদায়— সে কথাও আমাদেরকে পরিস্কারভাবে জেনে নিতে হবে। হজরত রসুলেপাক স. এর সম্মানিত সাহাবাগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারী এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়টি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে সবাইকে। আমাদের ইমানকে হেফাজতে রাখার জন্যই তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে আমাদেরকে। এটা যে আমাদের ইমানী দায়িত্ব— সেকথা ভুলে গেলে চলবে না কিছুতেই। একথা নিশ্চিত যে মওদুদী ফেৎনাই বর্তমান জামানার প্রধানতম ফেৎনা।

শত সহস্র শোকরানা সেই পাক জাত আল্লাহ্ সোবহানাহ্ তায়ালার মহান দরবারে যিনি আমাদেরকে মকতুবাতে মাসুমীয়া ১ম খণ্ড বইটি চতুর্থ বারের মতো প্রকাশ করবার সুযোগ দান করেছেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. ছিলেন হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. এর তৃতীয় সাহেবজাদা এবং তাঁর প্রধান খলিফা। বহু বৈশিষ্ট্যধারী বাদশাহ্ জিন্দা পীর আওরঙ্গজেবের পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর পবিত্র কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদসমৃদ্ধ চিঠিপত্রের সমাবেশ এই মকতুবাতে মাসুমীয়া বইখানি মারেফতের পথের পথিকগণের জন্য অবশ্য পাঠ্য— একথা বললে কিছুতেই বেশী বলা হবে না। বরং কমই বলা হবে— একথা এ পুস্তকের পাঠকমাত্রই স্বীকার করে নিবেন, এ বিশ্বাস করা যায় সহজেই।

প্রায় তিন শত বছর পর এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবার তৌফিক লাভ করেছি আমরাই। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পেয়ারা হাবীব হজরত মোহাম্মদ স., তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধরগণ এবং সম্মানিত সাহাবাবৃন্দের প্রতি। আমীন।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

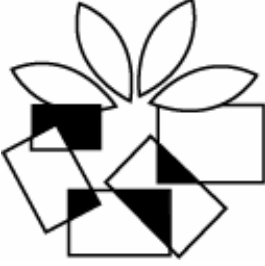
- q তাফসীরে মাযহারী (১-১২) মোট ১২ খণ্ড।
- q মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- q মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- q মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- q মাব্দা ওয়া মা'আদ
- q মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড

- q নকশায়ে নকশ্বন্দ
- q চেরাগে চিশ্তী
- q বায়ানুল বাকী
- q জীলান সূর্যের হাতছানি
- q নূরে সেরহিন্দ
- q কালিয়ারের কুতুব
- q প্রথম পরিবার
- q মহাপ্রেমিক মুসা
- q তুমিতো মোর্শেদ মহান
- q নবীনন্দিনী

- q পিতা ইব্রাহীম
- q আবার আসবেন তিনি
- q সুন্দর ইতিবৃত্ত
- q ফোরাতের তীর
- q মহাপ্রাণের কাহিনী
- q দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- q কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

- q THE PATH
- q পথ পরিচিতি
- q নামাজের নিয়ম
- q রমজান মাস
- q ইসলামী বিশ্বাস
- q BASICS IN ISLAM
- q মালাবুদ্দা মিনহ্

- q সোনার শিকল
- q বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- q সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- q তৃষিত তিথির অতিথি
- q ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- q নীড়ে তার নীল ঢেউ
- q ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা



হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম
সেরহিন্দী র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. ১০০৭ হিজরীর ১১ই শাওয়াল সোমবার সেরহিন্দ শরীফের নিকট বস্‌সি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হজরত ইমামে রক্বানী মোজাদ্দের আলফেসানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. এর তৃতীয় সাহেবজাদা ও খাস্‌ মোজাদ্দেরিয়া তরিকার অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন।

ইসলামের গৌরব, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, ইমানের প্রতি অটল দৃঢ়তা, শরীয়তের প্রতি অনড় নিষ্ঠা, মাখলুকের প্রতি গভীর ভালবাসা, মানবতা, মহানুভবতা, উদারতা, বিনয়, দয়াদাক্ষিণ্য এবং মারেফতের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ— এক কথায় ইসলামের সমস্ত মহৎ গুণাবলী আল্লাহুতায়াল্লা এই বংশধারার মধ্যে তাঁহার অনন্ত রহমতের ধারায় ফল্গুধারার মত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। হজরত খাজা মাসুম র. ছিলেন ইসলামের সেই নির্ভীক খাদেমে দ্বীন মহাপরাক্রমশালী আমিরুল মোমেনিন হজরত ওমর ফারুক রদ্বিআল্লাহুতায়াল্লা আনহুর বংশধর। হজরত ওমর রা. এর কাল হইতে কালক্রমে অষ্টবিংশ পুরুষে উপনীত হইয়া বিখ্যাত এই ফারুকী বংশে হজরত খাজা মাসুম র. জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লাহুতায়াল্লার অপার মহিমা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাঁহার গোপন ইচ্ছাসমূহ যখন সময়মত একে একে প্রকাশিত হইতে থাকে তখন তাঁহারই প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে আপন আপন সীমার মধ্যে থাকিয়া সেই অনন্ত রহস্যের কিছু কিছু কচিৎ কেহবা উপলব্ধি করিতে পারেন।

সেরহিন্দ নামক স্থান সম্পর্কে পূর্বে কেহ কোন কিছু অবগত ছিলেন না। কোন বসতি বা লোকালয় ছিলনা সেখানে। ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাঘের আবাসভূমি ‘সেহেরেন্দ’ হইতে এই সেরহিন্দ শরীফের উৎপত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করিয়া থাকেন। আল্লাহুতায়াল্লা ইচ্ছা করিলেন সেরহিন্দের নূতন মাটিতে তাঁহার গুপ্ত রহস্যাবলীসম্পন্ন মারেফতের মূল্যবান চারা রোপন করিবেন। কিন্তু সেই চারা যে খালি চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য সেই চারাকে যত্নের সহিত লালন-পালন করিয়া বড় করিবার জন্য যে উপযুক্ত খাদেমের দরকার। যাহার দেখা-শোনা, আদর-যত্ন ও নিত্যদিনের পরিচর্যা, সহবত আর মহব্বতের গুণে দিন-বা-দিন সেই

চারাগাছ শাখা প্রশাখায় ধীরে ধীরে পল্লবিত হইয়া উঠিবে আপন মহিমায়। গায়েবী ফয়সালা দ্বারা ঠিক হইয়া গেল, সেরহিন্দের এই জনবসতিহীন আনকোরা মাটিতে সেই অদৃশ্য চারা গাছের লালন-পালন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইবে ঐতিহ্যবাহী ফারুকী বংশকে।

সুদূর আরবে ইসলামের প্রথম চারা যে কয়জন সৌভাগ্যশালী বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সযত্নে লালন-পালন করিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সেই নির্ভীক অবিচল ফারুকী বংশেরই একজন কামেল অলি ও মারেফতের অক্লান্ত সাধক দ্বারা সেরহিন্দের ভিত্তি রচিত হইবে— অদৃশ্যলোক হইতে এই মর্মে আদেশ জারি হইয়া গেল। সেরহিন্দের বুনিয়াদ খাড়া করিবার ভার পড়িল সত্যসন্ধানী বুজুর্গ হজরত ইমাম রফিউদ্দিন র. এর উপর— যিনি ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ।

যেভাবে সেরহিন্দ শরীফের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহার সে ইতিহাসও আল্লাহুতায়ালার অনন্ত হেকমত, রহমত ও গুণ্ড রহস্যের নিদর্শনে পরিপূর্ণ।

তখন দিল্লীর বাদশাহ্ ফিরোজশাহ্ তোঘলকের রাজত্বকাল। একদা রাজকার্য উপলক্ষে কয়েকজন শাহী কর্মচারী লাহোর হইতে দিল্লী আসিতেছিলেন। চলার পথে একজন কর্মচারী কোন এক স্থানে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি ছিলেন একজন কাশফ্‌ধারী কামেল বুজুর্গ। সেই কামেল বুজুর্গ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিলেন, সেখান হইতে এক নূরের আলোকধারা সমগ্র বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে— এমন কি উর্ধ্বমুখী একাংশের আলোকরশ্মি দ্বারা আল্লাহুতায়ালার আরশ পর্যন্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গীদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নিজ মোর্শেদ হজরত সাইয়েদ জালালউদ্দীন বোখারীর খেদমতে তিনি পথে-দেখা সেই নূরের খবর বর্ণনা করিলেন।

হজরত সাইয়েদ জালালউদ্দীন বোখারী ওরফে মখদুম জাহানিয়া র. সেই আমলের আলা-দরজার অলি-আল্লাহ্ ছিলেন, যাঁহার অন্তর আল্লাহুতায়ালার মারেফতের নূরে ভরপুর ছিল। জনবসতিহীন স্থানে এই ধরনের অসাধারণ নূরের বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তরিকার মাধ্যমে সিনা-বা-সিনা যে অসিয়ত দীর্ঘকাল হইতে সুরক্ষিত অবস্থায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে সেই অসিয়তের কথাঃ আখেরী নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মুজতবা স. এর জামানা হইতে হাজার বৎসর পর হিন্দুস্তানে এমন একজন অসাধারণ অলিআল্লাহ্ এবং আল্লাহর খাস্ নির্বাচিত দাস জন্মগ্রহণ করিবেন, যিনি বেলায়েতের এবং নবুয়তের গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইবেন। তিনি হাজার বৎসরের মোজাদ্দের সুকঠিন দায়িত্ব বহনকারী বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী।

দিল্লীর বাদশাহ্ ফিরোজশাহ্ তোঘলককে এই গুচতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করিয়া হজরত মখদুম জাহানিয়া র. সেই স্থানে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাদশাহকে বলিলেন।

বাদশাহ্ ফিরোজশাহ্ তোঘলক অত্যন্ত ধর্মভীরু ও পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। হজরতের হাতে তিনি বায়াতও হইয়াছিলেন। পীর কেবলার অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি তৎক্ষণাৎ উজির ফতেহউল্লাহকে সেরহেন্দ জঙ্গলের সেই স্থানে অনতিবিলম্বে একটি কেল্লা নির্মাণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

উজির খাজা ফতেহউল্লাহ্ কালবিলম্ব না করিয়া বহু লোকজন সমভিব্যাহারে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন এবং স্থান নির্বাচনের পর কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করিলেন।

কেল্লা নির্মাণ করিতে যাইয়া উজির ফতেহউল্লাহ্ অদৃশ্য বিপদের সম্মুখীন হইলেন। শত শত লোকজনের সম্মিলিত পরিশ্রমে সারাদিন যে পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হইত, রাতে সকলের অগোচরে তাহা নিঃশব্দে ধ্বসিয়া পড়িত। রাতে পাহারা বসাইয়া এবং বহু চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না। প্রতি রাতে ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে। রাত্রি শেষে দেখা যায়, কেবলমাত্র বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তুপ ছাড়া সেখানে পূর্বদিনের নির্মাণ কার্যের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। লোকজনের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং রাজকোষের অর্থ প্রতিদিন বরবাদ হইয়া যাইতেছে। পর পর কয়েকদিনের পৌনঃপুনিক চেষ্টার পর উজির প্রমাদ গণিলেন। ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের কারণে তিনি মুষড়িয়া পড়িলেন। অবশেষে লোকজনদের সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া গেলেন এবং সম্রাটকে সেই অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে সবকিছু অবহিত করিলেন।

সম্রাট ফিরোজশাহ্ বুঝিতে পারিলেন, এই ঘটনার সহিত হয়ত কোন অদৃশ্য রহস্যের যোগ রহিয়াছে। তিনি তাঁহার মোর্শেদকে ঘটনা সম্পর্কে সবকিছু অবহিত করিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ শোনার পর পীর-মোর্শেদ হজরত মখদুম জাহানিয়া র. উজিরের ছোট ভাই ও তাঁহার প্রিয় খলিফা হজরত ইমাম রফিউদ্দীনকে উক্ত কেল্লা নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করিলেন।

জনবসতিহীন জঙ্গলের পবিত্র মাটিকে আল্লাহুতায়ালা এতকাল পরে বসতি স্থাপনের জন্য মনোনীত করিয়াছেন— যেখান হইতে দ্বীন ইসলাম ও মারেফতের পবিত্র নূর, ফারুকী বংশের মাধ্যমে দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িবে। সেরহিন্দের সেই ভিত্তি স্থাপনের সূচনায় তাই ফাঁকি বা অবহেলার কোন অবকাশ ছিল না।

সম্রাটের লোকজন হজরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর র.কে কুলি ভাবিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে বেগার খাটাইত। বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার প্রতি এই অন্যায়ের প্রতিফল হিসাবে তাঁহারই কারামতে কেল্লা নির্মাণের জন্য দিনের সমস্ত কাজ রাতে সকলের অগোচরে পণ্ড হইয়া যাইত।

পীরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন র. সেখানে পৌছানোর পর আল্লাহপাকের ইচ্ছায় মোরাকাবার মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শত শত লোকের মাঝেও তিনি হজরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর র.কে চিনিতে পারিলেন। তিনি নিজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও আজিজির সহিত ঘটনা সম্পর্কে বার বার দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট মাফ চাহিলেন।

হজরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর র. তাঁহার ব্যবহারে সম্ভষ্ট হইয়া পুনরায় কেল্লা নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য তাঁহাকে এজাজত দিলেন।

তিনি হজরত রফিউদ্দীন র.কে বলিলেন, আল্লাহুতায়ালার নির্দেশেই আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার বংশে এখানে এমন এক অলি-আল্লাহ্ জন্যগ্রহণ করিবেন, যাঁহার বদৌলতে দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবিষ্ট সমস্ত কুসংস্কার, শিরক, জুলমত ও কুফরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

এই খোশখবর শোনার পর ইমাম রফিউদ্দীন র. পূর্ণ উদ্যমে কেল্লা নির্মাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। আল্লাহুতায়ালার অফুরন্ত রহমতের ফলে কেল্লা নির্মাণের কাজ আশাতীতভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইলে সম্রাট ফিরোজশাহ্ ঐ কেল্লার সমস্ত দায়িত্ব হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন র. এর উপর অর্পণ করিলেন।

হজরত শাহ্ রফিউদ্দীন র. এর বুজুর্গীর খ্যাতি অতি অল্পদিনের মধ্যে সেরহিন্দে ছড়াইয়া পড়িল। সেখানে তিনি সকলের ইমাম হওয়ার সম্মান লাভ করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পরহেজগারী, তাকওয়া ও মহান আল্লাহুতায়ালার পরিচয় লাভের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া সেরহিন্দ শরীফের সেই অমর প্রতিষ্ঠাতা চিরকালের মত সেরহিন্দের পবিত্র মাটিতে নিজের ঠাঁই করিয়া লইয়াছিলেন। আজও সেখানে তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফ অসংখ্য ভক্তদের আকর্ষণ করে।

হজরত ইমাম রফিউদ্দীন র. এর পুত্র এবং প্রপৌত্র ছিলেন যথাক্রমে হজরত শায়েখ হাবিবুল্লাহ্ র. এবং হজরত শায়েখ আব্দুল হাই র.। শায়েখ আব্দুল হাই র. ছিলেন হজরত শায়েখ জয়নুল আবেদীন র. এর পিতা এবং হজরত মখদুম আব্দুল আহাদ র. এর পিতামহ। এই বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত আব্দুল আহাদ র. ছিলেন ইমামে রব্বানী মোজাদ্দের আলফেসানী হজরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. এর পিতা এবং হজরত মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর তৃতীয় সাহেবজাদা।

ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. তাঁহার এই পুত্র সম্পর্কে বলিতেন, মোহাম্মদ মাসুমের জন্ম আমার জন্য অত্যন্ত শুভ তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়ী

সৌভাগ্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার জন্মের মাত্র কয়েকমাস পরেই আমি হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ র. এর সাক্ষাৎ লাভ করি এবং তাঁহার নিকট বায়াত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার খেদমতে সমর্পণ করিবার সুযোগ লাভ করি। হজরত খাজা র. এর নেক নজর, তরবিয়ত ও দোয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি যে দুর্লভ রূহানী দৌলতসমূহ তাঁহার নিকট হইতে হাসিল করিতে কামিয়াব হইয়াছি, তাহার কোন তুলনা হয় না।

হজরত খাজা মাসুম র. বাল্যকালে তাঁহার বড় ভাই হজরত খাজা সাদেক র. এবং হজরত ইমামে রব্বানী র. এর অন্যতম প্রধান খলিফা হজরত শায়েখ মোহাম্মদ তাহের লাহোরী র. এর নিকট হইতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন। ইহার পর অধিকাংশ সময় তিনি বুজুর্গ পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দ্বীনি এলেমের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার পিতা হজরত ইমামে রব্বানী র. সব সময় এলেম হাসিল করার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করিয়া বলিতেন, এলেমই হইতেছে সমস্ত অবস্থার উৎপত্তি ও উন্নতির মূল, যে জন্য বাতেনী সবকের পূর্বে এলেম হাসিল করা অত্যন্ত জরুরী। হজরত মাসুম র. কে তিনি বলিতেন, এই সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা তুমি তাড়াতাড়ি শেষ কর, কেন না ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বড় কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

হজরত মাসুম র. এর শিশুকালেই হজরত মোজাদ্দের র. বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি জন্মগতভাবেই বেলায়েতে খাসসায়ে মোহাম্মদীর কাবেল। মাত্র তিন বৎসর বয়সে সমস্ত গুণের সমন্বয়ে হকীকতে তাজাল্লীর সঙ্গে তওহীদের জাতি হরফ যে শিশুর জবানীতে প্রকাশ পায়, সে আর দশজন শিশুর মত কখনও সাধারণ হইতে পারে না। তিনি যে আল্লাহ্‌তায়ালার খাস রহমত প্রাপ্ত মাহবুব এবং ভবিষ্যতে তাঁহার জন্য যে বিরাট দায়িত্বসহ বহু কাজ অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা বুঝিতে আল্লাহ্‌পাকের অনন্ত মারেফতের অধিকারী হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর কোন ভুল হয় নাই।

ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র এগার বৎসর বয়সে হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. তাঁহাকে মারেফতের প্রথম সবক প্রদান করেন। যিনি জন্মগ্রহণ করার পর হইতে এই সৌভাগ্য অর্জন করার যোগ্য ছিলেন, জাহেরী এলেম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার সেই প্রকৃত পরিচয় ও সৃষ্টির রহস্যের দিকেও হজরত ইমামে রব্বানী র. তাঁহাকে কিশোর বয়সেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পিতা হইলেও হজরত ইমামে রব্বানী র. তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও তাজীমের দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, মাসুম আল্লাহ্‌তায়ালার মাহবুব। জন্মগতভাবেই তিনি পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কোন পাপ কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার শান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার খাতিরে তাঁহার প্রিয়

মাহবুবকেও ইজ্জত ও মর্যাদা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে যে, সেই জাল্লা-জালালুল্লর প্রতি অসম্মান করা হয়।

পিতার প্রত্যক্ষ লালন-পালনে এবং আল্লাহপাকের খাস রহমতে হজরত খাজা মাসুম র. আধ্যাত্মিক অবস্থার বিভিন্ন স্তর ও গুঢ় রহস্যের সঙ্গে একে একে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে উন্নতির ধাপে ধাপে বিন্যস্ত সোপানসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উর্ধ্বারোহণের সেই অভিযাত্রায় ১৪ বৎসর বয়সে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পবিত্র বদন হইতে নূরের ধারা প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া দিতেছে। গভীর অন্ধকার-ভেদী সেই উজ্জ্বল আলোকরশ্মি যেন পার্থিব জগতের সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সবকিছু বিকশিত ও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র প্রখর সূর্যকিরণের সঙ্গেই যেন সেই সর্বত্রগামী নূরের আলোর কিছুটা তুলনা করা যায়। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পিতা হজরত মোজাদ্দের র. তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কুতুবুজ্জামান (জমানার কুতুব) হইবেন। আমার এই কথা আপনি মনে রাখিবেন।

সেই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য অদৃশ্যালোক হইতে, তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে, যেন তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইতেছিল— যাহাতে পিতার পর সেই সুকঠিন দায়িত্বসমূহ যোগ্যতা ও সততার সহিত তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করিতে পারেন।

হজরত খাজা মাসুম র. এর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণজ্ঞানের অধিকারী। কিশোর বয়সে মাত্র তিন মাসের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ কালামপাক হেফজ করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. তাঁহার স্মরণ শক্তির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, দিনে দিনে মাসুম আমাদের এই নেসবতের সমস্ত কিছু এমনভাবে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে যেমন শরহে বেকায়ার গ্রন্থপ্রণেতা তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে তাবৎ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য কর্তৃক করিয়া লইতেন।

অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণবীসম্পন্ন হওয়ার গুণে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি কোরআন শরীফ, হাদিস, ফেকাহ ও ইসলামের অন্যান্য শাখার এলেম শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। তরিকতের পথে তিনি পিতার সযত্ন লালনপালন ও পরিচর্যায় সুলুকের সমস্ত স্তরগুলি একে একে পরিভ্রমণ করেন এবং পারদর্শীতা ও যোগ্যতার সহিত পিতার নিকট ইহতে খেলাফত লাভ করেন। বাতেনী হাল ও সবকের দিকে তিনি নিজেকে এত গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া রাখিতেন যে, তখন এক আল্লাহ ছাড়া অপর সবকিছুই তাঁহার নিকট বিলীন হইয়া যাইত। আল্লাহতায়ালার বিশেষ রহমতে এইভাবে তিনি তাঁহার বুজুর্গ পিতার সমস্ত হালের হকীকত, মারেফতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. তাঁহার এই পুত্রের উচ্চ নেস্বত ও বাতেনী মাকামাত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, মাসুম আল্লাহর আ'রেফ। তিনি আমার নিকট হইতে সামান্য পরিমাণও কিছু ছাড়িতেছেন না। আমি যাহা কিছু বলি, তাহার সমস্তই তিনি ইয়াদ করিয়া লন। তিনি এই মারেফতী কেন্দ্রবিন্দুর একটি স্তম্ভস্বরূপ। আমার নিকট হইতে প্রতিটি আধ্যাত্মিক স্তর তিনি সাফল্যের সহিত শেষ করিয়াছেন। এইভাবে হজরত খাজা মাসুম র. ইমামে রব্বানী মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর অনন্য কামালাত ও বৈশিষ্ট্যের যাবতীয় অংশ হাসিল করিয়াছিলেন। পিতার এই সমস্ত গুণসমূহের অধিকারী হওয়ার জন্যই খাজা মাসুম র. সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মাসুম আমার পরে আমারই মত দুনিয়ার কুতুব হইবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভকারী এই মাহবুব সম্পর্কে হজরত ইমামে রব্বানী র. একদা বর্ণনা করিয়াছেন, মাসুমকে আল্লাহ্‌পাক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন। রাক্বুল আ'লামীন তাঁহার হাবীব হজরত আহম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর পবিত্র দেহ মোবারক যে মোবারক মাটি দ্বারা তৈরী করিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্টাংশের কিয়ৎ পরিমাণ মাসুমের দেহেও মিশিয়া আছে যাহার ফলে তিনি জন্মগতভাবে পবিত্রতার অধিকারী এবং যাহার প্রভাবে তিনি মূলতত্ত্বের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া কাইয়ুমিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। খাজা মাসুম র. সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, মোহাম্মদ মাসুম সাবেকীন্ অর্থাৎ অগ্রগামীদের দলভুক্ত। সাবেকীন ও আখেরীনদের শানে কালাম-পাকে আল্লাহ্‌তায়ালার এরশাদ করিয়াছেন, সুন্নাহ্‌তুম্ মিনাল্ আওয়ালীনা ওয়া কালীলুম্ মিনাল্ আখেরীন অর্থাৎ সাবেকীনদের মধ্যে এক জাতি এবং আখেরীনদের মধ্যে অল্প সংখ্যক।

হজরত শায়েখ আহমদ র. তাঁহার পুত্র মাসুমকে শুধু স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন না, আল্লাহর মাহবুব হিসাবে তাঁহাকে তাজিম ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিশোর বয়সে একবার মাসুম র. তাঁহার পিতার সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। একদিন দুপুরে পিতা ঘরে না থাকায় তিনি তাঁহার পিতার পালংকে ঘুমাইয়া পড়েন। ইত্যবসরে হজরত মোজাদ্দের র. ঘরে ফিরিয়া আসিলে খাদেমগণ শশব্যস্ত হইয়া নিদ্রিত মাসুম র.কে জাগাইতে উদ্যত হইলেন। হজরত মোজাদ্দের র. নিষেধ করিয়া তাজিমের সহিত বলিলেন, ওখানে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় মাহবুব আরাম করিতেছেন। ঘুম হইতে তাঁহাকে জাগাইলে তাঁহার আরামের ব্যাঘাত ঘটবে এবং তিনি কষ্ট পাইবেন। এই কথা বলার পর হজরত মাসুম র. ঘুম হইতে জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত তিনি ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, হজরত মোজাদ্দের র. তাঁহার পিতা এবং অত বড় বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দ ও ভালবাসার কারণে নিজ পুত্র কিশোর মাসুমের প্রতি তিনি কতখানি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইসলাম ধর্মের সহিত শত্রুতা করার মানসে দিল্লীর বাদশাহ্ আকবর যে ‘দ্বীন-ই-ইলাহি’ নামক এক কিছুতকিমাকার নূতন ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করিতে গিয়া হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. রাজরোষে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহ্ আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সাহসী না হইলেও আকবরের পরে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর ঘনিষ্ঠ মহলের উচ্চাশ্রিত চক্রান্তের শিকার হন এবং শাহি দরবারে প্রবেশ করিবার সময় কুর্নিশ না করার অজুহাতে তিনি হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র.কে গোয়ালিয়র জেলে প্রেরণ করেন। বাদশাহের এই হঠকারিতায় মোজাদ্দেরিয়া অনুসারী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত প্রধান সেনাপতিসহ অধিকাংশ সেনাবাহিনী অসম্মত হইলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর সেনাবাহিনীর ঐ সমস্ত লোকদের দমন করিতে গিয়া প্রধান সেনাপতির নিকট পরাস্ত ও বন্দী হন। হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ফেতনা-ফাসাদ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া পূর্বের মত বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য জেলখানা হইতে প্রধান সেনাপতির নিকট নির্দেশ প্রেরণ করেন।

যেমন মোর্শেদ, তাঁহার তেমনি মুরিদ। বিনা বাক্যব্যয়ে প্রধান সেনাপতি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া পূর্বের মত বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইলেন এবং সম্মানের সহিত তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বাদশাহ্ আবার তাঁহার বাদশাহী ফিরিয়া পাইলেন। এই ঘটনায় বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর আশ্চর্য ও হতবাক হইয়া গেলেন। হাতে পাইয়াও হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন না। কি আশ্চর্য মহানুভবতা! হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর এই অভূতপূর্ব মহানুভবতার ফলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হইল। তিনি হজরত মোজাদ্দের র.কে শুধু জেল হইতে সসম্মানে মুক্তিই প্রদান করিলেন না, হজরতের সমস্ত শর্তগুলিকে আদেশ হিসাবে মানিয়া লইয়া দ্বীন-ই-ইলাহির যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও শরিয়ত-পরিপন্থী সকল প্রকার বেদাতী কার্যকলাপসমূহ অবিলম্বে বন্ধ করিবার জন্যও নির্দেশ প্রদান করিলেন এবং সেইসঙ্গে অন্ততঃ চিত্তে হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট বায়াত গ্রহণ করিলেন।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান যখন দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাহানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ বাদশাহকে শাহজাহানের প্রতি বিরূপ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন করিয়া তোলেন, তখন একসময় বাধ্য হইয়া শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নিজস্ব শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রায় পরাজয়ের মুখে বাদশাহ্ উপায়ান্তর না দেখিয়া হজরত মোজাদ্দের র. এর নিকট হাজির হইয়া বিজয়ের জন্য দোয়া প্রার্থনা করিলেন। হজরত মোজাদ্দের

র. তাঁহার জন্য দোয়া করিলে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর পুত্রের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর শাহজাহান ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে হজরতের নিকট হাজির হইয়া আরজ করেন, অপরিণামদর্শী পিতা অপেক্ষা তিনি তাঁহার অধিক ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও হজরত কেন তাঁহার জন্য দোয়া করেন নাই। উত্তরে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. স্মিত হাস্যে তাঁহাকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, বাবা একটু সবর কর। বৃদ্ধ পিতাকে কষ্ট দিও না। অদূর ভবিষ্যতে তুমি তোমার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিবে আর আমার পুত্র মোহাম্মদ মাসুম আমার সমগ্র বাতেনী মসনদে অধিষ্ঠিত হইবে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. বয়সের শেষ প্রান্তে কোন মজলিশে বা দরবারে আসা যাওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাহিরের লোকজনের সঙ্গে তেমন দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। তাঁহার শেষ জীবনের এই দিনগুলিতে তিনি আল্লাহর অন্তহীন প্রেমে অধিকাংশ সময় মশগুল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সমস্ত মুরিদগণের ভার এবং অন্যান্য কাজের দায়িত্ব তিনি তখন খাজা মাসুম র. এর উপর সোপর্দ করিয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতে মসজিদের ইমামতী, মুরিদগণের তরবিয়ত এবং লোকজনকে তরিকায় বায়াত করার সমস্ত দায়িত্ব হজরত মাসুমকে পালন করিতে হইত।

এমনি সময়ে একদিন হজরত মাসুমকে নিভৃত নিজের কাছে ডাকিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. বলিলেন, এই নশ্বর দুনিয়ায় আমার বাঁচিয়া থাকার আর কোন প্রয়োজন আমি দেখিতেছি না। আমাকে কাইয়ুমিয়াতের যে মহান মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছিল, উহার অধিকারী এখন আপনি। আপনার প্রতি মহান সৃষ্টিকর্তার সম্ভষ্টির কারণে, আমার জীবিতকালে, উহা আপনি লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার কর্তৃক প্রদত্ত এই বিরল নেয়ামতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং শোকরগোজার থাকিবেন। যাবতীয় সৃষ্টি পূর্ণ শওকের সহিত এখন হইতে আপনার দিকে ধাবিত হইতেছে, কারণ তাহারা সকলেই আপনার কাইয়ুমিয়াতে উপর খুব সম্ভষ্ট।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে ১০৩৪ হিজরীর ২৮শে সফর (১৬২৪ ইং) ৬৩ বৎসর বয়সে হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ইন্তেকাল করিলে হজরত খাজা মাসুম র. পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বীন ইসলামের সঠিক ধারাকে নানাবিধ ভ্রষ্টতা, বেদাতী ও কলুষতা হইতে সংস্কার সাধনের পর হজরত মোজাদ্দেদ র. এর জীবনাবসান ঘটে। দিল্লীর বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তখন তাঁহার অনুগত ভক্ত ও অন্যতম প্রধান মুরিদ। বাদশাহ্ আকবরের ‘দ্বীন-ই-ইলাহি’র নূতন মতবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। বিশিষ্ট আমীর ওমরাহ, আলেম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মানুষ এমন কি সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী পর্যন্ত

সমগ্র হিন্দুস্তান জুড়িয়া তখন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর কাফেলায় শরীক হইয়াছেন। হিন্দুস্তানের বাহিরেও তখন কিছু কিছু মুরিদান ও খলিফা ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। বে-দ্বীনের অন্ধকার হইতে দ্বীনের মশালকে সাহায্যে কেরামগণের নূরের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন হজরত ইমামে রব্বানী। এখন সেই আলোর শিখাকে ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও দীপ্ত করার দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে হজরত মাসুমের উপর। সেই বিশাল কাজের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও প্রজ্ঞার সহিত হজরত খাজা মাসুম র. পালন করিয়া চলিলেন। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলেন। উপদেশ প্রদান এবং হেদায়েতের পথে আহবান করা ছাড়াও শরীয়ত সম্পর্কে শিক্ষাদান ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়সমূহে বক্তৃতা প্রদান করা তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল। তিনি তফসির, হাদিস, ফেকাহ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ অত্যন্ত যত্নের সহিত সকলকে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

মোঘল সাম্রাজ্যের বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর, বাদশাহ্ শাহজাহান ও বাদশাহ্ আলমগীর র. হজরত খাজা মাসুম র. এর মুরিদ ছিলেন। এই তিনজন বাদশাহ্ প্রত্যেকেই তাঁহাদের রাজত্বকালে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র.কে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবদ্দশায় সেরহিন্দ শরীফে তশরীফ লইয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বাদশাহ্ আলমগীর র. তাঁহার বিশিষ্ট মুরিদ এবং তাঁহার ভাইদের অতি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। মকতুবাতে মাসুমীয়ার মধ্যে (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে) দেখা যায়, কয়েকটি মকতুব বাদশাহ্ আলমগীর র. এর নামে লিখিত হইয়াছে— যাহা হইতে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর সহিত বাদশাহ্ আলমগীর র. এর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে ভালভাবে অবহিত হওয়া যায়।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. কাদেরিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি তরিকার খলিফা ছিলেন। তিনি সর্বশেষ খেলাফত লাভ করেন হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ্ র. এর নিকট হইতে নকশ্বন্দিয়া তরিকায়। এই নকশ্বন্দিয়া তরিকার মূল্যবান সিলসিলা ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে হজরত ইমামে রব্বানী তাঁহার বহু মকতুবাতে ও পুস্তিকায় অনেক খোশখবর ও প্রশংসাবাণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নকশ্বন্দিয়া তরিকা ছাড়াও অন্যান্য তরিকার সারবস্তকে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনের সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মোজাদ্দেদ সুলভ প্রজ্ঞা এবং সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোকে যে পূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত নতুন তরিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন সেই তরিকারই প্রধান ধারক এবং প্রচারক। এই তরিকাই খাস্ মোজাদ্দেদিয়া তরিকা হিসাবে অভিহিত হইয়া থাকে। হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর আন্তরিক

প্রচেষ্টার ফলে এই তরিকার মাধ্যমে ইসলামের লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য প্রজ্জ্বলিত সূর্যের মতো সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিকশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. যে কতবড় আল্লাহ্ভক্ত সাধক, ধর্ম সংস্কারক, মারেফতের উচ্চস্থানে আসীন ও আল্লাহুতায়ালার মাস্তুব ছিলেন, তাহা ধারণা করাও যেমন আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য, তেমনি হজরত খাজা মাসুম র. সম্পর্কেও সাধারণভাবে ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, হজরত খাজা মাসুম র. ছিলেন পিতার সর্বপ্রকার মারেফতসমূহের প্রকৃত সমঝদার ও রাজদার। হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর বহু অপ্রকাশিত গোপন রহস্য এবং মারেফতের ধারণাভিত্তিক রকমের উচ্চ এবং সূক্ষ্ম মাকামাত ও বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্য কেহ অবহিত ছিলেন না। হজরত মোজাদ্দের র. লিখিত কোন কোন দুর্লভ মকতুব হইতে জানা যায়— আল্লাহুতায়ালার হজরত মোজাদ্দের আলফেসানীকে এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মারেফতের যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু ও হকিকত সম্পর্কে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ সাধারণের অবগতির জন্য, এক তৃতীয়াংশ বিশিষ্ট খলিফাগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ ছিল অত্যন্ত গোপনীয়তার সহিত সুরক্ষিত। কিন্তু হজরত খাজা মাসুম র. পিতার সমস্ত প্রকার মারেফতেরই পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। পিতার যে সমস্ত মকতুব, পুস্তিকা ও মারেফতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞানের স্তর ছিল অত্যন্ত সীমিত, তিনি সেইগুলিকে আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া সকলের জন্য বোধগম্য করিয়া তুলেন এবং সারাজীবন অত্যন্ত যত্নের সহিত মারেফত সংক্রান্ত এইসব দুর্লভ ও জটিল বিষয়গুলির সহজতম ও বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

হজরত খাজা মাসুম র. মক্কা ও মদীনাশরীফ সফর করিয়া হজ্ব ও জিয়ারতের মাধ্যমে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। হজ্ব ও জিয়ারতের সময়ে তিনি আল্লাহুতায়ালার নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ এবং দুই জাহানের সরদার জনাব রসুলে মকবুল স. এর নিকট হইতে অশেষ মেহেরবানি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হজরত খাজা আবদুল্লাহ র. কর্তৃক লিখিত তথ্যাদি হইতে এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে অনেক কিছু জানা যায়, যাহার কিছু কিছু সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হইল।

সমুদ্র সফর শেষে স্থলপথে রওয়ানা হওয়ার পর হজরত মাসুম র. জানান যে, এখানকার পাহাড় পর্বত মরুভূমি সবকিছুই নবী করিম স. এর নূরে ভরপুর হইয়া আছে। খানায়-কাবা আজ নিজ মাকাম শরীফ হইতে আমার নিকট তশরিফ লইয়া আসিয়াছেন।

এই রকম সম্মান ও সৌভাগ্য এই দুনিয়াতে আর কয়জনের ভাগ্যে জুটিয়াছে তাহা এক আলেমুল গায়েবই জানেন। মক্কা মোয়াজ্জামায় অবস্থানকালে হজরত মাসুম র. আল্লাহ তায়ালা প্রেমে এতই বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, অধিকাংশ সময় তিনি খানায় কাবার তওয়াফে মশগুল হইয়া থাকিতেন এবং এই ইবাদতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত বলিয়া মনে করিতেন।

মিলনের স্থান ছিল বড়ই মনোরম এবং প্রেমের সেই মিলনও ছিল খাঁটি ইশকের রঙে রঞ্জিত। জীবনের সেই দিনগুলিই ছিল তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও আনন্দময়। সেই মিলনঘন মুহূর্তে একদিন হজরত বলিলেন, কাবা শরীফের অনন্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে আমি এখন আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং চুম্বনরত। যাবতীয় সৃষ্টি এখন নূরের আলোকে উল্লসিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং আমার সমগ্র সত্তা এখন কাবায়-হাসানার অবিচ্ছিন্ন সত্তার সহিত একাকার হইয়া গিয়াছে।

অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় আল্লাহ তায়ালা নিজ হইতে এইভাবে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহাকে মিলনমাল্যে ভূষিত করেন। মক্কা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণ করার সময় ঘনাইয়া আসিলে হজরত বলিলেন, এখান হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে দুর্লভ পুরস্কার প্রদান করেন এবং উচ্চ মর্যাদায় পরিপূর্ণ দানসমূহ এনায়েত করেন তাহা বর্ণনাতীত। ইতিপূর্বে আবুদীয়তের খেলায়াতে সৌভাগ্যশালী করা ছাড়াও বিদায়ী খেলায়াত হিসাবে আমাকে বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ কার্যকর্যখচিত একটি অতিমূল্যবান উজ্জ্বল সবুজ রঙের জড়োয়ার চাদর উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। ইহার পরে আমার সঙ্গীদের সকলের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে খেলায় করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা প্রেমের কী অপার মহিমা! পবিত্র এক আশেকের অসিলায় তাঁহার সঙ্গীগণকেও আল্লাহ তায়ালা এইভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

হজরত খাজা মাসুম র. হজরত নবী করিম স. এর রওজা মোবারক এবং খলিফাবুদ্দ, আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কেরামগণের মাজার শরীফ জিয়ারত করিয়া বিশেষ বিশেষ ধরনের খাস ফয়েজ ও বরকতসমূহ লাভ করেন। জনাবে রসুলুল্লাহ স. এর রওজা মোবারক ছাড়াও তিনি হজরত আবুবকর রা, হজরত ওমর ফারুক রা, হজরত ওসমান রা, হজরত খাদিজাতুল কোবরা রা, হজরত ফাতেমা জহুরা রা, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-গণের রওজা শরীফ পৃথক পৃথকভাবে জিয়ারত করেন এবং সকলের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও তেজদীপ্ত নেসবতের আবির্ভাব হইতে অসীম অনুগ্রহ, দয়া, স্নেহ মমতা, প্রগাঢ় ভালবাসা, খেলায়াত, খুবি ও বিশেষ বিশেষ হালাতের উপর রহস্যের অন্তরাল হইতে মারেফতের বহু উচ্চ মাকামে অবস্থিত মোয়ামেলা ও নেয়ামতসমূহ লাভ করেন। ইহা ছাড়া জান্নাতুল বাকী এবং অন্যান্য মোবারক মাজারসমূহ জিয়ারত করিয়া ফয়েজ ও বরকতের নূরের মধ্যে অবগাহন করেন।

হজরত খাজা মাসুম র.কে মসজিদে নববীতে দুইদিনের জন্য এতেক্বাফের এজাজত দেওয়া হইয়াছিল। হজরত বলেন, রাতে মোরাকাবারত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, হজরত নবীয়ে করিম স. তাঁহার খুশী ও মেহেরবানি প্রকাশ করিলেন। আরও গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সময় অনুভব করিলাম, আমাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। সেই সময় আমি রসুলেপাক স. এর হকীকতের বিশেষ নৈকট্য লাভ করিয়াছিলাম।

হজরত মাসুম র. বলেন, জান্নাতুল বাকীর যে যে কবর জিয়ারতের জন্য গিয়াছি, সেই সব কবরের বাসিন্দাগণ অত্যন্ত খুশী ও খুবির সহিত আমার নিকট নিজদিগকে জাহির করিতেন। অন্যদিকে যে কবর জিয়ারত করিবার জন্য এরা দা করিতাম, সেই কবরবাসী আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং সেখানে যাওয়ার পর, বিশেষ মেহমান হিসাবে, আমার সহিত তাঁহারা মোলাকাত করিবার জন্য সমবেত হইতেন।

খাজা মাসুম র. বলেন, পবিত্র জান্নাতুলবাকী ও অন্যান্য মোবারক মাজারসমূহ জিয়ারতের সময় সেখানে আমার নেসবতের প্রভাব আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। মনে হইত, সমস্ত পৃথিবী যেন সেই নেসবতের নূরের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করিতাম, দৃশ্য ও অদৃশ্য দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি আমার মুখাপেক্ষী এবং আমি তাহাদের সকলের ইমাম। আমার অসিলাতেই সকলের নিকট ফয়েজ ও বরকতসমূহ পৌছাইত। আমার নিকট সে সময় বহু রহস্যপূর্ণ গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছিল এবং অনেক কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য আমার নিকট দোয়াত কলম আসিয়া হাজির হইতেছিল। আমার নেসবতকে প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম রেজওয়ানল্লাহু আলায়হীম্ আজমাইনগণের উচ্চ মর্তবার নিকট আমার মত ফকিরের দীন নেসবত কিভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। পরে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার এই অবস্থা তাঁহাদেরই নেক নজর ও অনুগ্রহের দানে ভরপুর ছিল।

মদীনা ননোয়ারায় অবস্থানকালে হজরত মাসুম র. একদিন বলিলেন, বর্তমানে আমার নিজের নেসবত আমি পরিপূর্ণভাবে সরওয়ারে-আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি পাইতেছি। ইহার মধ্যে এমন অনেক গোপন রহস্য ও বিষয়সমূহ আছে যাহা চক্ষু কোনদিন দর্শন করে নাই এবং কর্ণ শ্রবণ করেন নাই। তাহার মধ্যে অনেক কিছুই প্রকাশ করা যায় না। তবে এই সমস্ত গোপন রহস্য ও হালাতের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে পুসিদা রাখা ছাড়াও তাহার মধ্যে

কিছু কিছু প্রকাশযোগ্যও বটে, যাহার ইশারা-ইঙ্গিতই কোন কোন মাকামের জন্য যথেষ্ট। মাকামাতের এই সকল অন্তর্নিহিত অবস্থা ও রহস্যভেদী পরিচিতির সঙ্গে ফানা ও বাকার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইতে উহা বহু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

মদীনা শরীফ হইতে বিদায়ের দিনের কথা স্মরণ করিয়া হজরত খাজা র. জানান, সেইদিন বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে মসজিদে গিয়া হাজির হইলাম। বিচ্ছেদের ব্যথায় পেরেশান হইয়া বেহুঁশের মত আমি কাঁদিতেছিলাম। আমার সেই দুঃখ ও পেরেশানীর মধ্যে দেখিলাম, হজরত রেসালতে-খাতেমিয়াত স. পূর্ণ আজমতের সহিত রওজা শরীফ হইতে জাহের হইয়া তশরীফ আনিলেন এবং অত্যন্ত মেহেরবানির সঙ্গে অতি উচ্চ মর্যাদাবাহী একটি বাদশাহী তাজের খেলায়াত স্বহস্তে আমাকে পরাইয়া দিলেন। চোখ জুড়ানো পালক ও দুর্লভ মতির সমন্বয়ে প্রস্তুত এই খেলায়াত আঁ-হজরত স. নিজের পবিত্র দেহ মোবারক হইতে খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমার নিকট অনুভূত হইল। এই সময় আমার মনের অবস্থা এমন হইল যে, এখান হইতে আর কোনদিন আমি ফিরিয়া যাইব না বলিয়া মনে করিলাম এবং তৎসম্পর্কে রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের মরজি মোবারক জানিবার জন্য অত্যন্ত আদবের সহিত তাঁহার প্রতি আমি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে খেয়াল করিলাম। রসুলেপাক স. আমার স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পক্ষে মত দিলেন বলিয়া আমি অনুভব করিলাম।

সেই সময়ে হঠাৎ শরীয়তের এক দুশমনের কথা আমার মনের মধ্যে উদয় হইল এবং তাহার সম্পর্কে কিছু নির্দেশ লাভ করার মানসে নবী করিম স. এর প্রতি পুনরায় মোতাওয়াজ্জাহ্ (পূর্ণ মনোযোগী) হইলাম। আমার মনে হইল, রসুলে আকদাস্ স. তাঁহার মোবারক হাতে খোলা তরবারি লইয়া আবির্ভূত হইলেন এবং কতলের ইশারা করিলেন।

হজরত খাজা মাসুম র. সেই সময়ে বাদশাহ্ শাহ্ জাহানের পুত্র দারাশিকোর কথা মনে করিয়াছিলেন, যিনি ইসলামের প্রতি ও তাঁহার খানদানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। হজরত মাসুম র. হজ্জে যাওয়ার পর দারাশিকো প্রতারণা করিয়া দিল্লীর বাদশাহী লাভ করেন। জানা যায়, রসুলেপাক স. যে সময় কতলের জন্য ইশারা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তলোয়ারের আঘাতে দারাশিকো নিহত হন।

হজরত খাজা মাসুম র. হজ্জ হইতে সেরহিন্দে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের ও তরিকার খেদমতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র সহবতের প্রভাবে হাজার হাজার মুরিদান আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে শায়েখ মুরাদ বিন আব্দুল্লাহ্ আল কাজানি

জিল বিশ্হাতে লিখিয়াছেন, খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. ছিলেন, আয়াতাম্মিন আয়াতুল্লাহ্ অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। তাঁহার পিতার মতোই তিনি সমস্ত দুনিয়াকে আলোকিত করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে প্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদার বরকতে পিতার পরে ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত অনাচার, অজ্ঞতা ও বেদাতের অন্ধকারকে তিনি নির্মূল করিয়াছিলেন।

লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ছাড়াও বড় বড় আলেম, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণ তাঁহার মুরিদ ছিলেন। শরীয়ত ও তর্ক শাস্ত্রের প্রখ্যাত আলেম ও লেখক জমির জাহেদ তাঁহার মুরিদ ছিলেন এবং সাহেবে রওজাতুল কাইয়ুমিয়া তাঁহার খলিফা ছিলেন। ফারসীর বিখ্যাত কবি নাসির আলী সেরহিন্দী তাঁহার মুরিদ ছিলেন। নাসির আলীর কাব্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলেও প্রথম জীবনে তাঁহার কোন কাব্য প্রতিভা ছিল না। হজরত খাজা মাসুম র. এর নিকট তিনি তাঁহার আরজু সম্পর্কে আরজ করিলে হজরত নিজের অজুর পানি হইতে তাঁহাকে সামান্য পরিমাণ পান করিতে দেন ও তাঁহার জন্য দোয়া করেন। তখন হইতে নাসির আলীর অন্তরে কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। নিজ মোর্শেদের সম্মানে কবি নাসির আলী সেরহিন্দী এই কবিতা লিখিয়াছিলেন :-

লক্ষ যোজন জুড়ে নিত্য যে সপ্তসভার আয়োজন
তার প্রদীপ স্বরূপ খাজা মাসুম,
অন্ধকার বিনাশ ক'রে সে আলোয় উদ্ভাসিত
কাছের হিন্দুস্তান কিংবা দূরের রোম।

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর, বাদশাহ্ শাহজাহান ও বাদশাহ্ আলমগীরের (আওরঙ্গজেবের) রাজত্বকালে বড় বড় আমীর উমরাহ্ এবং উচ্চপদস্থ বহু রাজ কর্মচারী তাঁহার মুরিদান ও ভক্ত ছিলেন।

বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে লাহোরের গভর্নর নবাব মোকাররম খান তাঁহার মুরিদ ও অনুসারী ছিলেন। তিনি রাজমর্যাদা ও উচ্চপদের মোহ পরিত্যাগ করিয়া মোর্শেদের সহবত ও খেদমতের জন্য সেরহিন্দে চলিয়া আসেন। বাদশাহ্ আলমগীর একবার নবাব মোকাররম খানকে তাঁহার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবাব সাহেব তাঁহার বয়স চার বৎসর বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন। জবাব শুনিয়া বাদশাহ্ আলমগীর মৃদু হাসিয়াছিলেন। নবাব মোকাররম তখন বাদশাহ্‌কে বলিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নাই; কারণ যে চার বৎসর ধরিয়া আমি মোর্শেদের খেদমতে নিয়োজিত আছি, সেই চার বৎসরই আমার প্রকৃত বয়স। জীবনের বাকী দিনগুলি তো আখেরাতের জন্য বোঝা ও শাস্তিস্বরূপ।

তৎকালীন বহু বিখ্যাত বুজুর্গ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খানকায়ে মাসুমীয়া হইতে তরিকার শিক্ষা এবং ফয়েজ বরকত লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পিতার গুণ্ড মারেফতের রহস্যসমূহ এবং মারেফতের অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর রচনা ও মকতুবসমূহে যে সমস্ত মারেফত সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই, সেইগুলি অতি যত্নের সহিত তাঁহার নিকট সুরক্ষিত ছিল।

হিন্দুস্তানের বিখ্যাত পণ্ডিত এবং শরীয়ত ও তরিকতের বিখ্যাত বুজুর্গ হজরত মিরজা জানেজানা র. এর সহিত তাঁহার রুহানী সম্পর্ক ছিল পরবর্তী দুই পুরুষের ব্যবধানে। কেবলাত্র মিরজা শহীদ র. এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ মোজাদ্দেরিয়া তরিকা হইতে ফয়েজ বরকত লাভ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। মিরজা শহীদ র. এর উত্তরাধিকারী এবং পরবর্তীকালে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণের দ্বারা তরিকার ও দ্বীনের যে বিশাল বাগান আবাদ হইয়াছিল ও বহু দূরদূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার হিসাব কেহ দিতে পারিবে না।

আল্লাহ্‌তায়ালার তাঁহার মনোনীত দ্বীন ইসলামের তরিকতে এবং মারেফতে হজরত খাজা মাসুম র.কে যে খাস পূর্ণতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিমাপে অনুমান করাও সম্ভব নয়।

তাসাররুফাত বা কারামত প্রদর্শন করা যদিও কোন কামেল বুজুর্গের উদ্দেশ্য নয়, তবু অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বহু কার্য ও ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাহার কিছু কিছু কোন কোন বিশেষ সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে। হজরত খাজা মাসুম র. এর জীবনেও এই ধরনের বহু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

হজরত খাজা মাসুম র. হজ্জের সফরে বাহির হইয়াছেন। এমন সময় শাহজাদা আলমগীর (পরবর্তীকালে বাদশাহ্‌ আওরঙ্গজেব) তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া অত্যন্ত আদবের সহিত হজরতের কদমবুসি করিলেন এবং পথিমধ্যে সফর সঙ্গীগণসহ তাঁহার খরচের জন্য বিনয় ও সম্মান সহকারে হজরতের নিকট বারো হাজার টাকা নজরানাস্বরূপ পেশ করিলেন। হজরত খাজা মাসুম র. শাহজাদার বিনয় ও নম্রতায় খুব খুশী হইয়া তাঁহাকে সুসংবাদ দান করিলেন। শাহজাদা তাহা লিখিয়া দিবার জন্য আরজ করিলে হজরত স্বহস্তে তাহা লিখিয়া দিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় ঐ সুসংবাদ অনুযায়ী শাহজাদা আলমগীর দিল্লীর বাদশাহী লাভ করিয়াছিলেন।

হজ্জের সফরে মদীনা শরীফ হইতে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে হজরত মাসুম র. বিপথগামী ও শত্রুভাবাপন্ন শাহজাদা দারাশিকো (শাহজাদা আলমগীরের বড় ভাই)

এর ব্যাপারে হজরত রসুলে করিম স.কে অসিলা গ্রহণ করায় নবী করিম স. এর ইশারা অনুযায়ী দারাশিকো নিহত হইয়াছিলেন এবং শাহজাদা আলমগীরের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রধান বাধা অপসারিত হইয়াছিল।

মক্কাশরীফে অবস্থানকালে হজরত তাঁহার বড় ভাই খাজা মোহাম্মদ সাঈদ র. এর অসুখের খবর জানিতে পারেন এবং তাঁহার সুস্থতার জন্য তিনি দোয়া করিলে খাজা সাঈদ র. সুস্থ হইয়া উঠেন। পরে হজরত বলিয়াছিলেন, আমি যখন আমার বড় ভাইয়ের সুস্থতা প্রার্থনা করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে হাত উঠাইয়াছিলাম, তখন আমার সহিত সমগ্র মাখলুকও দোয়ায় শরীক হইয়াছিল।

মারেফত হাসিলের প্রথম দিকে হৃদয় যেন ভাবাবেগে সমুদ্রের মত উন্মাতাল হইয়া উঠে। কামালত লাভের পর সে হৃদয় ধীরে ধীরে প্রশান্ত হইতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার সহিত ক্রমশঃ একীভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু হঠাৎ কোন কোন সময় কোন শেরেকি কিংবা বেদাতী কার্যকলাপ দেখিলে সেই প্রশান্ত হৃদয়ও জোশে গর্জন করিয়া উঠে, আল্লাহ্‌পাকের শানে সেই কুফরী ও ভগ্নমীর তখন পরিসমাপ্তি ঘটে।

হজরত খাজা মাসুম র. এর জামানায় এক সন্ন্যাসী তাহার যাদুর প্রভাবে আগুনের দাহিকা শক্তিকে নিবারণ করিয়া তাহার সেই যাদু দ্বারা সে লোকজনকে আকৃষ্ট করিত। একদিন এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া হজরতের অন্তরে ও বাহিরে প্রবল গয়রতের সৃষ্টি হইল। তিনি তাঁহার মুরিদগণকে তখনি এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে লেলিহান সেই অগ্নিশিখার দিকে ফুক দিয়া তিনি কালাম পাক হইতে আয়াত শরীফ পাঠ করিলেন এবং আগুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আগুন, তুমি ইবরাহীম আ. এর মত আরামদায়ক শীতল হইয়া যাও। ইহার পর এক ব্যক্তিকে সেই অগ্নিকুণ্ডে বসিয়া জিকির করার জন্য আদেশ করিলেন। উক্ত ব্যক্তি আদেশ অনুযায়ী নির্দিধায় সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিকিরে রত হইলেন। পরে দেখা গিয়াছিল, সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার জন্য ফুলের বাগানের মত আরামদায়ক স্থানে পরিণত হইয়াছিল। আল্লাহ্‌পাকের পাক কালামে বর্ণিত হাজার হাজার বৎসর পূর্বের এক নিদর্শন তাঁহার ইচ্ছায় এই ভাবে হজরত মাসুম র. এর অসিলায় হিন্দুস্তানে আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

হজরতের খাদেম ও মুরিদ জনৈক হেকিম সাহেব কোন এক আমীরের চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু হেকিম সাহেবের ঔষধে সেই আমীরের অসুখ উপশম হওয়ার পরিবর্তে আরও বাড়িতে থাকিলে আমীর তাঁহার প্রতি রুষ্ট ও রাগান্বিত হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলে হেকিম সাহেব ভীত হইয়া হজরতের

খেদমতে আসিয়া সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সবিশেষ আরজ করিয়া নির্দেশের অপেক্ষায় হজরতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হজরত মাসুম র. হেকিমের মনের উদ্বেগ বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি পূর্বে হেকিম ছিলেন না, তবে এখন হইতে তাহা হইয়া গেলেন। আপনার অসুস্থ আমীরকে অমুক অমুক ঔষধ দুইটি সেবন করিতে দিন, ইনশাআল্লাহ্ তিনি অচিরেই সুস্থ হইয়া উঠিবেন। হজরতের নির্দেশ মোতাবেক হেকিম সাহেব সেই ঔষধ দুইটি আমীরকে সেবন করাইলে আমীরের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল এবং অচিরেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

হজরত খাজা মাসুম র. এর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন সময়ে ও বহু ঘটনাবলীতে অসংখ্য তাসারুফাত বা কারামতসমূহ ছড়াইয়া আছে। কিন্তু এই অল্প পরিসরে বিধৃত তাঁহার জীবনকাহিনীতে সেই সমস্ত কারামতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা আসল উদ্দেশ্য নয়।

হজরত খাজা মাসুম র. খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, একনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না এবং কাহাকেও ভয় করিতেন না। একমাত্র মা'বুদ আল্লাহুতায়ালার ভয়ে তিনি সব সময় ভীত থাকিতেন। তিনি প্রায় বলিতেন, জীবনের উত্তম অংশ কামনাবাসনায় অতিবাহিত হইয়াছে। শেষ বয়সের এই নিষ্কর্মা জীবন তো বোঝাস্বরূপ। এই বয়সের আমল ও ইবাদতের উপর আর কতটুকু নির্ভর করা যায়। অজ্ঞতার কারণে এখন লজ্জায় ও ভয়ে মরিয়া যাইতেছি। সামনে অনন্তকালের সফর, কিন্তু সেই সফরের জন্য কোন সামান আমি এখনও পর্যন্ত গোছগাছ করিতে পারি নাই।

হজরত খাজা মাসুম র. এক অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মুরিদদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন থাকিতেন। তাঁহার প্রভাবে সকলেই প্রভাবান্বিত হইতেন। মুরিদগণের ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁহার সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। সকলের সঙ্গে তাঁহার এক অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহুতায়ালার পরিচয় লাভ করার আশায় আশাধারী খাঁটি মুরিদগণের ফানা ও বাকা, তাঁহার পবিত্র সহবত ও তরবিরতের ফলে, এক সপ্তাহের মধ্যে হাসিল হইত এবং একমাসের মধ্যে সেই সব তালেবে মওলা বেলায়েতের মাকামে পূর্ণতা লাভ করার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী হইতে পারিতেন।

অন্যান্য মুরিদগণের মত বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবও মাঝে মাঝে সেরহিন্দ শরীফে হজরত খাজা মাসুম র. এর মজলিশে হালকা শরীক হইতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত মজলিশের পবিত্রতা ও নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া চলিতেন। দিল্লীর বাদশাহ্

হওয়া সত্ত্বেও মজলিশে হজরত মাসুম র. এর সম্মুখে তিনি মুখে কিছু আরজ করিতেন না, প্রয়োজন হইলে তাঁহার লিখিত আরজি হজরতের নিকট পেশ করিতেন।

হজরত নিজে কোন মজলিশে যোগদান করিলে, অতি সাধারণভাবে মজলিশের যেখানে খালি জায়গা দেখিতেন সেইস্থানে বসিয়া পড়িতেন। তাঁহার মধ্যে কোন গর্ব বা অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না।

তাঁহার নয় লক্ষ মুরিদান এবং সাত হাজার খলিফা ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে মুরিদগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি-অবনতির খবর রাখিতেন এবং তাহাদের হাল অনুযায়ী উপদেশ ও সবক প্রদান করিতেন। যে কোন মুরিদ বা সাধারণ লোকের বক্তব্য তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং সমস্যা ও অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন অথবা অন্যভাবে সমস্যার সমাধান করিতেন। মুরিদান ও খলিফাগণের সহিত তিনি নিয়মিতভাবে পত্রের আদান-প্রদান করিতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেককে তাহার অবস্থার উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ প্রেরণ করিতেন এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মারফত সংক্রান্ত গুটতত্ত্বের ব্যাখ্যাসমূহ প্রদান করিতেন। দ্বীনের কাজে এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতেই তিনি অধিকাংশ সময় নিয়োজিত থাকিতেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. সর্বাত্মে হজরত নবী করিম স. এর শরীয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করিতেন। সর্বশেষ নবী হজরত রসুলুল্লাহ স. এর জামানায় সাহাবায়ে কেরামগণ যেরূপ ভাবে শরীয়ত ও সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করিয়া পরিপূর্ণ ইমান ও একিনের সহিত সর্বোত্তম সৎ উপায়ে জীবন যাপন করিয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া গিয়াছেন, হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. তেমনি সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা ও বাতিল পথ হইতে দ্বীনের সংস্কার সাধন করিয়া ইসলামকে সেই একই ভাবে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। পরে এই কাজের দায়িত্ব হজরত মাসুম র. এর উপর আসিয়া পড়িলে তাঁহার সযত্ন প্রয়াসে বহু সুন্নত পুনর্জীবিত হইয়া উঠে এবং তাঁহার জামানায় ইসলামের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে, পিতার জীবিত থাকা অবস্থায় শেষের দিকে কাইয়ুমিয়াতের বিরাট দায়িত্ব আল্লাহুতায়ালার তরফ হইতে তাঁহার উপর অর্পিত হয়। সেই সঙ্গে সমস্ত মাখলুকাত তাঁহার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার অফুরন্ত রহমত ও বরকতসমূহ যথাযথভাবে লাভ করিয়া তাঁহার কাইয়ুমিয়াত ও কুতুবিয়াতের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। সেই প্রাচুর্যময় রহমত ও বরকতের অবিরাম আদান-প্রদানের আধার হজরত খাজা মাসুম র. সকল সময় অত্যন্ত আজিজি ও

ইনকেসারীর সহিত সেই সৃষ্টিকর্তা ও সর্বময় প্রভুর ইবাদতে রত থাকিতেন এবং সমস্ত মাখলুকের মঙ্গলের জন্য অবিরত দোয়া খায়ের করিতেন।

রাত্রির এক তৃতীয়াংশ থাকিতে হজরত খাজা র. তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করিতেন। তিনি কমপক্ষে আট রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িতেন এবং এই নামাজে প্রতি দশরাতে একবার কোরআন শরীফ খতম করিতেন। প্রতি দুই রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজের পর মোরাকাবা করিতেন।

ফজরের আজানের পর দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িয়া তিনি মসজিদে যাইতেন এবং ফরজ নামাজের ইমামতী করিতেন। নামাজ শেষে বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া করিয়া হাজেরীনদিগের সহিত বসিতেন এবং ফযেজ বরকতের জন্য সকলের প্রতি তাওয়াজ্জাহ প্রদান করিতেন। সূর্য এক নেজা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠিলে চার রাকাত এশরাকের নামাজ পড়িতেন। অতঃপর ইস্তেখারার নামাজ হইতে ফারাগ হওয়ার পর উপস্থিত সকলের খোঁজখবর লইতেন এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃকপাত করিয়া স্ব স্ব মাকামে পূর্ণতাঅর্জনকারী তালেবে-মওলাগণকে পরবর্তী উচ্চ মাকামের সবক প্রদান করিতেন এবং অন্যান্য সকলকে প্রয়োজনীয় নসিহত ও নির্দেশ দান করিতেন।

তাহার পর আল্লাহপাকের পাক কালাম তেলাওয়াতে মশগুল হইতেন। তেলাওয়াত শেষে দোয়ার পর চাশতের নামাজ আদায় করিতেন।

দ্বিপ্রহরের খানা শেষে দোয়া মাছুরা পাঠ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। জোহরের আজানের পর মসজিদে যাইতেন। প্রথমে দুই রাকাত তাহইয়াতুল মসজিদ এবং পরে চার রাকাত ফি-যাওয়ালের নামাজ শেষ করিয়া চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িতেন। সুন্নত নামাজ শেষে ফরজ নামাজে ইমামতী করিতেন। ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িয়া আয়াতুল কুরসী পাঠ করিতেন এবং তাহার পরে আরও দুই বা চার রাকাত নামাজ পড়িয়া দোয়া করিতেন।

সাধারণতঃ জোহরের নামাজের পর দ্বীন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর গুরুত্বপূর্ণ মকতুবাৎ শরীফের ব্যাখ্যা করিতেন এবং মুরিদ ও খলিফাগণের নিকট পত্র ও পত্রের জবাব লিখিতেন। আজানের পর মসজিদে গিয়া দুই রাকাত তাহইয়াতুল মসজিদ ও চার রাকাত সুন্নত নামাজ শেষ করিয়া আসরের ফরজ নামাজের ইমামতী করিতেন। নামাজ শেষে দোয়া মাছুরা পড়িয়া দোয়া করিতেন এবং হাদীস শরীফ অথবা মকতুবাৎ শরীফ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক শিক্ষা প্রদান করিতেন। মাগরিবের নামাজের সময় হইয়া আসিলে হজরত খাজা র. একশতবার ইস্তেগফার

পাঠ করিতেন। মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত শেষে দোয়া মাছুরা পাঠ করিয়া ছয় রাকাত আওয়াবিনের নামাজ পড়িতেন। নামাজ হইতে ফারাগ হইবার পর মুরিদগণের হাল ও মাকামের প্রতি মনোযোগী হইতেন এবং তাঁহাদিগকে তাওয়াজ্জাহ প্রদান করিতেন।

হজরত খাজা র. সকল সময় পূর্ণ সতর্কতার সহিত ইস্তেনজার পর ভালভাবে অজু করিতেন। হজরত খাজা মাসুম র. এর দরবারে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। হজরত প্রত্যেক কাজের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সমস্ত কাজের আনজাম দিতেন। কয়েকজন খাস্ মুরিদ এই সকল কাজে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। মকতুবাতে মাসুমীর অন্যতম সংগ্রহকারী ও বিশিষ্ট আলেম হাজী মোহাম্মদ আশুরা বোখারী র. পর্যায়ক্রমে উপস্থিত মুরিদগণকে হজরতের নিকট হাজির করিতেন। হজরত মাসুম র. তাঁহাদের সকলের রহানী অবস্থা, শরীয়তের প্রতি দৃঢ়তা ও মাকামসমূহের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকের জন্য উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশাদি ব্যক্ত করিতেন এবং ফয়েজ ও বরকতের জন্য তাওয়াজ্জাহ প্রদান করিতেন। দরবারের অন্যান্য লোক তখন খতমে খাজেগানে নিয়োজিত থাকিতেন। সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার পর সময় পাইলে তিনি খতমে শরীক হইতেন এবং খতম শেষে মোনাজাতের পর লোকজনকে তরিকায় দাখিল করিতেন। বায়াত করার ব্যাপারে তাঁহার ধরাবাঁধা কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যে কোন সময়ে তিনি লোকজনকে তরিকাভুক্ত করার কাজে আগ্রহী থাকিতেন।

এশার ফরজ নামাজের পূর্বে হজরত প্রায়ই চার রাকাত নামাজ পড়িতেন। ফরজের পর দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ আদায় করিতেন। অতঃপর তিন রাকাত বেতের নামাজের পর তিনি বসিয়া দুই রাকাত নামাজ পাঠ করিতেন। প্রত্যেক নামাজ শেষে তিনি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র দীনহীন গোনাহ্গার মনে করিয়া অত্যন্ত আজিজি ও নম্রতার সহিত কাতরভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত ও রহমতের মুখাপেক্ষী হইতেন এবং গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুন্দর স্বভাব ও আল্লাহ্‌পাকের নেয়ামতসমূহের জন্য আরজি পেশ করিতেন।

গৃহে ফিরিয়া আলিফ-লাম-মিম-সেজদা ও তাবারাকাল্লাজি পাঠ করিয়া খাইতে বসিতেন। দস্তরখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং কাহারও পাত্রে খাবার কম দেখিলে নিজ হাতে তাহার পাত্রে খাবার তুলিয়া দিতেন।

রাত্রির আহারের পর হজরত কিছুক্ষণ পায়চারী করিয়া অন্দর মহলে অপেক্ষারত মহিলাদিগকে তাওয়াজ্জাহ প্রদান করিতেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে

আগত মহিলাগণকে যাহাতে ঘরে ফিরিয়া যাইবার পর কষ্ট করিয়া রাত্রির খাবার পাক করিতে না হয়, সেজন্য তাহাদের পরিবার পরিজনদের সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণ আহার সামগ্রী দিয়া অত্যন্ত সম্মানের সহিত মহিলাগণকে বিদায় জানাইতেন।

রাত্রি কিছু অধিক হইলে হজরত অজু করিয়া চার রাকাত কেয়ামে লায়েল নামাজ পড়িতেন। কেয়ামে লায়েল নামাজ হইতে ফারাগ হইবার পর হজরত শায়েখ ইস্তেগফার তসবীহ তকবীর তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল হইয়া যাইতেন এবং অধিক রাত্রিতে দোয়া মাছুরা পড়িতে পড়িতে ডান দিকে ফিরিয়া শয়ন করিতেন। তাহার পর নির্দিষ্ট সময়ে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং পূর্ণ সতর্কতার সহিত এস্তেনজা সমাধা করিয়া ভালভাবে অজু করিতেন। অজু করিবার সময় যখন তিনি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করিতেন তখন মনোযোগের সহিত অজুর দোয়াসমূহ পাঠ করিতেন।

হজরত খাজা র. রমজান মাসে অধিকাংশ সময় ইবাদতে রত থাকিতেন এবং কথাবার্তা কম বলিতেন। অত্যন্ত সম্মানের সহিত তিনি রমজান শরীফের মাস অতিবাহিত করিতেন এবং কোথাও সামান্য ভুল ত্রুটিও যাহাতে না হইতে পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। আম-খাস্ নির্বিশেষে সকলকে ইফতারের দাওয়াত দিতেন এবং রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে এতেক্বাফ করিতেন। রমজান মাসের প্রতি আরও অধিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য খাদেম ও মুরিদগণকে তিনি কঠোরভাবে শরীয়তের নিয়মসমূহ পালন করিয়া চলার জন্য তাকীদ দিতেন এবং শায়েখের মহব্বত ও সহবত বেশী করিয়া হাসিল করিবার জন্য বলিতেন।

বড় ভাইদের প্রতি হজরত যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং সকল সময় আদব রক্ষা করিয়া চলিতেন। বড় ভাইয়ের পাক্কী যদি হজরত কখনও তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সম্মানের সহিত দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং পাক্কী অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত আসন গ্রহণ করিতেন না। একদা ইহা দেখিয়া জনৈক খাদেম জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, বড় হুজুরের পাক্কীতো অনেক দূরে থাকে এবং এই দিকে তিনি লক্ষ্যও করেন না, তবুও তাঁহার পাক্কী দেখিয়া হজরত কেন দাঁড়াইয়া থাকেন। উত্তরে হজরত খাজা র. বলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে দেখার পরে আমি তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইব, ইহা আমার মকসুদ নহে।

হজরত খাজা মাসুম র. প্রায়ই গঁটে বাতে ভুগিতেন। একবার এই বাতের আক্রমণে ব্যথার প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল এবং কোন ঔষধই ফলদায়ক হইল না। বাহ্যিক এই লক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন, ঔষধে আর কোন ফায়দা হইবে

না। জীবনের আয়ু এখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। শুধু মালিকের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার অপেক্ষা এখন।

কিন্তু তাহার পূর্বেই তিনি গায়েব হইতে সেই আলেমুল গায়েবের ইশারা পাইয়া গিয়াছেন। অনেকের উপস্থিতিতে হজরত একদিন বলিলেন, সব হাকীমের সেরা হাকীম যিনি, তাঁহার হেকমতে ঔষধের সমস্ত কার্যক্ষমতা আমার জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন ঔষধে আর কোন উপকার হইবে না। বন্ধুর নিকট হইতে খবর আসিয়াছে, আমাকে সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল, তাহা তিনি নিজ মেহেরবানিতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এখন শুধু শেষ প্রশংসার সময়টুকু বাকী।

ইহার পর হজরত নিজের আয়ত্বে আর কোন কিছু রাখিলেন না। এমনকি কুতুবখানা পর্যন্ত পুত্রগণের মধ্যে তকসীম করিয়া দিলেন। কখন সেই শেষ মুহূর্তের ডাক আসিয়া পড়ে কে জানে। নিজেকে তাই তিনি সবদিক হইতে খালি করিয়া দিয়া সেই অন্তিম ডাকের জন্য নিজেকে সবদিক হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। এখন খালি হাত-পা। নিঃসম্মল তিনি, সহায়-সম্মলহীন। কোন কিছু আর তাঁহার এখতিয়ারে নাই, কেবল যাওয়ার ইনতেজার এখন। সেজন্য তৈরী তিনি। নিজেকে সবদিক হইতে তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। ডাক আসা মাত্র সেই ডাকে সাড়া দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত।

হিজরী ১০৭৯ সনের ১০ই মহররম লোকজনকে সমবেত করিয়া হজরত খাজা র. তাহাদিগকে অসিয়ত করিলেন। বলিলেন, তোমাদিগকে সব সময় যাহা বলিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি। নূতন করিয়া বলার কোন কিছু নাই। স্মরণ রাখিও, সমস্ত জীবনব্যাপী ইবাদতের মূল কথা হইতেছে, কোরআন হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা। কখনও শরীয়তের বাহিরে পা রাখিবে না। ইজমা ও মোজতাহেদগণের অভিমত অনুসরণ করিবে।

সফর মাসের শেষে হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর উরস মোবারকের দিন আসিয়া পড়িল। হজরত মাসুম র. বৎসরে দুইবার উরস শরীফের আয়োজন করিতেন। প্রথমটা হজরত নবী করিম স. এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর ওফাত দিবস উপলক্ষে। পিতার পবিত্র উরসের দিনে সমবেত সকলের সম্মুখে হজরত মাসুম র. বলিলেন, এই পূত-পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে জনাবে রসুলুল্লাহ স. এর ওফাত হইয়াছে। আমার বেকারার দিল তো কেবল ইহাই চাহিতেছে যে, আমিও যেন শেষ সফরে এই রবিউল আউয়াল মাসে জনাবে রসুলেপাক স. এর অনুসরণ করিয়া তাঁহার খেদমতে হাজির হইতে পারি।

উরসের পর হজরতের অসুখের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষ বিদায়ের দুই দিন পূর্বে তিনি বুজুর্গানে দ্বীন এবং প্রতিবেশী সকলের নিকট হইতে ইমান ও আখেরাতের শান্তির জন্য শেষ দোয়া চাহিয়া লিখিলেন, ফকীর মোহাম্মদ মাসুম দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছে। জীবনের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তির জন্য এই ফকীর আপনাদের সকলের নিকট হইতে দোয়া ও সাহায্য কামনা করিতেছে।

ইহার জবাবে জনৈক বুজুর্গ ও শায়েখ এই কবিতা লিখিয়াছিলেন—

সংবাদের আওয়াজ পৌছে যায় প্রত্যেক বয়সী দরজায়,
সত্যের বাহক যারা স্মরণ কর সকলে দোয়ার আধারে,
এই পথে ময়ূরের সাথে বাঘ খাঁটি বন্ধুত্ব পাতায়,
মাটিও এখানে বেকারার রয় সেই দোস্তির খাতিরে।

ওফাতের আগের দিন হজরত মসজিদে নামাজ পড়িয়া বলিলেন, আগামীকাল এই সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকিব এমন আশা করি না। ইহার পর সংক্ষেপে সকলকে নসিহত করিলেন। পরদিন অর্থাৎ ওফাতের দিন ভোরে ফজরের নামাজ পড়িয়া হজরত শেষবারের মত মোরাকাবায় বসিলেন। মোরাকাবার পর যথা সময়ে ইশরাকের নামাজ আদায় করিলেন।

ইশরাকের নামাজ শেষ হওয়ার পরে তাঁহার শেষ ডাক আসিয়া পড়িল— যে ডাক আসিবার সাথে সাথে সাড়া দিবার জন্য তিনি সযত্নে নিজেকে এতদিন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম উরওয়াতুল উসকা কুদ্দিসা সিররুহ ৭২ বৎসর বয়সে ১০৭৯ হিজরীর নয়ই রবিউল আউয়াল ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলিতে বলিতে এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া অনন্তলোকের দিকে চলিয়া যান। হজরতের কোন কোন সাহেবজাদা বলেন, সেই সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হজরতের ঠোট নড়িতেছিল এবং তিনি তখন সূরা ইয়াসিন পড়িতেছিলেন।

মৃত্যুকালে হজরত ছয় পুত্র এবং ছয় কন্যা ছাড়াও নয় লক্ষ মুরিদান এবং সাত হাজার খলিফা রাখিয়া যান। পুত্রগণ তাঁহার পবিত্র সহবতে থাকিয়া ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সকলেই কামেল ছিলেন। হজরতের পুত্রগণের নাম যথাক্রমে— (১) মোহাম্মদ সেবগতউল্লাহ র. (২) শায়েখ মোহাম্মদ নকশ্বন্দ হুজ্জতউল্লাহ র. (৩) শায়েখ মোহাম্মদ আবিদউল্লাহ র. (৪) শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফ র. (৫) শায়েখ মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন র. ও (৬) শায়েখ মোহাম্মদ সিদ্দিক র.।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর পঞ্চম পুত্র হজরত শায়েখ সাইফুদ্দিন র. এর দ্বারা দ্বীন ইসলামের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং মোজাদ্দিদিয়া তরিকা আরও অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হজরত সাইফুদ্দিন র. এর বংশের অন্যান্য আওলাদগণ হজরত মোহাম্মদ স. এর নির্দেশিত পথে ইসলামী শিক্ষাকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সতত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হজরত শাহ আব্দুল গণী মোজাদ্দেদী ফারুকী র. হাদীসে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি হজরত মাওলানা নানতুভী র. এবং হজরত মাওলানা গাঙ্গুহী র. এর মত স্বনামধন্য কামেল বুজুর্গানে দ্বীনের হাদীসের ওস্তাদ ছিলেন। শাহ আব্দুল গণী র. এর পিতার নাম হজরত শাহ আবু সাঈদ র., পিতামহ হজরত সফিউল কাদের র., প্রপিতামহ হজরত আজিজুল কাদের র. এবং প্র-প্রপিতামহ ছিলেন হজরত শাহ ঈসা র. – যিনি হজরত সাইফুদ্দীন র. এর পুত্র ছিলেন।

হজরত খাজা মাসুম র. এর নূরান্বিত মাজার শরীফ সেরহিন্দে আজও লক্ষ লক্ষ তরিকাভক্ত ও আশেকগণের হৃদয়ে নূরের শামাদান জ্বালাইয়া দেয়।

বিখ্যাত ফারসী কবি নাসির আলী সেরহিন্দী হজরতের শানে তাঁহার ওফাত দিবসে এই সুন্দর কবিতাটি লিখেনঃ

নকশ্বন্দিয়া খান্দানের যে সেরা নক্ষত্র
দ্বীনের জ্যোতিতে আলোকময় সে তো খাজা মাসুম,
বিরান মুলুক হতে যে চলে গেল সেই অনন্ত
আবাদের পানে চির সবুজ বাগানে নহর মর্মরে;
যখন শুধাই নিজেকে কখন ঘুমাল সে শেষ ঘুম,
ওপার থেকে ধ্বনি এলো ভেসে, যে গেছে সে গেছে চিরতরে।

ফারসীতে লেখা এই কবিতার বিশেষ হরফগুলির সংখ্যাভিত্তিক মান হইতে হজরত খাজা মাসুম র. এর ওফাতের হিজরী সন নির্ধারণ করা যায়।

হজরত নবী করিম স., তাঁহার আহলে বায়াত, সাহাবায়ে কেরাম, শরীয়তের দৃঢ় অনুসরণকারী ও সুন্নত পালনকারী মকবুল ও ইমানদার উম্মতগণের সহিত হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. ও হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর উপরেও অনন্তকালব্যাপী আল্লাহ্‌তায়ালার অফুরন্ত অনুগ্রহের ধারা বর্ষিত হউক।
আমীন।



শমশের খানের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১

আল্লাহ্‌তায়াল্লা তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা যেন তোমার নিজ সৌভাগ্যের অস্তিত্ব ও প্রাচুর্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং মুস্তফা স. এর সুন্নতের আনুগত্য দ্বারা তোমাকে সুসজ্জিত করেন। মোহাম্মদ হানিফ তোমার সহৃদয়তা সম্পর্কে অনেক কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে নসিহতপূর্ণ একটি পত্র তোমার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ অনুরোধের খাতিরে সাধারণভাবে সংক্ষেপে সামান্য কিছু লিখিলাম।

হে আল্লাহ্র বান্দা, মনে রাখিও, আল্লাহ্‌তায়াল্লা মানুষকে কখনও অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করেন নাই এবং তাহাকে তাহার মর্জি বা খেয়াল খুশীর উপর ছাড়িয়া দেন নাই যে, সে নিজ ইচ্ছামত যাহা খুশী তাহা করিবে এবং ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া জীবন যাপন করিবে। বরং আল্লাহ্‌তায়াল্লা মানুষ এবং এই দুনিয়ার সব কিছুকে কোন না কোন উদ্দেশ্যের সহিত সৃষ্টি করিয়া সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর মুখাপেক্ষী করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সেই সমস্ত হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা এবং তাঁহার অভিপ্রায় ও নির্দেশের বরখেলাপ আকাংখাসমূহকে পরিত্যাগ করা ছাড়া কোন উপায় নাই। তাহা যদি পালন না করা হয় তাহা হইলে স্বেচ্ছায় হক মাওলার গজব ও ক্রোধের এবং আজাব ও যন্ত্রণার দাবীদার হিসাবে পরিগণিত হইতে হইবে। সেই ব্যক্তি সত্যিই সৌভাগ্যবান, যিনি মওলার হুকুমসমূহ তামিল করিবার জন্য হিম্মতের সহিত কোমর বাঁধিয়াছেন এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করিবার জন্য সর্বদা সেই খেয়ালে ও ফিকিরে রত রহিয়াছেন।

এই দুনিয়া প্রকৃত পক্ষে কৃষিকার্যের স্থান। কৃষিকার্যের সময় আরাম ও আয়েশে মশগুল থাকা হইতে এবং নশ্বর আনন্দে জড়িত রাখা হইতে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখিতে হইবে। কারণ দুনিয়াতে সঠিক পদ্ধতির (সহি তরিকার) উপর জীবন যাপন করিতে পারিলে তবে আখেরাতে তাহার (দুনিয়ার কৃষিকার্যের) ফল ভোগ করা যাইবে। কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছানুযায়ী জীবন

যাপনের চিরস্থায়ী আনন্দকে পরিহার করিয়া ক্ষণিকের জন্য ধ্বংসশীল আনন্দের প্রতি কখনও প্রণয়াসক্ত হইতে পারে না।

সঠিক আকিদার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের (যাহারা আল্লাহ্‌পাকের কিতাব ও সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন) সান্নিধ্য লাভ করা বিশেষ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে এবং নিষিদ্ধ বস্তু ও কার্যসমূহ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে না পারিলে সমস্ত কিছু ব্যর্থ ও বিফল হইয়া যাইবে।

নামাজ^{৩/৪}সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ততম আনুগত্য ও ভক্তি নামাজের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। নামাজ হইতেছে দ্বীনের স্তম্ভ যাহা মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান স্বরূপ। আর নামাজ আদায়ের সময় যে নৈকট্য লাভ করা যায়, নামাজের বাহিরে তাহা অর্জন করা দুঃসাধ্য। কাজেই কলবের সমস্ত একাগ্রতা, হুজুর, তা'দীলে আরকান ও পরিপূর্ণ অজুর সহিত সময়মত মুস্তাহাবসহ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সহিত পড়িতে হইবে।

জাকাত^{৩/৪}অর্জিত অর্থ হইতে আশ্রয়ের সহিত জাকাত প্রদান করা উচিত। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে যে, সদ্কা ও জাকাত দ্বারা ধন ও মালের পরিমাণ কমে না। আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং খরচের পর যে ধনমাল উদ্ধৃত থাকে তাহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১/৪০ অংশ জাকাতের জন্য ফরজ করা হইয়াছে। জাকাত প্রদানে আমরা যদি অলসতা করি কিংবা কোনরকম গড়িমসি করিয়া জাকাত প্রদান করা হইতে বিরত থাকি, তাহা হইলে সত্যিই বড় বে-ইনসাফী করা হইবে। জান এবং মাল সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌তায়াল। যদি আল্লাহ্‌তায়াল। সমস্ত ধন দৌলত ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য আদেশ করেন এবং এই জীবনকে তলব করেন তবু আল্লাহ্‌তায়ালার নেক বান্দা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জান ও মালের উৎসর্গ করাকে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে।

যদি সেই মিলনই তোমার একান্ত কাম্য হয়
এবং মনে কর তা প্রাণের চেয়ে ঢের দামী,
তবে নিরলস খুঁজে নাও সে আশ্বাদ বরাভয়,
মিলনের সাথে জীবনের মালিকও তো অন্তর্যামী।

রোজা^{৩/৪}মাহে রমজানে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রোজা রাখিতে হইবে। রমজানের এই তাৎপর্যপূর্ণ 'ক্ষুধা ও তৃষ্ণা'কে নিজের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, আদম আ. এর সন্তানগণ (ইবনে আদম) অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিটি সৎ আমলের জন্য দশগুণ হইতে

সাত শতগুণ পর্যন্ত ছওয়াব লাভ করে। আর আল্লাহুতায়াল্লা বলেন, রোজা (যাহার ছওয়াব পরিমাণ দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না) কেবল মাত্র আমার জন্য— ইহার পুরস্কার আমি নিজে ন্যায়পরায়ণতার সহিত খুশীমত দান করিব (অর্থাৎ আমি নিজেই তাহার পুরস্কারস্বরূপ হইয়া যাইব)। ইনসান তাহার খায়েশ-খুশী ও পানাহার কেবল মাত্র আমার জন্য পরিহার করে— যাহার ফলস্বরূপ সেই সমস্ত রোজাদারের জন্য দুইটি সুসংবাদ রহিয়াছে, যাহার মধ্যে একটি সে ইফতার করার সময় লাভ করে এবং দ্বিতীয়টি সে সেই সময়ে পাইবে, যখন সে তাহার রবের সহিত মিলিত হইবে। রোজাদারের মুখের (পেট খালি থাকার জন্য এক বিশেষ ধরনের) গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের খোশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধদায়ক। রোজা হইতেছে ঢাল অর্থাৎ সকল পাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্মস্বরূপ। যখন তোমাদের মধ্যে কেহ রোজা থাকে, তখন সে যেন কোন বেহুদা কাজ না করে এবং কেহ যদি তাহাকে কোন খারাপ কথাও বলে তাহা হইলে সে তাহাকে বলিয়া দিবে (অথবা নিজের অন্তরকে বলিবে) আমি তো রোজাদার। (বোখারী ও মুসলিম)।

হজ্ব ৩/৪ শরীয়তের বিধান মোতাবেক করণীয় হইলে অবশ্যই হজ্ব করিতে হইবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের অসিলায় আল্লাহুতায়াল্লার নৈকট্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে, কবুল হজ্জের ছওয়াব হইতেছে জান্নাত।

মুসলমানী বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে শাহাদতে তৌহিদ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদে সাক্ষী সম্পর্কিত এবং তাঁহার প্রেরিত বাণী ও পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস। বাকী চারটি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি জিনিসের মধ্যে যদি কোন একটি বাকী বা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে দ্বীনের আবাসস্থল বিরান থাকিয়া যাইবে এবং কাজ-কর্ম অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। সঠিক আকায়েদ ও সৎকার্যাদী পালন করার পর 'সুলুকে তরীকায়ে সূফীয়া' অর্থাৎ সূফীবাদের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করাও অত্যন্ত জরুরী, যাহাতে 'মারেফতে হক' অর্থাৎ আল্লাহুতায়াল্লার পরিচিতি লাভ করা যায় এবং কুপ্রবৃত্তিপূর্ণ কামনা ও বাসনাসমূহের প্রতারণা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি

টীকাঃ হজরত খাজা মাসুম র. এর সময়ে এই একই নাম ও উপাধিধারী তিন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়ঃ ১। 'শমশের খান বিন আলী খান তরীন— যাঁহার সম্পর্কে রামপুর রেজা লাইব্রেরীতে রক্ষিত তারিখে মোহাম্মদীর পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায় যে, শাহজাহান ও আলমগীরের রাজত্বকালে তাঁহার পিতা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কাবুল উপত্যকায় অবস্থিত কেন্নায় ১০৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। শমশের খানের মৃত্যু হয় ১০৮৩ হিজরীতে। ২। মীর মোহাম্মদ ইয়াকুব (যিনি শমশের খান নামে সমধিক পরিচিত) বিন শেখ মীর বিন মীর মোহাম্মদ জান খোয়ানী। তিনিও বাদশাহ আলমগীরের ওমরাহগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আফগানিস্তানের কাবুল যুদ্ধে তিনি নিহত হন বলিয়া তারিখে মোহাম্মদী হইতে জানা যায়। ৩। শমশের খান ইবনে শের খান ছিলেন বাদশাহ শাহজাহানের ওমরাহগণের মধ্যে একজন। তারিখে মোহাম্মদীর তথ্য অনুযায়ী ১০৫২ অথবা ১০৫৩ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পত্রের মালিক সম্ভবতঃ মীর মোহাম্মদ ইয়াকুব যাহাকে সকলে শমশের খান বলিয়া চিনিত।

বুঝিতে পারি না, কোন বান্দা তাহার স্রষ্টার মারেফত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এবং স্রষ্টাকে না চিনিয়া কেমন করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে এবং কিভাবে সে অন্যান্য বস্তুসমূহের মধ্যে সম্ভ্রষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার হাল তো এই রকমই হওয়া উচিত ছিল—

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু,
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুঁজিয়া মরে,
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২

পূর্ণ মনোযোগসহকারে আদবসমূহ প্রতিপালন না করিলে কখনও ফয়েজ ও তরিকার বরকত পাওয়া যায় না। কোন বে-আদব আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছায় নাই। অন্তরের সহিত আদবের সম্পর্ক না থাকিলে ক্ষতির পাল্লা বলবান থাকে এবং লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

তোমাকে লিখিবার মত অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে, সঠিকভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার কর এবং মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় ব্যয় কর। বিনা কাজে সময় যাহাতে অতিবাহিত না হইয়া যায় সেদিকে খেয়াল রাখ। লোকজনের সহিত অধিক মেলামেশা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবে, কেননা বিনা প্রয়োজনে অধিক মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা— ‘নেসবতে বাতেন’ অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে সংযোগের উজ্জ্বল আলোকরশ্মিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। সং উদ্দেশ্য ব্যতীত মাখলুকের (সৃষ্টির) সহিত বেশী মেলামেশা সৃষ্টিকর্তার সহিত বিচ্ছেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বদ লোকের সঙ্গে হইতে পরহেজ কর। অর্থাৎ দূরে থাক এবং ভাল ও নেক লোকের সঙ্গে সেই পরিমাণ সহবত রাখ যাহা আল্লাহ্ তায়ালা সহিত সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে কোন রকম বিঘ্ন বা দূরত্বের কারণ না হইতে পারে।

নিজ মুরিদান ও ভক্তবৃন্দের সহিত এমন ব্যবহার করিবে— যেন তাহাদের দৃষ্টিতে তোমার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কায়েম থাকে। বাহ্যিক লৌকিকতা পূর্ণ এমন ব্যবহার করিবে না যাহার কারণে সে উদ্ধত হইতে পারে এবং তাহার সংশোধনে বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। ইদানিং অত্যন্ত শোকাভিভূত ও ব্যথিত থাকার কারণে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। শোকাভিভূত থাকার কারণ হইতেছে, ১০৫০ হিজরী সনের ৭ই জিলহজ্জ সোমবার রাতে আম্মাজান (হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর স্ত্রী) আমাদিগকে ছাড়িয়া আখেরাতের সফরে চলিয়া গিয়াছেন এবং আত্মীয়স্বজন সকলকে তাঁহার শোকে কাতর করিয়া বিলাপরত অবস্থায় ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার অজুদ মোবারক অর্থাৎ পবিত্র অস্তিত্ব দ্বীন দুনিয়ার সুখ ও সৌভাগ্য লাভের অসিলা এবং মহান প্রতিপালকের সম্ভ্রষ্ট লাভ করার জন্য বাতায়নস্বরূপ ছিল। এখন সেই পথ হইতে ফয়েজ প্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গেল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিউন।

আত্মীয়স্বজন এবং আপনজনেরা যেন তাঁহার জন্য ইসালে ছওয়াব করেন।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩

আল্লাহপাকের জন্য সকল প্রশংসা, তাঁহার রসুলের জন্য দরদ ও সালাম জ্ঞাপনের পর জানাইতেছি যে, এইদিকের ফকিরের অবস্থা কৃতজ্ঞতার যোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আল্লাহুতায়ালার নিকট তোমার সালামতী, শারীরিক সুস্থতা, শরীয়তের প্রতি অটল স্থৈর্য এবং মৌলিক দরযাতের (উচ্চস্তরসমূহের) উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি।

হে সম্মানীয়, মৃত্যুর ব্যাপারে আঁচ-অনুমান তো মনে হইতেছে এবং (মৃত্যুর জন্য) নির্ধারিত সময় অতি নিকটবর্তী; কিন্তু আমার দ্বারা কোন কাজই হইল না। এত দূরবর্তী সফরের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন সামান (সাজসরঞ্জাম) গোছগাছ করা হইল না।

মৃত্যু দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তাহার পর ভয়াবহ প্রকম্পন ও বিস্ফোরণও হয়তো আসন্ন। হায়, এখন আক্ষেপ হয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল কামনা বাসনার লালসাতেই কাটিয়া গেল। এখন তো নির্মম সত্যের মত স্পষ্ট, বার্ষক্যের এই একেজো নিষ্কর্মা জীবনে আর এমন কী করা সম্ভব হইবে এবং এই সময়ের আমলের উপরই বা আর কতটুকু বিশ্বাস রাখা যায়। মূর্খতার কারণে লজ্জায় অবনত মুখ শরমে তুলিতে পারিতেছি না এবং আখেরাতে পেশ করিবার মত কোন ওজর আপত্তি মাথায় আসিতেছে না। জনৈক কবি কি সুন্দরভাবেই না বলিয়াছেনঃ-

পাপের সাফাই গেয়ে করবে হাজির কোন সে ওজর,
ঘামের বদলে যে কেবল মুখ ঢেকে খুন যায় ঝরে-
করতে গিয়ে প্রকাশ শুধু কেঁদে মরে বাহির ভিতর
তার মাঝে ফের পাপ এসে যে বাড়ায় মরণ অন্তরে।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য ও তাঁহার রসুলের প্রতি দরুদ ও সালাম। তোমার লিখিত সুন্দর পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পত্রে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম এবং উচ্চ পর্যায়ের।

‘বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার এলেম (জ্ঞান)কে তুমি বাড়াইয়া দাও’ (আল কুরআন)। মুরিদদের দেখাশোনা ও সংশোধনের কাজে সর্বদা পরিশ্রমী ও বে-আরাম থাকিবে। শীতল কলব ও বে-ফিকরী (উদ্বেগহীন) অবস্থা (অর্থাৎ আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে ভয়-ভাবনাহীন নিরুদ্ধেগ অবস্থা) যেন আল্লাহুতায়ালা দুশমনদের জন্য নির্ধারিত রাখেন।

টীকাঃ নিজ পুত্রগণ ব্যতীত মাওলানা মোহাম্মদ হানিফ র. হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. এর প্রথম খলিফা ছিলেন। খেলাফত দেওয়ার পর তাঁহাকে কাবুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সেখানে প্রতিবেশী ও নিকটবর্তী এলাকা হইতে অগণিত লোক তাঁহার মুরিদ হইয়াছিলেন। নিজ পীর ও মোর্শেদ কেবলা জীবিত থাকিতেই তিনি ১০৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর কারণে মোর্শেদ হজরত খাজা মাসুম র. অত্যন্ত শোকাহত হইয়া পড়েন। তাঁহার মাজার শরিফ কাবুলের নিকটে আমাখাতুগাঁওয়ে অবস্থিত (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড)।

একজন বুজুর্গ বলিয়াছেন, দুর্ভাবনা ও অশান্তির নামই হইতেছে তাসাওফ (সুফীবাদে আল্লাহর সন্ধানে রত থাকা)। যখন শান্তি আসে তখন আর তাহা তাসাওফ থাকে না। প্রেমিক কখনও দুর্ভাবনা ও ব্যথাহীন অবস্থায় থাকিতে পারে না। দুঃখকষ্টের মর্মজ্বালা ব্যতীত কোন আরেফের অস্তিত্ব নাই। এই পৃথিবীর গর্ব এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্তবাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাবনা যেখানে তুলনাহীন সেখানে অন্যান্যদের প্রসঙ্গে আর বলার কী থাকিতে পারে।

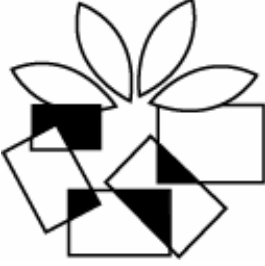
ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া আ'লা আহলে বাইয়িতুকুম।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫

সম্মানীয় ভ্রাতা মাওলানা মোহাম্মদ হানিফ, নবী করিম স. এর সুন্নত অনুসরণ ও পায়রবির জন্য সালাম। অনেক দিন হইতে তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, যে জন্য চিন্তায় আছি।

সময় কেবলমাত্র কাজ করিবার জন্য। কথাবার্তায় সময় নষ্ট করিবার মত সময় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে কান্নাকাটি করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনার দ্বারা রাত্রির কালো অন্ধকারকে রঙশন (আলোকময়) করিয়া তোল এবং কলেমা তৈয়বের প্রাচুর্য দ্বারা সকল সময় জিহ্বাকে সিক্ত রাখ। অভ্যন্তরীণ অবস্থাদৃষ্টে অবসর সময়ে কোরআন মজিদ তেলওয়াতের মাধ্যমে অধিক সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিয়া লও। দীর্ঘ কেরাত দ্বারা নফল নামাজ পড় এবং যত্নের সহিত শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট থাকার চেষ্টা কর।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৬

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা এবং নামাজ ও রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নত অনুসরণকারীদের প্রতি সালামের পর জানাইতেছি যে, এখানকার ফকিরের অবস্থা ও হাল হকীকত আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় প্রশংসার উপযুক্ত। দীর্ঘকাল যাবৎ তোমার কোন চিঠিপত্র পাই নাই- পাওয়ার অপেক্ষায় আছি।

আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বপ্রকার নিরাপত্তা, উত্তম স্বাস্থ্য ও শান্তির মৌলিক ধারা (যাহা সেই স্রষ্টা ও প্রভুর ইবাদত বন্দেগী করিয়া পাওয়া যায়) প্রদান করুন এবং বিপদ-আপদ হইতে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখুন।

মৃত অথবা মৃতপ্রায় সুন্নতসমূহকে জীবিত করার জন্য সাহসের সহিত কোমর বাঁধ। বিশেষ করিয়া সেই সময়, যখন বে'দাত ও অধর্মের অন্ধকার বিশ্ব-জগতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তখন মৃত ও মৃতপ্রায় সুন্নতসমূহকে জীবিত করা সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাজ। আঁ হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার কোন মৃত সুন্নতকে যদি কেহ জীবিত করে, তাহা হইলে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে- এই হাদীস তুমিও শুনিয়া থাকিবে। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের সংসর্গের (সহবতের) প্রতি আকৃষ্ট হইও না। দারিদ্র্যতাকে মূল্যবান বলিয়া মনে করিবে এবং মনে প্রাণে সংযম ও পরহেজগারীর আকাংখায় রত থাকিবে। কোন পাপকে ছোট মনে করিবে না।

বহু দূরে পড়িয়া থাকা এই পত্র লেখককে দোয়া ও খায়েরের সঙ্গে স্মরণ রাখিও।

যে কাজ রয়েছে আহা সম্পদে ভরপুর
কাকে তুমি দিবে তুলে সেই পূতংনূর।
ওয়াস সালামু আলাইকুম।



হাজী মোহাম্মদ আ'শুর বোখারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৭

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তুফা- সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হউক।

বিশ্বের সরদার, সৃষ্টির গৌরব হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া
সাল্লাম, এমন কি মহৎপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম রদ্দিআল্লাহু আলায়হিম আজমাইনগণ
যাঁহারা আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহবতের বরকতে,
ধর্মে পরিপূর্ণতা, আল্লাহ্‌তায়ালার উপর নির্ভরশীলতা ও মুখাপেক্ষিতা, সত্য ও
ন্যায়ের জন্য সহিষ্ণুতা, অনমনীয়তা ও নির্ভীকতা, ধৈর্য ও ত্যাগ, সহনশীলতা ও
অল্পে সন্তুষ্ট থাকার মত প্রশংসিত গুণাবলীর জন্য অমর ও তুলনাহীন হইয়া
আছেন- তাঁহাদের হৃদয় ও দেহের (কলব ও কারাবের) গভীরে, আকৃতিগত এবং
প্রকৃত মূলতত্ত্বের (সুরত ও হকীকতের) এই সংযোগ এবং এই সকল পরিপূর্ণতা
সর্বাংশে উজ্জ্বল দ্যুতির সমন্বয়ে সজ্জিত হইয়া থাকিত। বাকী সমস্ত উম্মতগণ যত
চেষ্টা এবং কষ্ট করুক না কেন, ঐ রকম সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাইতে
পারিবে না এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। খুব বেশী
হইলে উচ্চ মর্তবার মর্যাদাসম্পন্ন পীরদরবেশগণের (মাশায়েখের) বাহ্যিক ও
অভ্যন্তরীণ আকৃতি (সুরত) হইতে এই সংযোগ সম্পর্কে কিছু আঁচ-আন্দাজ করা
যায় এবং প্রাণপণ চেষ্টা চরিত্র দ্বারা সম্মানিত সাহাবাগণের জাহেরী মিল হাসিল
করা যায়।

টীকাঃ হাজী মোহাম্মদ আ'শুর বোখারী হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা
এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। পীর ও মোর্শেদ তাঁহার উপর অত্যন্ত মেহেরবান ছিলেন।
তিনি মকতুবাতে মাসুমীয়ার একটি খণ্ড (জিলদ) সংকলন করিয়া ছিলেন (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া,
দ্বিতীয় খণ্ড)।



মোল্লা আবদুর রাজ্জাকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৮

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তাফা- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুপাকের জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হউক।

তাই মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহার জবাব অবকাশ মত প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত হইল।

প্রথম ও ষষ্ঠ প্রশ্নের জিজ্ঞাসা ছিল, তরিকায় দাখেল হওয়ার পূর্বে তিনি যে সমস্ত তসবীহ তাহলীল ও কোরআন শরীফের সুরাসমূহ নিয়মিতভাবে অজিফা হিসাবে পাঠ করিতেন, তাহা এখনও পড়া যাইবে কি না, তাহাজ্জুদ ও চাশতের নামাজ পূর্বের মত এখনও জারি থাকিবে কিনা এবং ফেকাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়নসহ কোন কোন নির্দিষ্ট সূরা এখনও মুখস্থ করা যাইবে কি না?

ইহার জবাব হইতেছে, তরিকতে আসার পর প্রাথমিক অবস্থায় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা ব্যতীত আর অন্য কোন কিছু নির্ণয় করা হয় না- তরিকাতুজ্জদের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় আমি ইহা নির্ধারিত করিয়া থাকি। যেহেতু তুমি এই প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছ, সেই হিসাবে তোমার উচ্চ পর্যায়ের জন্য সুন্নত অনুযায়ী তসবীহ তাহলীল ছাড়াও জিকির, তাহাজ্জুদ, চাশত ও আওয়াবিনের নামাজ পড়ার অনুমতি রহিল। ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত সুন্নতসমূহও তুমি পালন করিবে। তাহাজ্জুদের নামাজ এবং অধিক রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করাকে তো সুফিগণের তরিকার অত্যাৱশ্যকীয় অংশ বলা যাইতে পারে।

শিক্ষাদীক্ষা তরিকতের পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ এই কাজ যদি বিগত নিয়তে করা হয় তাহা হইলে উহা বাতেনী নেসবতের (অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের) জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। আনন্দের সহিত দ্বীনি কেতাবসমূহের পড়াশুনায় মশগুল থাক এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আগ্রহী হও। অবশ্য শিক্ষার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন কর এবং বাকী সময়কে জিকির ও ফিকিরের (স্মরণ ও চিন্তার) মাধ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া তোল। কোরআন শরীফের সুরাসমূহও অবশ্যই মুখস্থ করিবে।

টীকাঃ মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা ছিলেন (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, ফরজ ও সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন আমল কোন বুজুর্গের অনুমতি ছাড়া যেন করা না হয়— এই কথা জনসাধারণের মধ্যে মশহুর হইয়া আছে, তাহা কতদূর সত্য?

ইহার জবাব হইতেছে, যে সমস্ত আমলে হুসনা (সৎ কার্যাবলী) সম্পর্কে আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে— যাহা আঁ-হজরত স. এর বিশেষ অংশের মধ্যে নয়, তাহা আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিবার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং হুজুর স. এর আমল তাঁহার সমস্ত উম্মতের জন্য চিরস্থায়ী অনুমতি ও সনদ।

অবশ্য কিছু কিছু আমল ও জিকির এবং দোয়া-দরুদ যাহা সাংসারিক হাজত (প্রয়োজন) পূরা হওয়ার জন্য এবং মুশকিল আসানের ব্যাপারে চেষ্টা করার জন্য রহিয়াছে, তাহার উপযোগিতা মোর্শেদ অথবা ওস্তাদের অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত হইয়া থাকে।



হাজী হারমেন মীর গজনফরের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৯

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য এবং তাঁহার রসুলের জন্য দরুদসমূহ। আল্লাহতায়ালায় নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে, তুমি সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে উপনীত হইয়াছ, হজ্ব ও ওমরা সম্পন্ন করিয়াছ, সেই সঙ্গে পবিত্র স্থানসমূহ (মোকামাতে মোকাদ্দস) এবং ইহকাল ও পরকালের নেতা (সরদার) রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত করার সৌভাগ্য তোমার হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে ঐ সমস্ত এলাকার খাস বরকতসমূহের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহার পরে জামাতের সঙ্গে ভালভাবে নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছ।

টীকাঃ মীর গজনফর বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে একজন বিশিষ্ট ওমরাহ ছিলেন। তিনি ১১ই রমজান ১০৯১ হিজরীতে আজমীরে ইস্তিকাল করেন (তারিখে মোহাম্মদী, রেজা লাইব্রেরী রামপুর)। রওজাতুল কাইয়ুমিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাকে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খলিফা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমার কাছে তুমি জলদি চলিয়া আস, আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি এবং কাবাসরীফের তীর্থযাত্রীর যে মকসুদ পূর্ণ হইয়াছে তাহার দোয়া ও বরকতের প্রত্যাশায় আছি।

কাছে এস, আরও কাছে, নিভৃত সান্নিধ্যে
তবে তো পরিচয় হবে দু'জনের মধ্যে।



একজন পুণ্যময়ী খাতুনের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১০

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, নিজের জীবদ্দশায় নিজের জন্য কবর তৈরী করিয়া রাখা সুন্নত তরিকা অনুযায়ী জায়েজ কিনা?

ইহার জবাব হইতেছে, হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়তকালে, খোলাফায়ে রাশিদীনের সময়ে ও সাহাবায়ে রাদিআল্লাহু আলায়হিম আজমাঈনদিগের নিকট হইতে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য ওমর বিন আব্দুল আজিজের মত উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক পূর্বজামানার ব্যক্তি-বিশেষ হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের জীবদ্দশায় নিজ নিজ কবর তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলেম-ওলামাগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন রকম মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যাপারে কড়াকড়ি করার পক্ষপাতী, কেহ কেহ উদারপন্থী আবার কেহ বা দেখিয়া শুনিয়া ইহা গ্রহণ করেন।

আপনার অন্য প্রশ্ন ছিল, খাওয়ার ব্যাপারে আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস (আ'দত শরীফ) কি রকম ছিল?

ইহার জবাব হইতেছে, আঁ-হজরত স. প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণ আহার গ্রহণ করিতেন— যে পরিমাণ আহার দেহের ভারসাম্যের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। তিনি পেট ভরিয়া আহার করিতেন না। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত হইতে জানা যায়, রসুলেপাক স. কখনও পেটকে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেন না। আহারের সময় যে খাদ্যের সহিত সবচেয়ে বেশী হাত অংশগ্রহণ করিত অর্থাৎ বেশী লোক তাঁহার সহিত

আহারে শরীক হইতেন, সেই খাবার ছিল রসুলুল্লাহ স. এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও রুচিকর খাবার। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, রসুল স. এরশাদ করিয়াছেন, আদম সন্তানের খাওয়ার জন্য কয়েক লোকমা (খাস) খাবারই যথেষ্ট, যাহা তাহার পিঠকে সোজা রাখিতে পারে। যদি সেই পরিমাণ খাবারে সে সবর করিতে না পারে তাহা হইলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস গ্রহণের জন্য থাকিবে। আহার আরম্ভ করিবার সময় তিনি বিসমিল্লাহ পড়িতেন এবং এই আমল হইতেছে সুনুতে মোয়াক্কাদা।

অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় আঁ-হজরত স. এর ঘুমের পরিমাণও পরিমিত ছিল। তাঁহার হৃদয় (দিল মোবারক) ঘুমাইত না, কেবলমাত্র তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় শায়িত থাকিত।

আঁ-হজরত স. এর পোশাক কয়েক রকমের ছিল। তিনি সুন্দর মনোরম পোশাক দ্বারা তাঁহার দেহকে সজ্জিত করিয়াছেন, আবার মামুলী ধরনের সাধারণ পোশাকও পরিধান করিয়াছেন। সুতি কাপড়ের পোশাক তিনি বেশীর ভাগ ব্যবহার করিতেন এবং মাঝে মাঝে পশমী পোশাকও পরিধান করিতেন। মোদ্দা কথা এই যে, পোশাকের ব্যাপারে তাঁহার কোন প্রকার লৌকিকতা ছিল না, যে সময়ে যাহা পাইতেন তাহাই পরিধান করিতেন।

সোমবার ছিল, হজরত মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাব ও তিরোধানের দিবস। দিনের শেষ ভাগে তাঁহার ওফাত হইয়াছিল। মঙ্গলবার অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবার মধ্যাহ্ন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতের সূত্র অনুযায়ী রাত্রির শেষাংশে আঁ-হজরত সন্মিল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহ মোবারকের দাফন সম্পন্ন হইয়াছিল।

আহা ওই সুন্দর দাফন, যার অভ্যন্তরে
শায়িত পবিত্রতম তাঁর দেহ মোবারক,
যার খোশবুতে আপ্ত সারা ময়দান
রাতের প্রহরগুলো যার সাক্ষী বেশক;
যেখানে এখন থেকে আপনার বসবাস
সেখানে আমার হৃদয়কে করলাম উৎসর্গ,
পরম সম্মানীয় যে কবর কেবল থেকে যাবে
হয়ে চিরকাল অনন্ত রহমতের উৎস।

আঁ-হজরত স. এর বয়স সম্পর্কেও আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এই ব্যাপারে কয়েকটি মতবাদের কথা বর্ণিত আছে। এক উক্তি অনুযায়ী ৬০ বৎসর, আর এক বর্ণনা অনুযায়ী ৬৩ বৎসর যাহা সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত এবং অন্য

এক সূত্র অনুযায়ী ৬৫ বৎসর। আলেম-ওলামাগণ এইসকল মতামতকে এমনভাবে সমন্বয় করিয়াছেন যে, যাঁহারা ৬৩ বৎসরের পক্ষে বলিয়াছে তাঁহারা বেলাদত (জন্ম) ও ওফাতের বৎসর গণনা করেন নাই এবং যাঁহারা ৬৫ বৎসর বলিয়াছেন, তাঁহারা বেলাদত ও ওফাতের বৎসরকেও হিসাবে ধরিয়াছেন। আর যাঁহারা ৬০ বৎসর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র দশককে গ্রহণ করিয়া ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যাঁহারা সত্য পথের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী তাঁহাদিগকে সালাম।



হাজী শরীফের নিকট লিখিত।
মকতুব নং -১১

হজরত মুসা আলায়হিস সালাম সম্পর্কে কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হইয়াছে “ফাখাফ ইন্না ইয়াকতা’লুন” অর্থাৎ “আমি ভয় করিতেছি যে ফেরাউনীগণ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।” তাঁহার এই উক্তি তবলীগ (ধর্ম প্রচার) সম্পর্কে তিনি আপত্তি বা অসম্মতি (এনকার) প্রকাশ করেন নাই। বরঞ্চ ইহাতে তাঁহার সেই সময়ের অবস্থা বিশেষেরই বর্ণনা ছিল এবং এই ধরনের ইঙ্গিত ছিল যে, আমি নিহত হইলে আমার মাধ্যমে তবলীগের কাজ করা যে আর সম্ভব হইবে না। তবলীগের ব্যাপারে কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে তিনি এ কথা কেন বলিবেনঃ

“আমার জিহ্বার গ্রন্থি তুমি খুলিয়া দাও, যাহাতে মানুষ আমার কথা বুঝিতে পারে এবং আমার ভাই হারুনকে আমার সাহায্যকারী ও অংশীদার করিয়া দাও।”

টীকাঃ হাজী শরীফ, হজরত মোহাম্মদ মাসুম র. এর আদেশ পালনকারী সহচর এবং বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড)।



হাফেজ আবুল কাশেম বিন মোহাম্মদ মুরাদ
লাহোরীর নিকট লিখিত। মকতুব নং-১২

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্য এবং তাঁহার রসুলের প্রতি দরুদ। তোমার লিখিত মর্যাদাবাহী মূল্যবান পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করিতেছি। ঐ পত্রে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রমজনিত দোষত্রুটি এবং অতীত ও বর্তমানের অনুশোচনাকর ও দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও তোমার পত্রে পরম আকাংখিতের সহিত মিলনের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে— যে জন্য ঐ পত্র পাঠ করিয়া আনন্দের জোয়ারে হৃদয় খুশীতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহুতায়ালার যেন আমাদের অনুভূতির সংকীর্ণতাবোধকে অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করার শক্তি প্রদান করেন। কল্পনাবিলাস ও অবাস্তবতা হইতে মুক্তি প্রদান করেন। আকাংখার আগুনকে অন্তরের মধ্যে প্রজ্বলিত করিয়া দেন। তাঁহার নৈকট্যলাভের পথে সমস্ত অন্তরায় ও বাধানিষেধ হইতে দূরে রাখেন এবং একগ্রন্থ দান করেন। হৃদয়ের প্রেম ও প্রার্থনার মধ্যে সমস্ত কিছুই উদ্দেশ্যকে এক ও একগ্রন্থ করিয়া সেই একদিকেই প্রবাহিত করিয়া দেন। ইল্লাহা কারিবুম মুজিব—

এই নশ্বর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মকসুদ (উদ্দেশ্য) হইতেছে আল্লাহুতায়ালার প্রকৃত পরিচয় (মারেফত) লাভ করা। মারেফত দুই রকমের :-

- (১) যে মারেফতের সম্পর্কে ওলামাগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন; এবং
- (২) যে মারেফতের সঙ্গে সুফিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

প্রথম প্রকারের মারেফত চোখে দেখা ও যুক্তি প্রমাণের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয় প্রকারের মারেফত ঐশী প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক জগতে আত্মনিমগ্নতার সহিত সম্পর্কযুক্ত। প্রথম প্রকার মারেফত জ্ঞানের পরিধির (দায়রায়ে এলেমের) মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাহা কেবল ধ্যান-ধারণার সহিত যুক্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার মারেফত অবস্থার বিবর্তনের (দায়রায়ে হালের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং অনুসন্ধান ব্যাপ্ত। প্রথম প্রকারের মারেফত দৈহিক অস্তিত্বের পরিচয়কে (ওজুদে আরেফ) বিলীন করিয়া দিতে পারে না এবং দ্বিতীয় প্রকারের মারেফত ভক্তের সকল অস্তিত্বকে (ওজুদে সালেফ) সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দিতে সক্ষম হয়। প্রথমটি হইতে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। দ্বিতীয়টি দ্বারা ভক্তের কামনা-বাসনার অস্তিত্বকে

ফানা (বিলীন) করিয়া নৈকট্যলাভের জ্ঞানের মাধ্যমে সত্যের সমাগম ঘটে। প্রথম প্রকারের গৃহীত মারেফত ভোগলালসাপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রতিযোগিতায় এবং তাহাকে (ইন্দ্রিয়) অস্বীকার করার দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে— তাহা এই কারণে যে, ইন্দ্রিয় (নফস) তাহার নিজস্ব পাপাচারের মধ্যে অবস্থান করে এবং অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে বাহিরে আসিতে পারে না। এই অবস্থায় ইমান থাকিলেও তাহা ইমানের আকৃতিস্বরূপ এবং পূর্ণ আমলসমূহ থাকিলে তাহাও কেবল আমলের আকৃতিস্বরূপ হইয়া থাকে, যাহা খাঁটি ইমান ও আমল নহে। ইহার কারণ এই যে, নফস সেখানে অবিশ্বাস ও ধোকার মধ্যে পতিত এবং আল্লাহুতায়ালার বিরোধিতায় লিপ্ত রহিয়াছে। এই ধরনের ইমানকে নকল ইমান বা অপ্রকৃত ইমান (ইমানে মাজাযী) বলে। এই নকল ইমান বিশৃঙ্খলা ও পতনের হাত হইতে সুরক্ষিত নয়।

যেহেতু দ্বিতীয় রকমের মারেফত ভক্তের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দেয় এবং নফসের প্রশান্তি আনয়ন করে, এইজন্য এই মঞ্জিলে ইমান যে কোন প্রকারের পতন হইতে সুরক্ষিত এবং বিশৃঙ্খলা হইতে নিরাপদ থাকে। প্রকৃত ইমানের স্থিতি এই মাকাম হইতে হইয়া থাকে এবং সত্যিকার খাঁটি আমলসমূহও এইখানে উজ্জ্বল আলোকমালার ন্যায় দ্যুতিময় হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্য কখনও বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না— ইহার স্থায়িত্ব চিরন্তন হইয়া থাকে।

“ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানু আমেনু” অর্থাৎ হে ইমানদারগণ, (প্রকৃত) ইমান পয়দা কর— আল্লাহপাকের এই কালামে এই ইমানের প্রতিই ইশারা করা হইয়াছে। ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল র. এই মারেফতেরই অনুসন্ধানকারী ছিলেন, যে জন্য তিনি নিজে জ্ঞানী ও অন্যায প্রতিরোধকারী হিসাবে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিখ্যাত বুজুর্গ বেশার হাফি র. এর ঘোড়ার রেকাবের সাথে একজন খাদেমের মত চলিতেন। লোকে এই ধরনের আদব ও সম্মান প্রদর্শনের কারণ জানিতে চাহিলে ইমাম আহম্মদ র. বলিয়াছিলেন, আমার চেয়ে বেশার র. আল্লাহপাকের মারেফত অনেক বেশী হাসিল করিয়াছেন। ইমামে আজম রহমতুল্লাহ্ আলায়হি তাঁহার জীবনের শেষ দুই বৎসরে মারেফতের এই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রসিদ্ধ উক্তি হইতেছে “আমার মকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য যদি এই দুইটি বৎসর না আসিত তাহা হইলে নোমান ধ্বংস হইয়া যাইত।” ভাবিয়া দেখ, প্রথম হইতেই তিনি কত উচ্চ পর্যায়ে আমলের অধিকারী ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করার মত আমলের নিকট আর কোন আমল সমকক্ষ হইতে পারে? শিক্ষাদান ও জ্ঞানদানের মত মহৎ আমলের সহিত আর কোন প্রকার ভক্তির তুলনা হইতে পারে? তাহা সত্ত্বেও তিনি তো সেই পূর্ণতার প্রতিই আসক্ত ও আনত হইয়াছিলেন।

জানা প্রয়োজন যে, পূর্ণ তরিকার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আমলসমূহ (কবুলিয়াতে আমল) পরিপূর্ণ ইমানের অংশবিশেষ। আর নূরান্বিত আমলসমূহ (নূরানিয়াতে আমল) পূর্ণরূপে সমর্পিত আন্তরিকতা হইতেই সম্ভব হয়। ইমান ও আন্তরিকতা যত অধিক মাত্রায় পূর্ণতর হইবে আমলসমূহও তত বেশী নূরান্বিত ও গ্রহণযোগ্য হইবে। পরিপূর্ণ ইমান ও প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গেই মারেফতের সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এই মারেফত অস্তিত্বকে বিলীন করার সহিত সম্পর্কযুক্ত। যে অকপটভাবে যত বেশী অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিতে পারিবে সে ইমানে তত বেশী পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই কারণেই হজরত সিদ্দীকে আকবর (অর্থাৎ হজরত আবু বকর সিদ্দীক) রাদিআল্লাহুতায়াল্লা আনহুর ইমান সমস্ত উম্মতের ইমান অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ ছিল এবং অস্তিত্বকে বিলীন করার (ফানার) ক্ষেত্রে, পরিপূর্ণতা অর্জনকারীর দিক হইতে, তিনি সর্বাপেক্ষা সফলকাম ব্যক্তি (ফরদে কামেল) ছিলেন।

এই দীর্ঘ পত্রের সারবস্তু হইতেছে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোক তাহার অবশ্য কর্তব্য হিসাবে যেন আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে সাচ্চা দিলে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। যে উপরিউক্ত মারেফত হাসিল করিতে পরিয়াছে সে মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ তাহাকে সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল সে তাহা পূর্ণ করিয়াছে এবং পরিপূর্ণ ইবাদতের সহিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।

আল্লাহুপাক এরশাদ করিয়াছেন, “ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া’বুদুন” অর্থাৎ আমি জিন্ন ও ইনসানকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। এখানে ইবাদতের উদ্দেশ্য হইতেছে মারেফত। এই মারেফত যে হাসিল করিতে পারে নাই সে যেন সমস্ত মন প্রাণ দ্বারা ইহার সন্ধান লাভের চেষ্টায় রত থাকে এবং কোন স্থান হইতে ইহার সুস্রাণ পাইলেই সে যেন সেখানে গিয়া পৌছায়। আফসোস হয়, এই নশ্বর জীবনে যাহা বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয়, মানুষ তাহা হাসিল করার চেষ্টা করে না এবং অন্যান্য নানা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে।

এই ধরনের মানুষ কাল কিয়ামতের দিনে কিভাবে তাহার ওজর আল্লাহুপাকের নিকট পেশ করিবে?

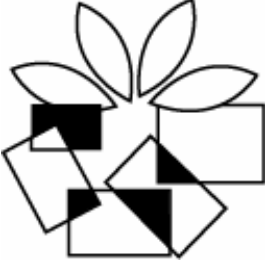
সে যে আমায় চেনে ওগো, সব কিছু মোর জানে,
কি করি আর কোথায় থাকি সব খবরই রাখে,
চেনে-জানে বলে যে গো ভয় তো আমার সেই খানে,
থাকত না যে দুঃখ কোন না চিনিলে এই আমাকে।



হাজী মোস্তফার নিকট লিখিত ।
মকতুব নং-১৩

তুমি কিছু সাংসারিক জড়বস্তু হাসিল না হওয়া সম্পর্কে লিখিয়াছ। আল্লাহ্‌তায়ালার যাহা কিছু করেন সব মঙ্গলের জন্য। সমস্ত জীবনটাকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সমর্পণ করিয়া দাও। সাংসারিক বিষয়বস্তু অর্জন করার ব্যাপারে অনর্থক পরিশ্রম করিও না। “আলাই সাব্বাহ্ বিকাফীন আবদুহু”- আল্লাহ্‌তায়ালার কি তাঁহার বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নহেন? স্মরণ রাখিও, আমাদের সম্মান ও ইজ্জত, ইমান ও মারেকফতের সহিত সম্পর্কিত- ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার সহিত নয়। ইমানের পূর্ণতা অর্জন করার জন্য অবিরত চেষ্টা কর এবং ধাপে ধাপে মারেকফতের উচ্চ স্তরসমূহ হাসিল করার জন্য সর্বাঙ্গিকভাবে সংগ্রাম করিয়া যাও। এই মহান মর্যাদার উদ্দেশ্যে তুমি যে পরিমাণ ত্যাগ ও পরিশ্রম করিতে পারিবে তাহাই হইবে সুন্দর ও প্রশংসনীয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত দুঃখকষ্টকে মাত্র একটি দুঃখকষ্টে পরিণত করে অর্থাৎ কেবলমাত্র আখেরাতের দুঃখকষ্টের মধ্যে তাহা কেন্দ্রীভূত থাকে তখন আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার সকল দুঃখকষ্ট বিদূরিত করিয়া থাকেন।

টীকাঃ হাজী মোস্তফা হজরত উরওয়াতুল উসকা খাজা মোহাম্মদ মাসুম র, এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। বাংলায় তাঁহার কবুলিয়ত নামা হাসিল হইয়াছিল, রওজাতুল কাইয়ুমিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাকে হাজী মোস্তফা বাঙ্গালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।



শায়েখ আরবের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১৪

আমলের হিসাবে যাহার দুইটি দিন একইভাবে অতিবাহিত হয় অর্থাৎ আগের দিনের তুলনায় পরের দিনে দ্বিগুণ আমলে যে অধিক তরক্কি করিতে পারে না সে ক্ষতির মধ্যে থাকে। তোমার সময়কে তুমি নিত্যদিনের প্রার্থনাসমূহের (অজিফাসমূহের) এবং ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে নিয়োজিত রাখ। অবকাশের সময় খুব কম, সেই সময়টুকুও বাতেনকে সুগঠিত এবং কলবকে নূরানিত করার কাজে লাগাও। কেবল বাহিরকে (জাহেরকে) সুসজ্জিত ও সুগঠিত করা যেমন ভিতরের (বাতেনের) জন্য ক্ষতির কারণস্বরূপ তেমনি বাহিরের (জাহেরের) প্রতি বেখেয়াল ও উদাস থাকাও ভিতরের জন্য (বাতেনের) ক্ষতির কারণস্বরূপ। কেননা জাহের এবং বাতেন একে অপরের পরিপূরক। আর আমরা জাগতিক কামনা বাসনা ও উচ্চ আকাংখার জন্য কেবল জাহেরকে সুসজ্জিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পিছনে লাগিয়া থাকি। বাতেনের প্রতি এই উদাসীনতায় অভ্যস্তরের অবক্ষয় সম্পর্কে আমরা আর কতটুকু খোঁজ খবর রাখিতে পারি।

টীকাঃ শায়েখ আরব, শায়েখ নূর র. এর ফরজন্দ আখুন দরওয়িজা র. এর খলিফা শায়েখ আদম বন্নুবী র. এর খাস্ মুরিদ ছিলেন। সকাল সন্ধ্যা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর মকতুবাত শরীফের অধ্যয়নে মশগুল থাকিতেন। তারিখে মোহাম্মদী গ্রন্থে ১০৯৬ হিজরীতে আরব শেখ নামক এক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহার সম্পর্ক ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে— আরব শেখ (যিনি মুগল খান নামে সমধিক পরিচিত) ইবনে তাহের খান বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে মালুহতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকা অবস্থায় ১০৯৬ হিজরীর ২২শে শাবান ইন্তেকাল করেন। মায়াসারুল উমরা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আরব শেখ নামে এই আমীরের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহার সংক্ষিপ্তসার হইতেছে— মুগল খান আরব শেখ হইলেন তাহের খান বলখীর পুত্র। মুগল খান তাঁহার উপাধি ছিল। তিনি বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী (মনসবদার) ছিলেন এবং চাকুরীতে ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মালুহ প্রদেশের শাসনকর্তা (সুবাহদার) হইয়াছিলেন এবং তিন হাজারী মনসব এবং সাড়ে তিন হাজারী অশ্বারোহী দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১০৯৬ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

মকতুবাতে মাসুমীয়া/৫২



হাফেজ মোহাম্মদ মহসীন দেহলবী
র.-এর নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৫

মহান আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি যাবতীয় প্রশংসা ও নবী করিম স. এর প্রতি দরুদসমূহ এবং তবলীগের দাওয়াতের পর জানাইতেছি যে, তোমার সুন্দর পত্রখানি যাহা তুমি এই মিসকিনের নামে অত্যন্ত মহব্বতের সহিত প্রেরণ করিয়াছ তাহা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পত্রখানি উচ্চ মরতবাপূর্ণ, গুণে এবং সুন্নতের স্বাদে-গন্ধে ভরপুর ছিল, যে জন্য তাহা আনন্দের উপর আরও অধিক আনন্দ প্রদান করিয়া চিত্ত জয় করিয়াছে।

তুমি লিখিয়াছ, কখনও কখনও এমন একটি সংযোগের (নেসবতের) আবির্ভাব ঘটে যাহা হইতে কেবল নূর প্রকাশ পাইতে থাকে এবং নিজেকে তুমি সেই নূরের মধ্যে হারাইয়া ফেল। এই নেসবতের নাম যে কি হইতে পারে তাহা তোমার ধারণায় আসে না। ইহার উপর সেই নূরের পরিচয় ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব (হকীকত) জানা না থাকার জন্য তোমার অজ্ঞতার কারণে, সে বিষয়ে কিছু বর্ণনা করিতে ও ভাষায় প্রকাশ করিতে তুমি অক্ষম। এমন কি কোন কিছু সহিত তুলনা করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। এই উচ্চ মরতবাসম্পন্ন পবিত্র নূরের আবির্ভাবে বিনয়ের সহিত আশ্চর্য হওয়া ছাড়া তুমি আর কিছুই অনুভব করিতে পার না।

টীকাঃ হাফেজ মোহাম্মদ মহসীন দেহলবী ছিলেন শায়েখ আব্দুল হক মোহাম্মদেস দেহলবী র. এর পুত্র। তিনি হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর উচ্চস্তরের খলিফা ছিলেন এবং ধর্মীয় জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িককালে তিনি দিল্লীর সমস্ত আলেম-ওলামাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনি র. এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ তাহার নিকট হইতে প্রচুর ফয়েজ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিজরীতে ইস্তিকাল করেন। দিল্লীতে শায়েখ আব্দুল হক মোহাম্মদেস দেহলবী র. এর মাজারের পশ্চিম দিকের এক চতুরে (চবুতরায়) তাহার মাজার অবস্থিত (তাজকেরায়ে উলামায়ে হিন্দ ও মাজারতে আওলিয়া দিল্লী)।

হে সম্মানীয়! হজরত মোজাদ্দের সাহেব কুদ্দিসা সিররুহ্ আনুগত্যের স্তরসমূহেরও উর্ধ্বে আরও একটি উচ্চস্তর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাকে অবিমিশ্র নূর (নূর-ই-সিরফ) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এমন কি ইহাকে কাবার মলূতত্ত্ব ও দর্শন (হকীকতে কাবা) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি যাহা অনুভব করিতেছ তাহা যদি ঐ ধরনের হকীকত প্রকৃতির হয়, যে সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দের র. বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে পরম সৌভাগ্যের বিষয়— এমন কি তাহার ছায়াও যদি হয় তবুও তাহা আল্লাহর দান ও আশীর্বাদস্বরূপ। বস্তুত যাহা কিছু হউক, উহা সৌভাগ্যজাত বিশিষ্ট উজ্জ্বল বর্ণের। এই নেসবতের বিশুদ্ধতা ও উচ্চতার কারণেই তুমি যেমন লিখিয়াছ তদ্রূপ ঘটে, যেমন প্রায় নামাজের সময় এই নেসবতের উপস্থিতি ঘটে, বিশেষ করিয়া ফরজ নামাজ আদায় করিবার সময় এবং নামাজের পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের স্থানে বসিয়া থাক ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ধরনের অবস্থা বর্তমান থাকে, তাহার পর অদৃশ্য হইয়া যায়।

হে সম্মানীয়। নামাজ হইতেছে মোমেনের জন্য মিরাজ এবং হালত (অবস্থা) হইতেছে মিরাজের নমুনাশ্বরূপ। সিজদাকারী আল্লাহুতায়ালার মোবারক কদমের উপর সিজদা করে— এই হাদীস তুমি শুনিয়া থাকিবে। হাদীসে আরও আছে, বান্দা যখন নামাজে রত হয়, আল্লাহুতায়াল তখন তাহার দিকে মনোযোগ প্রদান করেন। আবার ফরজ নামাজের বৈশিষ্ট্য (অন্য নামাজের তুলনায়) স্বতন্ত্র। তাহার উপর জামাতের সঙ্গে নামাজ যাহা কেবল উচ্চমর্যাদাবাহী নূরের উপর নূর দ্বারা ভরপুর। রসুলুল্লাহ স. বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহুতায়াল ঐ সমস্ত লোকদিগকে নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করিয়া দিবেন, যাহারা অন্ধকারে মসজিদে যাইত।

তুমি লিখিয়াছ যে, কোরআন মজিদ তেলাওয়াত করার মধ্যে যে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে খুব কম। বিশেষ করিয়া ঐ ধরনের তেলাওয়াত যাহা নামাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া করা হয়। হাঁ, এই উন্নতি তেলাওয়াত এবং নামাজ উভয়ের সংযুক্ত ফল। কোরআনের পাক কালাম হইতেছে মূলতত্ত্ব সমূহের গুণাবলী যাহা নিজ অস্তিত্বের প্রশংসা হইতে কোন সময় বিচ্ছিন্ন হয় না। এই গুণাবলীর সহিত সম্পর্ক রাখার অর্থ হইতেছে গুণাবলীর প্রশংসা হইতে পূর্ণতাকামী নৈকট্য লাভের উপায়।

ওয়াস্ সালাম।



মোহাম্মদ বাকের ফতেহ্ আবাদীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ১৬

তুমি জানিতে চাহিয়াছ, যে সঠিক পথে মহৎ পুণ্যাভ্যাগণ প্রকৃত ইশকের
অধিকারী হইয়া থাকেন তাহা কি দৃষ্টির পথ হইতে প্রাপ্ত, নাকি জানার পথ হইতে
তাহা প্রাপ্ত। ইহার জবাব হইতেছে দৃষ্টির পথ হইতে নয়, কারণ দীদারের ওয়াদা
তো আখেরাতের জন্য করা হইয়াছে, ইহার প্রাপ্তিযোগ শোনা ও জানার পথে।

প্রেমের জোয়ার একা একা কভু কাছে তো আসে না
তার দেখা পেলেও, যদিনা দেখে সে তোমায়
অথবা ভালবাসে না,
তাহলে ধন দৌলত ব্যর্থ সব, মিথ্যা সাজসজ্জা
আলাপে আলাপে যদি চার চোখের মিলন
হুদয়ে না পাতে শয্যা।

তুমি আরও জানিতে চাহিয়াছ যে, ইশক যদি জানার পথ হইতে পাওয়া যায়
তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার যে ভাবে তাঁহার নাম ও গুণাবলীর সহিত চির-বর্তমান,
আমরা তো ঠিক সেইভাবে তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছি তবু জানা ও চেনা সত্ত্বেও
কি কারণে অপ্রকৃত (নকল) ইশকের মত আমাদের মধ্যে অস্থিরতা ও আরামহীন
অবস্থার প্রকাশ থাকে না এবং কেনই বা আমাদের হুদয়ের মধ্যে ঐ রকম
আকাংখার আগুন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না।

টীকাঃ আজম খান মীর মোহাম্মদ বাকের ওরফে এবাদত খান হজরত আলী রা. ও হজরত
ফাতেমা রা. এর বংশধর ছিলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এবং পরে বাদশাহ্
শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। বাদশাহ্ শাহজাহান যখন বোরহানপুর
আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে খান জাঁহা লোদীর মোকাবিলা করিবার জন্য এবং নিজামশাহীর
রাজত্ব দখল করিবার জন্য হুকুম দেন। তিনি এই দুইটি কাজই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন
করেন। তিনি দহারোর কেদ্বা জয় করিয়া তাহার ফতেহাবাদ নাম রাখেন (সম্ভবতঃ এই কারণেই
তাঁহাকে ফতেহাবাদী বলা হইত)। অবশেষে জৈনপুরের শাসনভারও তাঁহার উপর সমর্পণ করা হয়।
সেখানে ১০৫৯ হিজরীতে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। জৈনপুরের সমুদ্রের ধারে তিনি
একটি বাগান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন— সেখানেই তাঁহার দাফন সম্পন্ন করা হইয়াছে।

জবাব এই যে, ইহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণ হইতেছে, কেবলমাত্র জানার বিষয় কখনও ইশকের হেতু হইতে পারে না। শুধু জানা শোনার ব্যাপার যদি ইশকের জন্য যথেষ্ট হইত তাহা হইলে তামাম মুসলমান আশেক ও প্রেমিক হইত এবং আপনাপন অস্তিত্ব ও অজ্ঞতা হইতে বিলকুল মুক্ত হইয়া যাইত, কেননা এই সব জিনিসই সেখানে ইশকের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান হইত। বস্তুত ইশক এবং হৃদয়ের বন্ধন (গেরেফতরী দিল) হইতেছে জান্নাতী উপহার বিশেষ। যদিও এই ইশকের স্তর ও বিন্যাস জানার মাধ্যমে আসিয়া থাকে তবুও পার্থিব জগতে এই ইশক সঠিক রীতিনীতি ও আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং সেই সাথে এমন কামেল পীরের সহবত প্রয়োজন যিনি বিশেষ অনুভূতি ও পদ্ধতিসম্পন্ন পথসমূহের (সুলুক ও জজবার) পরিভ্রমণ পূর্ণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা সেই মারেফত যাহার সহিত সুফিয়ায়ে কেরামগণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন, যাহা এই ধরনের ইশক ও আশার ফলশ্রুতি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, যে ইশক ক্রমশঃ অস্থিরতার সহিত সম্পর্কিত তাহাতে নিরানন্দ ভাব থাকে এবং তাহা অভ্যন্তরীণ অবস্থার (বাতেনের) অংশ বিশেষ। প্রকাশ্যে তাহার অনুপ্রবেশ খুব কম পরিলক্ষিত হয়, কেননা ব্যাকুলতার প্রকাশমান অবস্থা ইশকে ব্যাকুলতার সম্পূর্ণ খেলাফ বা পরিপন্থী। ইহার বিপরীতে অপ্রকৃত ইশকে (যে ইশক সঠিক ও আসল নয়) কিছুটা অনুরূপ অবস্থার সহিত সম্পর্ক থাকিলেও তাহা কেবল বাহিরের অংশস্বরূপ এবং তাহার প্রভাবও বাহ্যিকভাবে অধিক হইয়া থাকে; যেমন অস্থিরতা, হা হতাশ, চিৎকার ইত্যাদি। প্রকৃত ইশকে (ইশকে হকীকী) কোন মত্ততা থাকে না এবং নকল ইশকে (ইশকে মাজাযী) যে প্রভাবসমূহ থাকে তাহা প্রকৃত ইশকের মধ্যে কম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত ইশকের পরিচয় প্রেমিকের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কিছু হইতে নিজেকে মুক্ত করার মধ্যে নিহিত আছে। ইহাই আসল ইশক। আর নকল ইশক হইতেছে ইশকের খোলসস্বরূপ। আসল কথা হইতেছে, নকল ইশকের মধ্যে যেমন প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে পারস্পরিক আকৃতির সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তেমনি তাহার প্রভাবও বাহ্যিক আকৃতির মধ্যে অধিক প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ইশকের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আকৃতির সম্পর্ক বিলুপ্ত থাকে, সুতরাং প্রকাশ্যে তাহার প্রভাবও কম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত ইশক অস্তিত্বের বিলুপ্তি সাধনের পর স্থায়িত্ব ও অমরত্ব (ফানা ও বাকা) প্রাপ্ত হয় যাহা অভ্যন্তরীণ গোপন অবস্থার সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত।

তবে হ্যাঁ, প্রতিবিশ্বের মধ্যে অবস্থানকালে (মাকামাতে যিল্) প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রভাব প্রকাশ্যভাবে পরিলক্ষিত হওয়ার কারণ থাকিতে পারে।

এই কারণে সত্যিকার ইশকের মধ্যেও কখনও কখনও চাঁৎকার, আহবান, আত্নাদ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আবার অবস্থা যখন এই প্রতিবন্ধের পর্যায়ে অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উন্নীত হয় এবং অদৃশ্য হইতে আরও গভীর অদৃশ্যালোকের দিকে (গায়েবুল গায়েবের দিকে) হৃদয়ের কথাবার্তা পৌছাইতে থাকে, তখন সেই অবস্থায় ব্যাকুলতা, নিরানন্দভাব ইত্যাদি কম হইয়া যায়। সুতরাং নবুয়তের পরিপূর্ণতার (কামালাতে নবুয়ত) মধ্যে যে মাকামের অবস্থিতি সেখানে কেবল মহব্বত অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকারের এরাদা বিদ্যমান থাকে এবং কোন রকম অস্থিরতা ও নিরানন্দভাব আর তাহার মধ্যে থাকে না। এই মহব্বত এমন ধরনের হয় যে রূপ প্রত্যেকের মহব্বত থাকে তাহার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে। বরং তাহা অপেক্ষা আরও অধিক নাজুক ও আনন্দদায়ক। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, নিজের অস্তিত্বের চেয়ে প্রিয়, দৃশ্যতঃ আর কিছুই নাই— ইল্লা মাশা আল্লাহ— তথাপি এই সিলসিলায় কোন উন্মাদনা ও অস্থিরতা পাওয়া যায় না।

তুমি লিখিয়াছ, আল্লাহপাকের ইবাদত করার যে তৌফিক তুমি পাইয়াছ তাহাতে নিজেই তুমি অত্যন্ত অপরাধী ও অসহায় হিসাবে পাইয়া থাক এবং আখেরাতের কাজ আনজাম দেওয়ার মত আধ্যাত্মিক শক্তিও খুব কম দেখিতেছ।

তুমি এই সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছ তাহা অবিকল এই ফকিরের অবস্থারই বর্ণনা। আমি নিজে আর আমার অক্ষমতা সম্পর্কে তোমার নিকট কি প্রকাশ করিব। এই অপদার্থের নিকট হইতে তাহার নিরাময় চাওয়া যেন কর্জ প্রার্থনাকারীর নিকট হইতে কর্জ চাওয়া অথবা কোন মুখাপেক্ষী ও কপর্দকহীনের নিকট হইতে কিছু অনুসন্ধান করার সামিল। এখানে তো চিকিৎসক নিজেই অসুস্থ। আল্লাহুতায়াল্লা যেন আমাকে এবং তোমাকে তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী চলার মত তওফিক দান করেন এবং পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে যেন তিনি আমাদের পথ প্রদর্শক হন এবং দেখাশোনা করেন। ওয়াস্ সালাম।



শায়েখ মোজাফফরের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১৭

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস্ সালামুন আলা ইবাদহিল্লাজি নাস্তাফা।

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করিয়াছ। এই দিকে তোমার নিজের সাক্ষাতের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা ও আকাংখা রাখিও। মনে প্রাণে সুনুতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিও।

দীন ও দুনিয়ার সরদার আলায়হি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামের আদত (অভ্যাসসমূহ) ও ইবাদতের সমস্ত কিছু মধ্য অনুরূপ সাদৃশ্য বজায় রাখিয়া সেইগুলিকে অনুসরণ করাকে উচ্চ মর্যাদাবহনকারী সৌভাগ্য বলিয়া জানিবে। ইহা প্রাচুর্যময় সৌভাগ্যের চাবিকাঠি যাহা উত্তরোত্তর উচ্চ মর্যাদার দিকে শুভ পরিণামের ফলস্বরূপ। বন্ধুর (মাহবুবের) মনোরম আকৃতি ও চেহারা যেন নিজেকে অংকিত ও সজ্জিত করিয়া লইতে পারে সে নিজেই বাঞ্ছিত বন্ধু হইয়া যায়। কালামপাকের এই আয়াত ইহার সাক্ষীস্বরূপ— কুল ইন্ কুনতুম্ তুহিব্বুনাল্লাহা ফাতাবিউনী ইউহবিব কুমুল্লাহ্। হে বন্ধু, আপনি বলিয়া দিন, ওহে মানব সকল, তোমরা যদি আল্লাহুতায়ালার সহিত মহব্বত করিতে চাও তাহা হইলে আমার আনুগত্য কর, (এই আনুগত্যের বরকতে) আল্লাহুতায়ালার তোমাদের সহিত মহব্বত করিতে থাকিবেন (এবং তোমরা উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়া আল্লাহুতায়ালার বন্ধু হইয়া যাইবে।

নিজ সময়কে সর্বদা সৎ আমল দ্বারা পরিপূর্ণ রাখিবে। দীর্ঘ সূরা কেরাত দ্বারা নামাজ আদায় করিবে আর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা আলোকময় করিয়া তুলিবে। কলেমা তাইয়েবার জিকির এমনভাবে করিবে যাহাতে আল্লাহুপাকের বাসনা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বাসনা হইতে তোমার হৃদয় শূন্য হইয়া যায়। ওয়াস্ সালাম।



শায়েখ বাইজীদ সাহারানপুরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৮

(বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব সম্পন্ন করিবার এরাদা করিয়া সফরের উদ্দেশ্যে এই মকতুব লিখিত হইয়াছে।)

আল্লাহ্‌তায়াল্লা তোমাকে কেবলমাত্র তাঁহার দাসত্ব ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন এবং তোমার অন্তরকে তাঁহার মূল অনুভূতির আশ্বাদে পরিপূর্ণ রাখেন। তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আশা করিতেছি জিলক্বদ মাসের শেষদিকে ২০ তারিখ হইতে ২৯ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন হজ্জের উদ্দেশ্যে সেরহিন্দ হইতে রওয়ানা হইব এবং সুরাত বন্দর হইতে চির-আকাংখিত কাবায় হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিব।

এইতো মাধ্যম তাঁকে চাওয়ার পাওয়ার
যতখুশী চাও তুমি, অফুরন্ত ভাণ্ডার।

বস্তুবাদী জ্ঞানের প্রতি বুদ্ধিকে নিয়োজিত রাখিলে তাহা বস্তুর প্রতি শৃঙ্খলিত হইয়া পড়ে। তাই আল্লাহ্র ইশকের পথে জ্ঞান বুদ্ধির বন্ধন হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং নিজের সমগ্র দৃষ্টিকে যিনি যাবতীয় বস্তুর মালিক তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। কবি কি সুন্দর ভাবেই না বলিয়াছেন—

টীকাঃ শায়েখ বাইজীদ সাহারানপুরী ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর খলিফা শায়েখ বদীউদ্দীন আনসারী সাহারানপুরীর সাহেবজাদা। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করার পরে সেরহিন্দ চলিয়া আসেন। সেখানে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট বসায় হন এবং তারিকার জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকিয়া প্রভূত রূহানী ফয়েজ হাসিল করেন। হজরত খাজা সেরহিন্দী র. পরে তাঁহাকে খেলাফত দান করেন। তিনি সেরহিন্দ হইতে সাহারানপুর চলিয়া আসেন এবং সেখানে আদেশসমূহ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে মসনদে আসীন হন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে বহু বিষয়ে মীমাংসা লাভ করেন। তিনি অল্পে তুষ্ট থাকিতেন এবং সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়াল্লার উপর সমর্পিত-প্রাণ ছিলেন। ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদান এবং পরোপকারে তিনি মশগুল থাকিতেন। ১১০০ হিজরীর সোমবারে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার কবর সাহারানপুরে অবস্থিত।

হৃদয়কে বেঁধে রাখো লাইলীর চুলের লহরে
কাজ কর নির্দিধায় মজনুর জ্ঞান বুদ্ধি ধরে;
মনে রেখো এই পথে জ্ঞানীদের সারগর্ভ বাণী—
প্রেমিকের তরে শুধু ক্ষতির কারণ আনে টানি।

যে স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, তাহা খুবই উত্তম। যে সমস্ত কাজের অপেক্ষায় আশান্বিত হইয়া আছ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়াল্লা যেন তাহা বাস্তবে পরিণত করেন। তোমার হৃদয়কে তাঁহার সন্ধানের পথে যেন তিনি আরও অধিক আবেগ ও উষ্ণতা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাবৎ বিষয়বস্তু হইতে তিনি তোমাকে মুক্তি প্রদান করেন— ইল্লাহা কারিবুম মুজিব। কোন এক বুজুর্গ বলিয়াছেন, তাসাওফ অস্থিরতার নামান্তর। যখন পরিপূর্ণ শান্তি আসে তখন কোন তাসাওফ থাকে না। মুরিদকে সেই রকম গুণসম্পন্ন হইতে হইবে যাহা এই আয়াতে করিমে বর্ণনা করা হইয়াছে— হাভা ইজা যোয়াক্বাত আলায়হিমুল আরযু বিমারাহ্‌বাত ওয়া যোয়াক্বাত আলায়হিম আনফুসুলুম ওয়া যোয়ান্নু আল্লা মাদ্‌জাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলায়হি (সূর তওবা)

“যে পর্যন্ত না বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও জমিন তাহাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এখন আর কোন আশ্রয়স্থল নাই, কেবল মাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত।”

এখন আমি তোমাকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিতেছি— তুমিও আমাকে তাঁহার নিকট সোপর্দ করিয়া দাও। শান্তি ও কল্যাণের জন্য শেষ পর্যন্ত দোয়ার সহিত স্মরণ রাখিও।

তবু যদি বেঁচে থাকতে হয় আমাকে
এই দক্ষ পৃথিবীর বুকে
বিরহী হয়েই থাকব আমি আমরণ,
বিরহের গন্ধ শুঁকে শুঁকে।
যে আশায় আমি নিজ হতে এতদিন
চেয়েছিলাম বাঁচিয়া থাকিতে
মাটি হয়ে গেছে হায় আশার গৌরব
পারি নাই ধরিয়া রাখিতে।

ওয়াস্‌সালাম।



সিলসিলাভুক্ত জনৈক পর্দানশীন মহিলার
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৯

(সমবেদনা ও উপদেশ আকারে)

সম্মানীয়া পুণ্যবতী ভগ্নীকে জানাইতেছি যে, হৃদয়বিদারক খবর (সম্ভবতঃ উক্ত মহিলার স্বামীর মৃত্যুর খবর) শ্রবণ করার পর যে আঘাত পাইয়াছি, তাহা পত্রে আর কি বলিব। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা এই রকমই ছিল, সেই জন্য ধৈর্য ও সহনশীলতা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই এবং তাঁহার নিকট নিজেই সমর্পণ করা ও তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করা ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রজিউন। দুনিয়া তোমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে— আল্লাহ্‌তায়ালার যেন তোমাকে আখেরাত ও নিজ মহব্বত দান করেন, তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বন্ধু হইতে তোমাকে মুক্তি প্রদান করেন।

সময়কে আল্লাহ্‌পাকের স্মরণে পরিপূর্ণ রাখিবে এবং যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে দোয়া ও ইসালে-সওয়াবের মাধ্যমে স্মরণ রাখিবে। আজ হউক কাল হউক আমাদিগকেও এই জামাতের সহিত একদিন একত্রিত হইতে হইবে, আপন পরিবার পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে এবং নিজ সন্তান সন্ততি ও সমস্ত প্রকার আনন্দ উল্লাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই আখেরাতের জিনিস ঠিক করিয়া লও এবং কবর ও কেয়ামতকে ঠিকঠাক মত প্রতিষ্ঠিত কর।

আল্লাহ্‌তায়ালার যেন তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং জাহের ও বাতেনের জন্য অখণ্ড একাত্মতা দ্বারা স্বীয় অনুগ্রহ প্রদান করেন।

ইন্নাহু ক্বারিবুমু মুজিব।



মীরক মঈনউদ্দীনের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২০

আলহামদুলিল্লাহি জাল্ জালালে ওয়াল্ একরাম ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু
আ'লা রসুলিহী সাইয়েদিনা ওয়াআ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাদ্দীন।

তোমার মূল্যবান পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি। পত্রখানি
অন্তরের আকাংখা ও সন্ধানের ঐকান্তিকতায় পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া আরও অধিক
আনন্দ লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালার ঐ আকাংখার আগুনকে যেন প্রজ্বলিত
রাখেন, প্রার্থনার শিখাকে যেন সদা উন্নত রাখেন এবং ঈঙ্গিত খুশরু যেন
দ্রাণেন্দ্রিয়ের আত্মার মর্মমূলে পৌছাইয়া দেন।

ইশকের আগুন যখন জ্বলে উঠে দাউ দাউ
অন্তরে বাহিরে সারা সত্তাজুড়ি,
তার অন্তহীন তেজে জ্বলে পুড়ে ছার খার সব,
থেকে যায় প্রেমিক কেবল অন্তরাত্মা জুড়ি।

যে পরিমাণ আকাংখা ও সন্ধানের আগ্রহ থাকুক না কেন তাহাই আশীর্বাদ ও
আশার আধারস্বরূপ।

টীকাঃ মায়সারুল উমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে মীরক
মঈনউদ্দীন সম্পর্কে। তাঁহার মহত্ব সম্পর্কে বর্ণনার শুরুতে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

খান আমরায়শ নিশান মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ আমানত খান খোয়াফী ছিলেন অত্যন্ত সরল
প্রকৃতির সত্যবাদী ও ধর্মভীরু ব্যক্তি। তিনি ধর্মীয় আইন কানূনের গুহতা ও তাহার যথার্থ ব্যবহার
সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের ও দিব্যচক্ষুর অধিকারী ছিলেন। তিনি ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত উদার প্রকৃতির
খাঁটি মানুষ, সেই সঙ্গে ফেরেশতা স্বভাবসম্পন্ন পবিত্র সকলের সুখদুঃখে একাত্ম, নম্র ও বিনয়ী,
মানবতাবোধসম্পন্ন, অত্যন্ত দানশীল, মহৎ, বন্ধু বৎসল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সুবিচারক,
মুক্ত মনের অধিকারী, আমানতদার, সৎ পরামর্শ দাতা, চিন্তাবিদ, সর্বসাধারণের হিতাকাংক্ষী, বিদেষ
বিরোধী এবং দয়াদ্রুচিত্ততার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁহার পরিচিতি সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আরও যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে
সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

মকতুবাতে মাসুমীয়া/৬২

এই পত্রে অদৃশ্যালোকের সংযোগ (নেসবত) লাভ করার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে। দেখ, সতত অনুসন্ধান রত প্রেমিকের জন্য যাহা জরুরী, তাহা হইতেছে, অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা এবং প্রার্থনার উপাদান যাহা কিছু তাহার মধ্যে থাকুক না কেন, অকপটভাবে তাহা কেবল স্বীয় শায়েখের নিকট ব্যক্ত করা। কিন্তু তরিকার পথে কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা নিরূপণ করার ভার সম্পূর্ণরূপে মোর্শেদের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। রোগী কেবলমাত্র নিজের রোগ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট ব্যক্ত করিবে। কিন্তু নিজে রোগী হইয়া রোগের পদ্ধতি নির্ণয় করা এবং সেই রোগের চিকিৎসা কিভাবে করা হইবে সে সম্পর্কে কিছু বলা অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। পারিশ্রমিক ও প্রাপ্তির স্থায়ীত্ব শায়েখের সহবতের মধ্যে নিহিত থাকে।

দেখ, একজন সত্যিকার প্রেমিক নিজ যোগ্যতা ও মহব্বত অনুযায়ী কোন কামেল মোর্শেদের বাতেন হইতে প্রভূত ফয়েজ ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত প্রকার পাপ ও হীনতা হইতে শূন্য হইয়া কামেল মোর্শেদের রংয়ে রঞ্জিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। বুজুর্গগণ বলিয়াছেন, শায়েখের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়ার (ফানা ফিশ শায়েখের) মধ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের সঙ্গে নিজ অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়ার (ফানাফিল্লাহর) প্রাথমিক স্তর নিহিত আছে। শায়েখের সঙ্গলাভের (সহবতের) সৌভাগ্য যদি না হয় তথাপি কেবলমাত্র আন্তরিক মহব্বতের মাধ্যমে শায়েখের তাওয়াজ্জাহ দ্বারা কার্যকর ভাবে ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায়। কিন্তু শায়েখের সঙ্গলাভ করা ও সঙ্গলাভ না করিতে পারার মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকে।

তাহার পূর্ব পুরুষগণ বলদাহ হিরাতের অধিবাসী ছিলেন। তাহার স্বনামধন্য প্রপিতামহ মীর হোসেন খোয়াফ শহরে আসিয়াছিলেন। মীর হোসেনের পুত্র মীরক কামাল তাহার সন্তান মীরক হুসাইনের সঙ্গে বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুস্তান আগমন করেন। মীরক হুসাইন জান্নাত মকানী বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদায় তাঁহাকে বলখের শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। মীরক মঈনউদ্দীন এই মীরক হুসাইনের পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে তিনি উঠতি বয়সের যুবক ছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি বাদশাহের নিকট হইতে চাকুরী লাভ করিতে সমর্থ হন। ১০৫০ হিজরীতে শাহজাহানের রাজত্বকালে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে ও ইতিহাস লেখক হিসাবে আজমীর প্রদেশের কাজ তাহার উপর ন্যস্ত করা হয়। পরে তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান।

শেখ মারুফ ভিকরী কর্তৃক ১০৬০ হিজরীতে রচিত সংকলন গ্রন্থ জাখিরাতুল খওয়ানিন গ্রন্থে তাহার সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে যে, মীরক হুসাইন খোয়াফীর পুত্র মীরক মঈনউদ্দীন তাহার পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা মর্যাদা ও আভিজাত্যের ক্ষেত্রে আরও অধিক গৌরব ও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। যৌবনকালেই মীরক মঈনউদ্দীন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং সুন্দর হস্তলিপির জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। বাদশাহ্ শাহজাহানের রাজত্বকালের ২৮ বৎসরে কান্দাহার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দারাকৌর সঙ্গী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

দেখ, হজরত ওয়াস্ করনী র. যদিও আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাতেন মোবারক হইতে লাভবান হইয়াছিলেন এবং অতি শীর্ষ শ্রেণীভুক্ত হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি সাহাবাগণের সমপর্যায়ে পৌঁছাইতে পারেন নাই। অবশ্য তাবেরঈন শ্রেণীভুক্ত তিনি নিশ্চয় হইয়াছিলেন। এই ফকিরের সহিত তোমার যে মহব্বত আছে তাহাকে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হিসাবে মনে করিবে এবং এই ঐশ্বর্য (দৌলত) যাহাতে দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায় সেই ফিকিরে রত থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর তাহার সহিত হইবে, যাহার সহিত সে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে— এই হাদীস তুমি শুনিয়া থাকিবে।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর ঐ বৎসরেই ১০৬৪ হিজরীতে বাদশাহ শাহজাহানের তরফ হইতে তিনি মুলতান প্রদেশের দেওয়ানী ও সেনা বাহিনীর উচ্চপদে ও ইতিহাস লেখক হিসাবে মনোনীত হন। বহু বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখিয়া ও তাঁহার উপদেশ বাণী শ্রবণ করিয়া পাঞ্জাবের জনসাধারণ তাঁহাকে পীরের মত শ্রদ্ধা করিতেন। এখনও পর্যন্ত (হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাবধি) তিনি সেখানকার জনসাধারণের মুখে মুখে মীরক জিউ নামে সমাদৃত হইয়া আছেন। মুলতান হইতে দুই ক্রোশ (চার মাইল) দূরে তিনি একটি বাগান ও বাসস্থান নির্মাণ করেন, যাহা মীরক জিউয়ের কেল্লা (কোটলা) নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বকালে তিনি কাবুলের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আমানত খান উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল। পদমর্যাদার দিক হইতেও তাঁহাকে আরও উচ্চপদ প্রদান করা হইয়াছিল। ইহার পরে কোন কারণ বশতঃ তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহার সততা ও আমানতদারীর চিত্র বাদশাহ্ আলমগীর র. এর হৃদয়ে স্থায়ীভাবে অংকিত হইয়া গিয়াছিল সেই জন্য অনতিবিলম্বে লাহোরের রাজধানীর (দারুস সুলতানাত) তত্ত্বাবধান এবং সেখানকার কেল্লার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন এবং পদত্যাগ করার সময়ে তিনি লাহোর প্রদেশের যে দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পুনরায় তাঁহাকে সেই পদে বহাল করা হয়। লাহোরে তিনি হাবেলী খোয়াফী ও বড় বাজার সংলগ্ন বাসভবন ও স্নানাগার (হাবেলী ও হাম্মাম) তৈরী করেন। আলমগীর র. এর সিংহাসন আরোহণের বাইশ বৎসর কালে, বাদশাহ্ যখন আজমীরের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দেওয়ানীর সম্মান লাভ করেন। আলমগীর র. এর রাজত্বের পঁচিশ বৎসর কালে আওরঙ্গাবাদের শুভ ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যখন শাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তখন নিজাম শাহের হাবেলী যাহা সবুজ গ্রীষ্মবাস (বাংলা) হিসাবে প্রসিদ্ধ সেই স্থানে মীরক মঈনউদ্দীনের থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি আওরঙ্গাবাদ হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত হরসুল গড়ে, মূলতানের মত নিজের বাসস্থানের জন্য স্থান নির্বাচন করিতে চাহেন। বাদশাহ্ রাজ কোষাগারের নিকট মূলক আশ্বর নামক হাবেলী তাঁহার বাসস্থানের জন্য বিবেচনা করেন। এই স্থানও ছোট কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ১০৯৫ হিজরীতে মীরক মঈনউদ্দীনের ইন্তেকাল হয়। আওরঙ্গাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত শাহ নূর হাম্মামী র. এর দরগাহের সন্নিকটে তাঁহাকে সমাধিষ্ট করা হয়। মিয়া শাহ নূর হাম্মামী র. বলিতেন, আমার নিকট লোকে যে বস্তুর সন্ধান করিতে আসে, বাবায়ে পীর তাহা নিজের কাছে রাখে, যাহার ইঙ্গিত ছিল মীরক মঈনউদ্দীন র. এর প্রতি।

খোয়াফী খান সাহেবের ইতিহাস লেখক সংক্ষেপে লিখিয়াছেন, তিনি এই রকম সং ছিলেন যে নিজের উন্নতির জন্য তিনি কখনও কোন চেষ্টাচরিত্র করেন নাই। জনসাধারণের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি সরকার অপেক্ষা বেশী চিন্তাভাবনা করিতেন। তাঁহার শাসনকালে কখনও কাহারও জানমালের কোন ক্ষতি হয় নাই। বস্তৃতঃ আমানত খান মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ র. এর সময়ে সেরকম কোন কিছু শোনা বা দেখা যায় নাই।

আশা করি এই ফকিরের বাতেনী ঐশ্বর্য হইতে পরিপূর্ণতা অর্জন করিবে এবং সমৃদ্ধশালী (ফয়েজমন্দ) হইবে। নিজের মধ্যে এমন কোন পারদর্শিতা এই ফকির দেখিতে পায় না, যাহার বদৌলতে তুমি আমার নিকট উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আদেশের (আমরে আ'জীমের) জন্য আবেদন করিতে পার। কিন্তু যেহেতু ইহা তুমি তোমার সুন্দর ধারণা হইতে লিখিয়াছ, সেইজন্য আশা করি, তোমার এই ধারণা অনুযায়ী আল্লাহুতায়ালার তরফ হইতে যেন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং মরুভূমি হইতে তোমার কোষাগার রত্নরাজিতে ভরিয়া উঠে। হাদীসে কুদসীতে আছে, আমি আমার বান্দার ধারণা হইতেও নিকটে থাকি। অবশ্য আমি তোমার জন্য অদৃশ্য মনোযোগের (গায়েবানা তাওয়াজ্জাহ) ব্যাপারে, ইনশাআল্লাহুতায়ালার কার্পণ্য করিব না। নিজের সময়কে আনুগত্য দ্বারা মশগুল রাখিবে, ক্রীড়া কৌতুক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে। দুনিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, কবরের অবস্থানসমূহ এবং কেয়ামতের ভয়কে চোখের সম্মুখে রাখিবে। সুন্নতের আনুগত্য করা এবং বেদাত হইতে বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই যে নাজাত, তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। বেদাতী ও দুনিয়াদার মোল্লার সহিত কোন সঙ্গ-সংশ্রব রাখিবে না। কেননা, এই ধরনের লোকেরাই দ্বীনের চোর হইয়া থাকে। যে ফকির শরীয়তের রীতিনীতি অনুসরণ করে না এবং নবী করীম স. এর সুন্নত দ্বারা যে সজ্জিত নয়, তাকে নিজেদের মজলিশে ঠাঁই দিবে না।

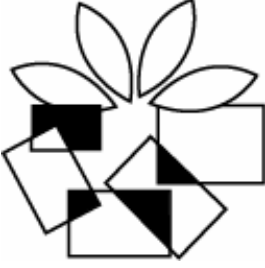
‘পয়গম্বর তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা (মনেপ্রাণে) কবুল কর, যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর।’ (কোরআন)।

আসসালামু আলাইকুম।

জমিদার শ্রেণীর লোকেরা এবং দাবী আদায়ের ব্যাপারে অন্যান্যগণ জেলখানায় থাকিতে থাকিতে নিঃশ্রু ও ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইতেন। তাঁহারা জেলখানায় থাকিলে সরকারের বদনাম হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হইত না। এই সব কারণে মীরক মঈনউদ্দীন র. সম্মানিত কয়েদীগণের নিকট হইতে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করার শর্ত আদায় করিয়া তাঁহাদিগকে জেলখানা হইতে ছাড়িয়া দিতেন। এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে একবার লাহোরে দুই লক্ষ টাকার লোকসানের খবর সংবাদ লেখকের মাধ্যমে পৌছাইয়া যায়। বাদশাহ এই খবরে তাঁহার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে প্রকৃত তথ্যাদি জানিতে পারিলেন তখন ক্ষতির ব্যাপারটি উদারভাবে মানিয়া লইলেন। দাক্ষিণাত্যেও কয়েক বৎসরে দশ বার লক্ষ টাকার বকেয়া পড়িয়াছিল, যাহা দরিদ্র ও দুর্বল প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য প্রতি বৎসর বহু কর্মচারীকে নিয়োজিত করা হইত। মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ ঐ সমস্ত বকেয়া এক প্রকার মাফ করিয়াই দিয়াছিলেন। একদা বাদশাহ আলমগীর মীরক মঈনউদ্দীন আহমদের সততার খুব প্রশংসা করিলে তিনি আরজ করিয়াছিলেন, বাদশাহ নামদার, আমার দ্বারা কোন অবস্থাসের কাজ করা তো সম্ভব নয়, তবে রাজস্ব বাবদ গরীব প্রজাদের নিকট হইতে সরকারের বহু পাওনা টাকা আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। ইহার উত্তরে বাদশাহ বলিয়াছিলেন, আমি জানি যে, তুমি এইভাবে আমার আশ্রিতের কোষাগারকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছ।

মীরক মঈনউদ্দীন আহমদ জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি বা বিতশালী হওয়ার রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন এবং সাংসারিক লৌকিকতা ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি শরীয়তের আদব সম্পর্কিত ‘শরীয়াতুল ইসলাম’ নামক গ্রন্থের সংকলন ও অনুবাদ করেন। তিনি হস্ত লিপিতে ও ফারসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার সাতটি পুত্র সন্তান ও সাতটি কন্যা সন্তান ছিল।

(এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ‘মায়সারুল উমরা’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (পৃষ্ঠা-২৫৮-২৬৭) হইতে গৃহীত)।



নজর বেগ সমরখন্দীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২১

আলহামদুলিল্লাহিল আজিম ওয়া সালামুন আলা রাসুলিহিল করিম। আল্লাহুতায়ালা যেন সব সময় নিজের সঙ্গে রাখেন এবং এক মুহূর্তও যেন তিনি সঙ্গহারা অবস্থায় না রাখেন। মহব্বতের সহিত যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছ তাহা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এইভাবে নিজের অবস্থাসমূহের কথা সবসময় লিখিতে থাকিবে, যাহা অদৃশ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হইতে পারে। যে স্বপ্ন অবলোকন করিয়াছ, তাহা খুবই সুন্দর এবং স্বর্গীয়সুখময় পরিপূর্ণ। নিজের কাজে সর্বদা লাগিয়া থাকিবে। তোমার বাতেনী অবস্থা, জিকির ও ফিকির এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানাও নাই, সর্ব প্রথমে এইসব সম্পর্কে লেখা উচিত ছিল। অন্যান্য বিষয় ইহার পরিপূরক ও অংশ বিশেষ।

সে ছিল আমার অনেক দিনের
প্রাণ-প্রিয় বন্ধু,
বন্ধুর পুত্র সে, যথেষ্ট আমার কাছে
এই পরিচয় শুধু।

আসল কথা হইতেছে, এমনভাবে গভীর বিশ্বাসের সহিত সর্বদা জিকির করিবে যাহার ফলে জিকিরের উপস্থিতি হৃদয়ের সর্বসর্বা হইয়া যায়। অন্য কোন কামনা ও অভিলাষ যেন কেবলমাত্র পবিত্র আল্লাহুতায়ালা ব্যতীত অন্তরে আর অবশিষ্ট না থাকে।

এই কাজে তো তোমার যোগ্যতা ছিল না কিছু,
হয়েছে অর্থের জোরে, তাই ছুটেছ অর্থের পিছু।

বন্ধুগণের নিকট হইতে সালামতী ও শুভ পরিণামের দোয়ার প্রত্যাশায় সকলকে সালাম জানাই।



সৈয়দ আলী বারহিয়ার
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২২

আল্লাহুতায়ালার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, মোহাম্মদ স. এর জন্য দরুদসমূহ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর জানাইতেছি যে, তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি। তুমি সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ কিন্তু তাহা সময়ের উপর নির্ভর করে। দুনিয়া তো বিচ্ছেদের জায়গা। দোয়া কর যেন হকতায়ালার আখেরাতে তোমাকে আমাকে একত্রিত করেন। আল্লাহুতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ তো আখেরাতের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মৃত্যু তাহার বাতায়ন স্বরূপ।

এই দুনিয়া শম্যক্ষেত্র অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। আমলের মধ্যে যত আন্তরিকতা ও সততা থাকিবে, সর্বশেষ পরিণামে তাহার ফলাফল ও পুরস্কার প্রাপ্তির আশাসহ নৈকট্যপূর্ণ মর্যাদালাভের সম্ভাবনাও তত বেশী থাকিবে। শরীয়তের পুস্তকসমূহ হইতেই আমলের রীতিনীতি ও বিধানসমূহ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রকৃত আন্তরিকতাপূর্ণ আমল ইসলামের মূলতত্ত্ব ও নফসের প্রশান্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং ইসলামের মূলতত্ত্ব ও নফসের প্রশান্তি আবার সুফীয়ায়ে কেরামদের সহবতের সহিত সম্পর্কিত। যে আমলে আন্তরিকতা নাই, তাহা রুহীন দেহের মত। যাঁহারা সরল পথের প্রতি বিশ্বস্ত তাঁহাদিগকে সালাম।

টীকাঃ তারিখে মোহাম্মদী গ্রন্থে ১১১৯ হিজরীতে একজন ব্যক্তিত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহাতে লিখিত আছে, সৈয়দ নূরুদ্দীন আলী খান বিন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খান বারহিয়া বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বকালে একজন ওমরাহ এবং শাহ আলমের সঙ্গী ছিলেন। মোহাম্মদ আজমের সহিত যুদ্ধে তিনি ১১১৯ হিজরীতে নিহত হন। সম্ভবতঃ এই মকতুব তাঁহাকে লেখা হইয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মায়সারুল উমরাহ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ১৭৬ পৃষ্ঠায় তাঁহাকে হোসেন আলী খান এবং হোসাইন আলী খানের ভাই বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

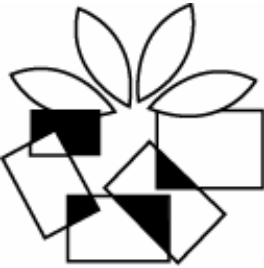


সৈয়দ নূর বহর বারহিয়ার
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২৩

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা। রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় সম্মানীয় উচ্চমর্যাদার অধিকারীর নিকট এই মিসকিন সালাম জানাইতেছি এবং তাঁহার শারীরিক সুস্থতা কামনা করিতেছে। ভালবাসার সহিত যে পত্রখানি পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া খুশী হইয়াছি। এইভাবে নিজের প্রকাশ্য ও গোপন (জাহের ও বাতেন) অবস্থাসমূহের বিষয়ে লিখিতে থাকিবে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে এই ধরনের যোগাযোগ অদৃশ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহায়ক হইয়া থাকে।

দেখ, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় যৌবন অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে এবং জীবনের নিকৃষ্টতম সময় বার্ধক্য তাহার আগমন বার্তা ঘোষণা করিতেছে। এই ভাবিয়া আফসোস হইতেছে যে, যাহা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ সেই আল্লাহর মারেফতের দায়িত্ব বার্ধক্যের নিকট অর্পণ করিতে হইবে। আবার জীবনের সর্বোত্তম সময়কে নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ যেমনঃ কামনা, লোভ-লালসা ও দুনিয়ার সৌন্দর্য-সম্ভোগ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করিতে হয় (যদিও এই রকম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়)। সময়কে সব সময় আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণে ও চিন্তায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং আখেরাতের জন্য উত্তম পুঁজির সওদা করিবে।

ওয়াস সালাম।



হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ লাহোরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ২৪

নৈকট্যের পথে আল্লাহ্‌তায়ালার যেন তোমাকে কল্পনাতীত উন্নতি প্রদান করেন। তোমার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আল্লাহপাকের নিকট অশেষ শুকরিয়া যে, তোমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। দেখ! গর্দানকে নত অবস্থায় রাখার নাম বন্দেগী। নিজ ইচ্ছার কবল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আল্লাহপাকের মর্জির অধীন হইয়া

মকতুবাতে মাসুমীয়া/৬৮

যাওয়ার মধ্যেই বন্দেগী। প্রেমাস্পদের নিকট হইতে যাহা কিছু আসে, তাহার সব কিছুই প্রেমময় হইয়া থাকে— তাহা পুরস্কার কিংবা তিরস্কার— যাহা কিছু হউক না কেন। আশেক প্রেমের খাতিরে মাশুকের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমিকের যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দর ও মনোহর রূপে ধরা দেয়। এমন কি, যদি কোন দুঃখ কষ্ট তাহার তরফ হইতে আসিয়া পৌঁছায়, আশেক তাহা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করে এবং তাহার নিকট ঐ দুঃখকে আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হয়। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্‌তায়ালার ঐ মীমাংসার মধ্যে মোমেনের হক অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, যখন মোমেনের নিকট ভাল কোন কিছু পৌঁছায়, তখন তাহার জন্য সে নিজ পালনকর্তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যখন তাহার নিকট কোন বিপদ আপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনও সে তাঁহার প্রশংসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। একজন মোমেন তাহার প্রত্যেক কাজের জন্য পুরস্কার পায়— এমনকি তাহার স্ত্রীর মুখে যে খাবার সে তুলিয়া দেয়, সেই খাবারের লোকমার জন্যও।

প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকলকে সালাম।



সৈয়দ নূর বহরের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৫

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা। তোমার পত্র পাওয়াছি। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার নিকট এইজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তোমার সমস্ত প্রহরগুলি তাঁহার জিকির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সর্বদা সুন্নতের প্রতি অনুগত থাকার চেষ্টা করিবে। বেদা'ত ও বেদা'তকারীগণের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। মহৎ পুণ্যাঙ্গাগণ এবং যে সমস্ত ফকির শরীয়তের প্রতি অটল ও পাবন্দ থাকেন, তাঁহাদের দিকে নিজেকে আকৃষ্ট রাখিবে।

টীকাঃ তারিখে মোহাম্মদী কলমী (রেজা লাইব্রেরী রামপুর)– এর মধ্যে তাঁহার বর্ণনা ১২০৮ হিজরীতে এইভাবে পাওয়া যায়— সৈয়দ নূর বহর বারহিয়া যিনি সাইফখান নামে পরিচিত ছিলেন, বাদশাহ্‌ আলমগীরের উমরাহগণের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তিনি সৈয়দ বারহিয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন। ১১০৮ হিজরীতে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রেমিকের খোঁজ পেলে তাদের সাথে রেখো
মেলামেশা আপন মতন
সহবতে থেকে থেকে তুমিও হয়তো দেখো
হয়ে যাবে প্রেমিক এমন।
প্রেমের আঘাত পেলে সে আঘাত খুশী মনে
রাখিও অন্তরে তব ধরি
যেথা প্রেম ও প্রেমিক নাই, পড়িও না আকর্ষণে
অনর্থক মেলামেশা করি।

আর প্রকৃত আশেক ব্যক্তি সেই হইতে পারে, যে পয়গম্বর আলায়হি সালাতু ওয়া সালামের প্রতি অকপট আনুগত্যে অটল থাকিতে পারে। কুল ইন কুনতুম তুহিবুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহবিব কুমুল্লাহ্- পাক কালামের এই আয়াত হইতে সেই সত্যেরই প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে।

যাঁহারা সরল পথের প্রতি অনুগত তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাম।



মিরজা খানের নিকট লিখিত।
মকতুব নং- ২৬

আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও নবী করিম স. এর প্রতি দরদসমূহের পর জানাইতেছি, তুমি যে টাকা প্রেরণ করিয়াছ, তাহা পাইয়াছি এবং তোমাকে সেজন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। এইদিকের ফকিরদের অবস্থা আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসার যোগ্য। তোমার সর্বাদীন কল্যাণ, শরীয়ত ও সুন্নতের প্রতি অটল অবস্থা এবং মর্যাদাবাহী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উন্নতি কামনা করি। তোমার পত্রও পাইয়াছি।

দেখ, যে সমস্ত দোয়া ও জিকির সম্পর্কে এই ফকির তোমাকে বলিয়াছে, তাহা এই তরিকার শর্তাবলীর সহিত পরম্পরায়ুক্ত মুখ্য বিষয় ছিল না কিংবা তরিকার রীতিনীতির উপর যে তাহাতে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল তাহাও নয়। তথাপি তাহা এই রকমভাবে বলা ছিল, যাহাতে তুমি একেবারে খালি অবস্থায় না থাক এবং সহবত লাভ করার মাধ্যমে তুমি সময় অতিবাহিত করিতে পার, যেন গাফলতীর ভিতরে থাকিয়া সময় নষ্ট না হইয়া যায়।

“আযকার ও আদীয়ায়ে মাসুরা” নামক পুস্তিকাটি এই ফকির বিশ্বস্ত হাদীস দ্বারা সংকলিত করিয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ জিকির ও দোয়ার গুণাবলীও সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তিকার নকল তোমার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যতদূর ইহার উপর আমল করিতে পার, আমল কর। পুস্তিকাটি আকারে বড় এবং তাহা ফারসী ভাষায় লিখিত। প্রচুর ফায়দা ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তুমি যদি অভিনিবেশ সহকারে পুস্তিকাটি আগাগোড়া অধ্যয়ন করিতে পার তাহা হইলে উত্তম ও ফলপ্রদ হইবে। এই পুস্তিকাটি একটি রত্নভাণ্ডার ছাড়া আর কিছু নয়, যাহা যথাসময়ে নৈকট্য লাভ করার রহস্য-পরিপূর্ণ একটি সমুদ্র এবং যাহা পবিত্র মনজিলসমূহে পৌছাইয়া দিতে সক্ষম। ইহার গভীর তলদেশ হইতে খাঁটি মুক্তা আহরণের জন্য সত্যিকার ডুবুরির প্রয়োজন। যদি কোন সাঁতারু থাকে, তাহা হইলে সে ইহার মধ্যে সাঁতার কাটিয়া তাহার আকাজ্জিত স্থানে পৌছাইয়া যাইবে।

তুমি লিখিয়াছিলে যে, কোন কোন পথের জন্য কামেল শায়েখের সহবত অতীব জরুরী। কিন্তু এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সিলসিলাতে অদৃশ্যভাবে ফায়দা প্রাপ্তির মহফিলে ভিড় জমিতেই থাকে। যেমন হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ র. ও হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর মাকামাতে বেলায়েতের পথ এবং নৈকট্যের মনজিলে প্রবেশ করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে হজরত খাজা র. এর খেদমতে থাকাকালীন অবস্থাতেই যোগ্যতার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাঁহারই সহবতের পূর্ণ আলোকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পূর্ণতা ও সমাপ্তির স্তরসমূহ তিনি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর মকতুব হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে, পথের সমাধান পাওয়ার পর যখন তিনি স্বগৃহে যাওয়ার জন্য দিল্লী হইতে পৃথক হইয়া যান, তখন পরস্পরের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান প্রদানের মাধ্যমে সিলসিলা জারি থাকে এবং সওয়াল ও জবাবের পালা চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার যে যে ফায়দা ও প্রাপ্তিযোগসমূহ সাধিত হইয়াছিল তাহা সকল বিতর্কের উর্ধ্বে, কেননা পরে পাওয়া এই সমস্ত লাভের বিষয় ছিল পরিপূর্ণতা অর্জনকারী পথের বিন্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ। নফসের পরিপূর্ণতা অর্জন এবং মনজিলসমূহের পথ প্রাপ্তির জন্য শায়েখের সহবত অত্যন্ত জরুরী।

হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. বন্ধুত্বের সম্পর্ক-লাভকারী (নেসবতে মাহবুবিয়াত) হালতের অধিকারী ছিলেন। সহবতহীন কোন পীর যদি অদৃশ্যভাবে ফয়েজ ও বরকতসমূহ জোরপূর্বক আদায় করিয়া লইতেন, তাহাতেও কোন কথা থাকিত না— কেননা প্রেমিকদের রকম-সকমই আলাদা রকমের হইয়া থাকে। তাঁহাদিগকে নির্বাচিত পথের দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সুপ্রশস্ত মনজিলে পৌছাইয়া দেওয়া হয়।

যদি সে না আসে নিজ হতে খুশী মনে
চুলের বাহার তাকে আনবে যে টেনে।

যদি প্রকাশ্যে পীরের সহিত কোন সম্পর্ক নাও থাকে, তবু আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার প্রতি দয়া করেন এবং একেবারে পথের মাঝে ছাড়িয়া দেন না। ইহা ব্যতীত বাকী সমস্ত কিছু এনাবতের রাস্তায় চলে এবং প্রকাশ্যে পীরের সহবতের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। ইহার সহিত উহার বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। হজরত মোজাদ্দের র. এর বন্ধুত্ব (মাহবুবিয়াত) হজরত খাজা বাকীবিল্লাহ্‌ র. এর নিকটও সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ছিল। হজরত খাজা র. আমাদের হজরত মোজাদ্দের র. এর সম্পর্কে এই কবিতা পাঠ করিতেন—

প্রিয়ার হিয়ার মাঝে গোপনে লুকানো থাকে
আমরণ প্রেমের বৈশাখী ঝড়—
আর প্রেমিকের প্রেম-উন্মত্ত মত্ততা থেকে
জেনে যায় সবে প্রেমের খবর।
প্রেমের কারণে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ে
প্রেমিকের দেহতনুমন—
আর প্রেমের সায়রে নিভতে সাঁতার কেটে
ফুটে উঠে প্রিয়া ফুলের মতন।

এই ফকির যাহা কিছু লিখিয়াছে তাহা এনাবতের রাস্তার সহিত সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে ইহাই হইতেছে মুরিদের পথ। এই পথ সম্পর্কেই আমি লিখিয়াছিলাম যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শায়েখের সহবতের উপরে উন্নতির সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে।

সেই সমস্ত উদার ও উচ্চ আখলাকের (আচার ব্যবহারের) মহত্ব হইতে তুমি কিছুমাত্র দূরে নহ। সর্বদা দোয়ার সহিত নিরাপত্তাজনিত শুভ পরিণতির জন্য স্মরণ রাখিবে।

যাঁহারা সরল পথে চলেন এবং নবী করিম স. এর অনুসরণ করেন তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাম।



মাওলানা বরখোরদার কাবুলীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২৭

তুমি যে সুন্দর পত্রখানি এই মিসকিনের নামে লিখিয়াছিলে, তাহা পাইয়া নিজেকে সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করিতেছি। তোমার চিঠিতে তুমি আনন্দের সহিত মহান ও উচ্চ আকাংখার প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশ করিয়াছ। ইহা অত্যন্ত কল্যাণকর ও সং আকাংখা। আল্লাহ্‌তায়ালার তোমার নেক আশ্রয়ের শিখাকে প্রজ্বলিত করিয়া দিন, আকাংখার শিখাকে আরও অধিক আলোকিত করিয়া দিন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাবতীয় বস্তু হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার নৈকট্য ও মারেফতের আলায় পর্যন্ত পৌছাইয়া দিন— ইল্লাহু ক্বারিবুমু মুজিব।

যে স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট, যাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের মধ্যে পরবর্তী সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত কলেমা তৈয়েবার বিরামহীন আমলের মধ্যে মশগুল থাকিবে এবং যতদূর পারিবে কলবের অনুকূল অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই জিকির করিতে থাকিবে। এই জিকির যদি নির্জনে করিতে পার, তাহা হইলে আরও ভাল। এই কলেমা তৈয়েবা বাতেনের পরিশুদ্ধির জন্য আশ্চর্য রকমের কার্যকরী ক্ষমতা রাখে। ইহার প্রথম অংশে (লা ইলাহা) সত্য ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর প্রতি অস্বীকৃতি এবং দ্বিতীয় অংশে (ইল্লাল্লাহু) আল্লাহ্‌তায়ালার সত্যের প্রতি স্বীকারোক্তি— আর ইহাই হইতেছে সমস্ত পথের (সুলুকের) সারকথা। হাদীস শরীফে আছে, আফজাল অর্থাৎ সর্বোত্তম জিকির হইতেছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আনুগত্যের প্রতি অটল থাক এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নবী করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আমল কর। বেদাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে এবং অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে। জনৈক বুজুর্গ বলিয়াছেন, ভাল কাজতো ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকারের লোকে করিয়া থাকে কিন্তু আদেশ অমান্য করা হইতে নিজেকে বিরত রাখা হইতেছে সত্যবাদীর (সিদ্দীকের) জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই মিসকিনকে দোয়া ও সালামতীর সহিত স্মরণ রাখিও।

ইহার পর একটি প্রশ্নের জবাবে বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থানসমূহের ও তাহার পরিবর্তনের বিষয়ে হাদীসের আলোকে আত্মিক ভ্রমণের ফল লাভ (সায়ের

হাসিল) সম্পর্কে আলোচনা করেন। হাদীসের বিভিন্ন তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা প্রমাণিত করেন যে, মূল্যবান ও মনোরম পোশাক, সালেকের (আত্মিক-ভ্রমণকারীর) জন্য ক্ষতিকর নয়। হাদীসের মূল তাৎপর্যসমূহ উদঘাটন করিয়া শরীয়ত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং নিজস্ব বোধশক্তি হইতে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন বিস্ময়কর বিষয়সমূহ বর্ণনা করেন। এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও বর্ণনা যাহা কেবল হাদীস বিশেষজ্ঞদের বোধগম্যের অন্তর্ভুক্ত, তদসংক্রান্ত কয়েক পৃষ্ঠার অনুবাদ এখানে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

(এই মকতুবের শেষের দিকে তিনি বলিতেছেন)– তুমি লিখিয়াছ, বেদাতী, ঘুষখোর অথবা খোলাখুলিভাবে যাহারা পাপকার্য ও ব্যভিচারে লিপ্ত তাহাদের নিকট যাওয়া এবং তাহাদের আহ্বায় বস্তু ভক্ষণ করা কি রকম কাজ হইবে? দেখ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সর্ব প্রথমে ঐ সমস্ত লোকের নিকট যাওয়া হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তারিকার প্রেমিকদের জন্য তো তাহা অবশ্য কর্তব্য। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন কোন আইন মানে না অর্থাৎ সেরকম কোন জরুরী প্রয়োজনের বিষয় স্বতন্ত্র। খাদ্য সম্পর্কিত বিষয়ের সারকথা হইতেছে, যদি জানা যায় কোন খাবার হারাম পদ্ধতি দ্বারা উপার্জিত তাহা হইলে ঐ খাদ্য আহার করা হারাম। আর যদি জানা যায় যে, উহা হালালভাবে সংগৃহীত তাহা হইলে ঐ খাদ্য হালাল। আর যে ক্ষেত্রে হারাম হালাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, সে ক্ষেত্রে ঐ আহ্বায় বস্তু সন্দেহজনক এবং তাহা আহার না করাই উত্তম।

তুমি আরও একটি কথা লিখিয়াছ যাহা হইতেছে, কোন কোন অস্বীকারকারী নাকি বলে যে, কোন বিশেষ তারিকা অনুসারে মুরিদ করা বেদাত কাজ। দেখ, সত্যের সন্ধানে আহবান করা, দ্বীনের পথে পথ প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করা এবং এই বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার সহিত সম্পর্ক কয়েম করা শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী করা হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ করেন– ওয়াব তাণ্ড এলাইহি ওয়াসিলা– অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে অসিলার সন্ধান কর। ফায়দা এবং লাভের সন্ধান পাওয়ার মত মৌলিক বিষয়ের কার্যক্রম (সিলসিলা) যাহাকে অন্য নামে পীরি-মুরিদী বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা পয়গম্বর আলায়হি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আসসালাতু ওয়া সালামের অর্থাৎ পয়গম্বর আলায়হি ওয়া সালাম ও সাহাবাদের জামানা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা এমন কোন নূতন বিষয় নয়, যাহা মাশায়েখ এবং সূফীগণ নিজের ইচ্ছামত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমস্ত মাশায়েখের কার্যক্রম ও সিলসিলা আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম পর্যন্ত পৌছানোর পর সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। নকশবন্দিয়া তারিকার সিলসিলা হজরত সিদ্দীকে আকবর (হজরত

আবুবকর সিদ্দীক) রহিআল্লাহুতায়ালা আনহুর মাধ্যমে এবং বাকী অন্যান্য তরিকার সিলসিলা হজরত আলী রহিআল্লাহুতায়ালা আনহুর মাধ্যমে সরদারে কায়েনাৎ হুজুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়াছে। তাহা হইলে এই বায়াত হওয়ার তরিকা বেদাত কাজ বলিয়া কিভাবে পরিগণিত হইতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্য ইহা বলিতে পার যে, পীরি-মুরিদী শব্দটা নূতন শব্দ-কিন্তু শব্দের কোন সমাদর থাকিতে পারে না।

মিলনের মৌলিকত্ব এবং তাহার প্রসার নিজ হইতেই বহাল থাকিবে। ‘এই বিশেষ তরিকায় মুরিদ করা বেদাত কাজ’ বলিতে জানি না ‘বিশেষ তরিকা’ কোন উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। আমাদের তরিকায় শিক্ষা ও জিকির রহিয়াছে। জিকির সম্পর্কে খোদ শরীয়তের আদেশ রহিয়াছে। ইহা তো এই রকম ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় যে, সহি বোখারী পাঠ করা এবং সত্য পথের পাঠ দেওয়াকে কেহ বেদাত কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিল।

যাহারা শরীয়ত ও সুন্নতকে অনুসরণ করিয়া সত্য পথে চলে তাহাদের সকলের উদ্দেশ্যে সালাম।



জনাব আবদুল হাকিমের নিকট
লিখিত। মকতুব নং- ২৮

(উপদেশ আকারে এবং পুণ্যাত্মাগণের গুণাবলী সম্পর্কে)

হে ভ্রাতঃ, বে-আদব ও বিদ্বৈষমূলক রীতিনীতির সাহচর্য হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ এবং বেদাতী মজলিস হইতে নিজেকে সকল সময় দূরে রাখ। এহিয়া মা'জরাযী কুদ্দিসা সিররুহ বলিয়াছেন, এই তিন শ্রেণীর সংসর্গ হইতে নিজেকে সর্বদা দূরে রাখিবেঃ-

১. গাফেল আলেম উলামাগণ,
২. স্তম্ভিকারকগণ এবং
৩. মূর্খ (জাহেল) সূফীগণ।

যে ব্যক্তি শায়েখের মসনদে উপবিষ্ট হইয়া আছে, আর তাহার আমল সুনতে-রসুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুরূপ নয় এবং সে নিজে শরীয়তের অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত নয়- খবরদার- খবরদার, সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহার নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে। এমন কি (পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য) ঐ শহরেও অবস্থান করিবে না, যেখানে ঐ ধরনের ভণ্ড প্রতারণক বসবাস করে। এমন যেন না হয় যে, সেখানে কিছুকাল বসবাস করিবার পর তাহার প্রতি কোন-না-কোনভাবে, শেষ পর্যন্ত, হৃদয় দুর্বল ও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং রূহানী কারখানার জগতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে কখনও অনুসরণ করিবার মত উপযুক্ত বলিয়া চিন্তা করা যায় না, কারণ আসলে সে একজন ভণ্ড বর্ণ-চোর। তাহার মধ্যে যদি বিভিন্ন রকমের দীন বেশ ও সন্ন্যাসীসুলভ আচার আচরণসমূহও দেখ এবং বাহ্যতঃ দুনিয়ার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই বলিয়া মনে ধারণা জন্মে তবু কখনও তাহার প্রতি মুহূর্তের জন্যও মনোযোগী হইবে না, পরন্তু তাহার সাহচর্য হইতে এমন ভাবে পলায়ন করিবে, যেমনভাবে কোন লোক হিংস্র বাঘ দেখিয়া পলায়ন করে।

সাইয়েদুত তায়েফা হজরত জুনয়েদ বাগদাদী কুদ্দিসা সিররুহু বলিয়াছেন, সফলকাম হওয়ার সকল পথই বন্ধ, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির সফলতার পথ ছাড়া- যে কেবলমাত্র আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে। সাইয়েদুত তায়েফা আরও বলিয়াছেন, বিশ্বাসীগণের পথ বস্তৃতঃপক্ষে (আল্লাহুতায়ালার) কিতাব ও সুনতের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং শরীয়ত ও তরীকতের উপর যে সমস্ত উলামাগণের ঠিকমত আমল আছে এবং যাহারা নবী করিম স. এর ওয়ারিস হওয়ার মত উপযুক্ত তাঁহারা প্রতিজ্ঞায়, আচার ব্যবহারে এবং সকল কার্যে আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকারী হইয়া থাকেন। পুনরায় লিখিতেছি যে, যাহারা নবী করিম স. এর আদব ও সম্মানের প্রতি মনোযোগী নয় এবং মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সুনতকে পরিত্যাগ করে কখনও কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি (আরেফ) বলিয়া মনে করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক ভাবভঙ্গী, আচার আচরণ, মন্তব্যউচ্চারণ, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং একত্ববাদের তত্ত্বকথাসম্পন্ন কপচান বুলির প্রতি আসক্ত ও মোহিত হইয়া পড়িও না।

শরীয়তের আনুগত্যকে ঘিরিয়া সমস্ত কর্মের পরিধি ব্যাপ্ত এবং পরিত্রাণের উপায় কেবলমাত্র রসুলে করিম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পদচিহ্ন অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ন্যায় ও সত্যের সঙ্গে মিথ্যা ও ধ্বংসকারী বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী জ্ঞান কেবলমাত্র পয়গম্বর স. এর আনুগত্যের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্মের প্রতি আসক্তি এবং আল্লাহুতায়ালার প্রতি পূর্ণ

বিশ্বাস (তাওয়াক্কাল) ব্যতীত রসুল স. এর প্রতি আনুগত্য কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ ও ধ্যান এবং প্রেম ও আনন্দ দুই-জাহানের সরদার হুজুর স. এর মাধ্যম ও সহায়তা ব্যতীত মূল্যহীন অপ্রয়োজনীয় বস্তু। কারামতের পরিধি তো সাধনা ও পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল, মারেফতের সহিত তাহার সম্পর্ক কোথায়?

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক র. বলিয়াছেন, আদবসমূহ পালন করিতে যে অলসতা প্রদর্শন করে, সে সুনুত পালনে অকৃতকার্য হয়, যে সুনুতসমূহ প্রতিপালনে গাফেল হইয়া পড়ে, সে ফরজ পালন করিতে ব্যর্থ হয় এবং যে ফরজ পালন করিতে গড়িমসি করে, সে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় লাভ করা (মারেফত) হইতে বঞ্চিত হয়।

শায়েখ আবু সাঈদ আবুল খায়ের র. কে লোকেরা বলিল, অমুক ব্যক্তি পানির উপর দিয়া যাতায়াত করে। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, খড়্‌কুটাও তো পানির উপর দিয়া যায় (কিন্তু ইহাতে কোন আশ্চর্যের কথা নয়)। পুনরায় তাহারা বলিল, অমুক লোক বাতাসে উড়িয়া চলে। উত্তরে তিনি বলিলেন, চিল ও মাছিও তো বাতাসে উড়িয়া চলে। লোকেরা আবার তাঁহাকে বলিল, অমুক লোক পলকের মধ্যে এক শহর হইতে অন্য শহরে চলিয়া যাইতে পারে। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে, শয়তানও তো এক নিঃশ্বাসে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে চলিয়া যায়। এই সমস্ত কথার কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি যিনি সৃষ্ট জগতের সঙ্গে থাকিয়াও নিজেকে সেখান হইতে সরাইয়া রাখেন এবং স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে অবস্থান করিয়াও এক মুহূর্তের জন্য মহান প্রভু আল্লাহ্‌তায়ালার হইতে গাফেল থাকেন না।

শায়েখ আলী ইবনে আবুবকর কুদ্দিসা সিররুহ্ বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সৌন্দর্য ও পূর্ণতা তাহার সারাজীবনব্যাপী প্রকাশ্যে ও গোপনে, মূলনীতি ও সমস্ত শাখা-প্রশাখায়, জ্ঞান বুদ্ধি ও কাজকর্মে, অভ্যাসে ও দাসত্বে রসুলে করিম সল্লাল্লহু আলায়হি ওয় সাল্লামের আনুগত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

যদি কেহ কোন সময় কোন পাপকার্য করিয়া ফেলে, সেক্ষেত্রে বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাহার সংশোধন করা প্রয়োজন। গোপন গোনাহসমূহের জন্য গোপনে এবং প্রকাশ্য গোনাহসমূহের জন্য প্রকাশ্যভাবে তওবা করিতে হইবে। কোন পাপকর্মের জন্য তওবা করিতে যেন বিলম্ব না ঘটে। কথিত আছে যে, কেরামান কাতেবীন তিন মুহূর্ত (সাতে) পর্যন্ত গোনাহ লিখিতে দেবী করেন। এই সময়ের মধ্যে সত্যিকার অনুতপ্তচিত্তে যদি ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় তাহা হইলে সেই গোনাহ আর লেখা হয় না— অন্যথায় তাঁহাদের খাতায় গোনাহর হিসাব লেখা হইয়া যায়। জাফর বিন সনান র. বলিয়াছেন, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে

গাফলতী করা পাপকার্য করা অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। যদি জলদি তওবা করার নসীব না হয়, সেক্ষেত্রে মৃত্যু যন্ত্রণার পূর্ব পর্যন্ত যেন অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে তাঁহার দয়ার হস্ত প্রসারিত করেন, যাহাতে দিনের গোনাহ্‌গার অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইতে পারে এবং দিনেও তিনি তাঁহার দয়ার হস্ত বিস্তৃত করিয়া দেন, যাহাতে রাত্রির গোনাহ্‌গার তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারে।

মানুষের উচিত, পরহেজগারী ও সংযমশীলতাকে সে যেন নিজ অভ্যাসে পরিণত করে এবং নিষিদ্ধস্থানে যেন পা না রাখে। কেন না এই আত্মিক পরিভ্রমণের (সুলুকের) পথে নিষেধাজ্ঞা হইতে নিজেকে বিরত রাখা বস্তুতঃপক্ষে আদেশাদি প্রতিপালনের উদাহরণ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ ও উন্নয়নকামী।

জৈনিক দরবেশ বলিয়াছেন, ভাল আমল তো সং এবং অসং উভয় প্রকারের মানুষই করিয়া থাকে কিন্তু সকল প্রকার পাপ হইতে বাঁচার জন্য চেষ্টা করা কেবলমাত্র সত্যবাদীগণের (সিদ্দীকগণের) কাজ।

হাদীস শরীফে আছে, হালাল যেমন স্পষ্টভাবে বোধগম্য, হারামও তদ্রূপ। আর যে বস্তু সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, তাহা পরিহার কর।

যদি নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য ব্যবসা বা ঐ জাতীয় হালাল বৃত্তি কেহ গ্রহণ করে, তাহা দোষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও পুণ্যকর্ম, কেন না পূর্বপুরুষগণও তাহা করিয়া গিয়াছেন। হাদীস শরীফে হালাল বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি কেহ আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসাকে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করে তবে তাহাও উত্তম— কিন্তু শর্ত হইতেছে যে, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে না এবং লোভের বশবর্তী হইবে না।

আবু মোহাম্মদ মনাজিল র. বলিয়াছেন, কোন কিছু না করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) করার তুলনায় যে কোন হালাল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ভরসা করা শ্রেয়ঃ। আহার করার সময় সংযতচিত্ত হইতে হইবে। এত অধিক পরিমাণে আহার করিবে না যাহার ফলে এবাদতে অলসতা ও মস্তুরতার সৃষ্টি হইতে পারে এবং এমন কম পরিমাণে আহার করিবে না যাহা (দুর্বলতার জন্য) আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির ও আনুগত্যের ইবাদতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে। হজরত খাজা নকশবন্দ র. এরশাদ করিয়াছেন, ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার খাও। কিন্তু দ্বীনের কাজও ভালভাবে পালন কর। খাওয়ার ব্যাপারে আসল কথা হইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সকল সময় অনুগত থাকার জন্য যে পরিমাণ আহার বান্দার জন্য সহায়ক এবং সাহায্যকারী হইতে পারে, তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম ও কল্যাণকর। আর ভিতরের এই আনুগত্যের কারখানাতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত আহার বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তাহা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য।

যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা ও চালচলনের মধ্যে শুদ্ধ নিয়তের প্রচেষ্টা থাকিবে। যে পর্যন্ত নিয়ত বিশুদ্ধ না হইবে সে পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। লোকের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী মেলামেশা করিবে। যে ধরনের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সত্যিকার উপকার ও প্রকৃত লাভের সম্ভান পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসনীয় এবং সেই সঙ্গে জরুরীও বটে।

ভাল ও মন্দ (নেক ও বদ) সকল প্রকার লোকের সঙ্গে খুশী মনে ভাল ব্যবহার করিতে হইবে, যদিও তাহার জন্য অন্তরে আনন্দ অথবা বিরূপ মনোভাব অনুভূত হয়। কোন ব্যক্তি অভিযোগ পেশ করিলে, তাহার সে অভিযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। সকলের সঙ্গে সব সময় উত্তম ব্যবহার করিবে। অকারণে কাহারও সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তায় মিষ্টভাষী হইতে হইবে। কাহারও সহিত যেন রুঢ় ও রুক্ষ আচরণ না করা হয়। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ়তা ও রুঢ়তা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

শায়েখ আবদুল্লাহ র. বলিয়াছেন, দরবেশী কেবলমাত্র নামাজ রোজা এবং রাত্রি জাগরণের নাম নয়— এইগুলি তো দাসত্ব করার উপকরণ মাত্র। দরবেশী তাহাকেই বলে, যাহাতে কাহারও অন্তরে কোন দুঃখ না পৌঁছায়। এই গুণ অর্জন করিতে পারিলে তবেই লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়।

মোহাম্মদ বিন সালিম র.কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, একজন আউলিয়াকে কিভাবে চেনা যাইতে পারে। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আউলিয়ার নিদর্শন হইতেছে, সে বিনয়ী, সরল ও নম্র হইবে; সকলের সহিত সুন্দর ব্যবহার করিবে; উজ্জ্বল চেহারা, উদার আত্মা ও আত্ম-সমালোচনার অধিকারী হইবে; অভিযোগকারীর অভিযোগ গ্রহণ করিবে এবং পাপী ও নেককার তামাম সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ মক্কী কুদ্দিসা সিররুহ্ বলিয়াছেন, বদান্যতা হইতেছে, যে ব্যক্তির উপর তোমার ক্রোধ আছে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, যাহাকে তুমি ঘৃণা কর তাহার জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করা এবং যাহার প্রতি তুমি বিমুখ তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করা। কথাবার্তা বলার সময় তাহার অভাব অভিযোগের প্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টি প্রদান কর। অধিক নিদ্দা ও বেশী হাস্যপরিহাস করা ঠিক নয়, কেন না ইহার প্রভাবে অন্তর মৃত হইয়া পড়ে।

নিজের সমস্ত কাজের ভার আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি অর্পণ কর এবং হক মওলার খেদমতে সকল সময় নিরলস ও সজাগ থাক। এইরূপ করিলে সমস্ত বিষয়ের তদবীর হইতে নির্লিপ্ত হইয়া যাইবে (এবং সমস্ত কাজ অদৃশ্যলোক (গায়েব) হইতে সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে)। সাইয়েদুত তায়েফা র. অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলিয়াছেন

যে, দুনিয়ার সকল সফলতার রহস্য লুকাইয়া আছে সকল প্রকার প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করার মধ্যে। যখন মন কেবল একটি দিকে (আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে) স্থায়ী হইয়া যায় তখন আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া দেন। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি তাহার সকল দুঃখকে একটি মাত্র দুঃখে (অর্থাৎ আখেরাতের দুঃখে) পরিণত করে, আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কার্য সমাধা করিয়া দেন। এমন কি, এই কারণে আল্লাহ্‌পাক তাঁহার বান্দাদিগকে ঐ ব্যক্তির প্রতি এমন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল করিয়া দেন, যাহার ফলে তাহারা ঐ ব্যক্তির কাজ নিজ হইতে সম্পন্ন করিয়া দেয়।

ইয়াহিয়া মাজরাজি র. বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র সহিত তোমার যে প্রকার ভালবাসা থাকিবে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিও তোমাকে সেই প্রকার ভালবাসিবে। তুমি আল্লাহ্‌কে যে পরিমাণ ভয় করিবে, আল্লাহ্‌র মখলুকও (সকল সৃষ্ট জীবও) তোমাকে সেই পরিমাণ ভয় করিবে এবং তুমি আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ পালনে নিজেকে যত বেশী মশগুল রাখিবে আল্লাহ্‌তায়ালার মখলুকও তোমার কথা তত বেশী মানিবে।

পরোয়ারদেগারের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কাহারও উপর ভরসা করিবে না। পরিবার পরিজনসহ সকল মানুষের সহিত সৎ আচরণ করিবে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাহাদের সকলের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখিবে, যাহার ফলে তাহাদের দাবী (হক) যেন ঠিকমত প্রতিপালন করা হয়। কিন্তু তাহাদের সহিত যেন তোমার চিরকালের সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, কেননা এইরূপ হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে অসন্তুষ্টির আশংকা থাকে। তোমার ভিতরের (বাতেনের) অবস্থাসমূহ কখনও কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিও না। সাধ্যানুযায়ী ধনবান ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক না রাখার চেষ্টা করিবে। সর্ব অবস্থায় নবী করিম স. এর সুন্নতকে অবলম্বন করিয়া চলিবে। বেদাত হইতে সকল সময় দূরে থাকিবে। সালেকের খেয়াল রাখা উচিত, যেন সে কখনও কোন সন্দেহজনক ঘটনার সহিত জড়িত না হয়। মানুষের দোষত্রুটির প্রতি যেন সে নজর না দেয় এবং নিজের দোষত্রুটির প্রতি যেন তাহার সজাগ দৃষ্টি থাকে। কোন মুসলমান অপেক্ষা যেন সে নিজেকে প্রাধান্য না দেয় এবং অন্য সকলকে যেন নিজের চেয়ে ভাল মনে করে। প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে যেন সে এই বিশ্বাস রাখে যে, তাহার দোয়ার বরকতে আমার কাজ সমাধা হইতে পারে। যে সমস্ত মহৎপ্রাণ পুণ্যাভাগণ (সালেহীন) দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিবে। গরীব মিসকিনগণের সহিত মেলামেশা করিতে পছন্দ করিবে। পরনিন্দার প্রতি কখনও আসক্ত হইবে না এবং এই ধরনের নিন্দনীয় কাজে অন্যকেও সাধ্যমত বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। সৎকার্যে আদেশ এবং অসৎকার্যে নিষেধ (আমর বিল মারুফ আওর নেহী আনিল মুনকার) কে নিজ অভ্যাসে পরিণত করিবে। আল্লাহ্‌র

নিকট অকপটভাবে প্রত্যাবর্তনের জন্য আশান্বিত থাকিবে। সৌন্দর্যের আকর্ষণে আনন্দের অনুভূতিকে অন্তরে প্রকাশ করিবে এবং যে কোন পাপ কাজ হইতে নিজেকে দূরে বহুদূরে রাখিবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তির নিকট পাপকাজ বিশ্বাদ বলিয়া মনে হয় এবং সংকাজ তাহাকে খুশী করে, সে প্রকৃত মোমেন।

অভাবের জন্য ভীত হইয়া কুপণতা অবলম্বন করিও না। আল্লাহ্‌তায়াল্লা বলিয়াছেন, শয়তান তোমাকে দারিদ্রতা ও ক্ষুধার ভয় প্রদর্শন করে এবং মন্দের দিকে প্ররোচিত করে। অভাব এবং অল্পজীবিকার জন্য সংকীর্ণমনা হইও না। ভোগ-বিলাসের কাল তো সম্মুখে আগুয়ান হইয়া আসিতেছে।

হে আল্লাহ্‌, আরাম-আয়েশের যাহা কিছু আছে, তাহা তো কেবলমাত্র আখেরাতেরই আরাম আয়েশ। এখানকার অভাব অনটন তখনকার জন্য তো প্রাচুর্যের নিমিত্ত হইয়া যাইবে।

ফকির এবং দীনদারদের খেদমতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা পোষণ করিবে না। জাফর খালদী র. বলিয়াছেন, সংব্যক্তিগণের প্রচেষ্টা নিজের ভাইদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে— নিজের ভোগ বিলাসের জন্য নয়। আবু আবদুল্লাহ্‌ খফীফ র. বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক দরবেশ একদা আমার মেহমান হইয়া হঠাৎ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আমি স্বহস্তে তাঁহার দেখাশুনা ও সেবায়ত্ত্ব করার কাজকে জরুরী কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিলাম। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আমি তাঁহার জন্য বড় পাত্র পাতিয়া রাখিতাম এবং উঠাইয়া লইতাম। কিছুক্ষণের জন্য একসময় আমার একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছিল, আর সেই সময় দরবেশ আমাকে ইচ্ছামত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌ তোর উপর লানত দিক। এই ঘটনার পরে লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সেই দরবেশ যখন তোমাকে ‘আল্লাহ্‌ তোর উপর লানত দিক বলিয়াছিলেন, তখন তোমার নিজের নফসকে তুমি কিরূপ অবস্থায় পাইয়াছিলে? উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, আমার নিকট এরূপ মনে হইয়াছিল যেন তিনি আমাকে দোয়া করিলেন এবং ‘আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক’— এই কথা বলিলেন।

আদবের সহিত সুফিদের খেদমত কর, যাহাতে তাঁহাদের বরকতে তুমি সম্পদশালী হইতে পার। কোন বেআদব আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। আমি সুফিগণের প্রতি আদবের বিষয়ে পৃথকভাবে (পুস্তিকা আকারে প্রকাশের জন্য) লেখা সংগ্রহের এরাদা করিয়াছি। হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এই বিষয়ে একটি অমূল্য পুস্তিকা প্রবন্ধকারে রচনা করিয়াছেন এবং আদব সংক্রান্ত কিছু কিছু জরুরী বিষয় তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তিকাটি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া লইবে। সম্পূর্ণরূপে মাটিতে মিশিয়া এবং অস্তিত্বহীন হইয়া এই সমস্ত বুজুর্গগণের খেদমতে পৌছান যায়, অন্যথায়

তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা। কেননা ইহার বিরোধিতা করিলে ক্ষতিসমূহের সম্ভাবনা থাকে এবং কোন লাভ হয় না।

আবু বকর বিন সাবদান র. বলিয়াছেন, কেহ সুফিদের সাহচর্য অবলম্বন করিতে চাহিলে তাহার পক্ষে উচিত হইবে যে, সে যেন মন হইতে সমস্ত কামনা বাসনা অহংকার ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তাঁহাদের সহিত অবস্থান করে। আর যদি নিজ পরিমণ্ডলের মধ্যে কোন বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই কাজ তাহার আকাংখিত স্থানে পৌঁছানোর পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে।

সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুমহান সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে আরামের মধ্যে রাখিলে চলিবে না। সকল সময় ব্যথা-ব্যাকুলতায় নিজেকে উদ্বেল রাখিতে হইবে। আবু বকর তমসতানী র. বলিয়াছেন, সুফীবাদের অপর নাম মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতা। শান্তি থাকিলে আর আধ্যাত্মিক সাধনা থাকে না। মাশুক ছাড়া আশেক কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইতে পারে না। তাহার অন্তরের তলদেশ হইতে সব সময় এই আওয়াজ বাহির হইতে থাকিবেঃ—

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু,
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুঁজিয়া মরে
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

মুরিদকে এই রকম গুণের অধিকারী হইতে হইবে যেমন এই আয়াত শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে।

‘যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই।’ (সূরা তওবা-১১৮ আয়াত)।

মুরিদেবের তৃষ্ণা যখন এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু প্রশস্ততার পরিবর্তে তাহার নিকট সংকীর্ণ ও অন্ধকার হইয়া পড়িবে, তখন আশা করা যায় যে, আল্লাহপাকের রহমত জোশের মধ্যে আসিয়া যাইবে এবং সর্বস্বত্যাগী প্রেমিক আশেককে আল্লাহ্ নিজ আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবেন।

টীকাঃ এই আয়াত শরীফে ঐ তিন সাহাবী সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যাহারা তবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিলেন। এই কারণে তাঁহাদিগকে একঘরে হইয়া ৫০ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। পরিশেষে তাঁহাদের তওবা কবুল হয়।

দিলাম তোমাকে আমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের
দিক-চিহ্ন আর পূর্ণ পরিচয়-
যদি না পারি পৌছাতে কখনও সেখানে আমি
পৌছে যাবে হয়ত তুমি নিশ্চয়।

তোমার মত বন্ধুদের নিকট এই মিসকিনের অনুরোধ, আমার মত অসহায়
পাপীকে তোমরা দোয়া করা হইতে ভুলিয়া থাকিবে না এবং আল্লাহ্‌তায়ালার
সাধারণ দয়ায় যাহাতে কমপক্ষে মৃত গোনাহ্‌গারদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি
দয়াময়ের নিকট আমার জন্য সেই প্রার্থনা করিবে।

কোথায় রয়েছি পড়ে একা আমি বিজন প্রান্তরে
কে জানে কোথায় পড়িছে তাহার চুলের বাঁধন খুলি
কী অদ্ভুত পাগলামী ঢুকেছে আমার মাথার কোটরে
সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমি রইলাম সব ভুলি।

সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল
মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।



মাওলানা মোহাম্মদ আমিন লাহোরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২৯।

প্রশ্নঃ সুফিতত্ত্বে যে সমস্ত গুঢ়তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য তাহার অন্যতম হইতেছে ইসলামের
স্বরূপ ও যথার্থতা নফসের প্রশান্তির সহিত সম্পর্কিত- যাহা অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা
হইতে সুরক্ষিত। আবার মোটামুটি এই ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসও দেখা যায় যে, ইমানের
অবস্থান ভয় ও আশার মাঝখানে। আর আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলিয়াছেন, ‘আল্লাহর কসম, আমার জানা নাই, যদিও আমি আল্লাহর রসুল, আমার
এবং তোমাদের সহিত কি প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।’

টীকাঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিন বিন মাওলানা খাজা হোসেনী আল হরদী সুন্মাল লাহোরী
হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হইতে কান্দাহার নামক স্থানে তিনি বসবাস স্থাপন করেন। তিনি
শায়েখ জয়নুদ্দিন খোয়াফী র. এর নিকট হইতে এলেম শিক্ষা করেন। আকবরের রাজত্বকালে তিনি
হিন্দুস্তানে আগমন করেন এবং লাহোরের সন্নিহিতে মূলকপুর নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন।
তিনি ৮৬ বৎসর জীবিত ছিলেন (নুহাতুল খওয়াতির, ৫ম খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা)।

জবাব^{3/4} প্রথমে জানিতে হইবে যে, নফসের প্রশান্তি হইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালার কর্তৃক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত আদেশসমূহের পরিপূর্ণতা, তাঁহার সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা এবং জান্নাত সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদানকারী বিষয়সমূহ। কিন্তু কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রশান্তি অর্জনের বিষয় স্থির করা হয় আলামত (লক্ষণ) সমূহ দ্বারা অথবা হৃদয়ের বিশ্বাস ও অনুভূতির মাধ্যমে এবং ইহার সব কিছুই কেবলমাত্র ধারণাপ্রসূত— যাহা আসল ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত নয়। বিশ্বাস তো ওহি এবং আশ্বিয়াগণের সংবাদসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং আঁ-হজরত সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ‘আল্লাহর কসম’ অজ্ঞাত কোন কিছুর সমাপ্তির রীতিনীতি পূর্ণ নয়— কেননা আঁ হজরত সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নফসের প্রশান্তি ও তাঁহার সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিণতি তো সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও চির অমর। বরঞ্চ তাঁহার বক্তব্যের (এরশাদের) যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যাহা আমার ও অন্যান্যদের সহিত দুনিয়া ও আখেরাতে সমাগত হইবে তাহা আমি জানি না— এই জন্য যে গায়েবের জ্ঞান (এলমেগায়েব) একমাত্র সেই পরম সত্য ও পবিত্র আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট বিশেষভাবে রক্ষিত।



শায়েখ আব্দুল আহাদের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৩০

প্রিয় পুত্র (ফরজন্দে আরজুমন্দ) আব্দুল আহাদ এই মিসকিনের নিকট জানিতে চাহিয়াছে যে, নামাজের সময় সালেব কোন বিষয়ের প্রতি নিজেবকে নিবিষ্ট রাখিবে? সেই সর্বকর্তৃত্বময় প্রভুর প্রতি যিনি সেজদা ও উপাসনা গ্রহণ করার মূলে সদা বিরাজমান, নাকি মহা মহিমামণ্ডিত কোরআনের প্রতি যাহা নামাজের প্রাণকেন্দ্র অথবা যেদিকে মুখ করিয়া সেজদা করা হয় সেই আল্লাহর ঘর কাবার দিকে? নাকি নম্রতা ও ভয়ভীতি সহকারে সর্বান্তঃকরণে নামাজের মূল বিষয়গুলির (আরকানের) প্রতি খেয়াল করিবে যাহা নামাজের সময় পালন করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে অথবা এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি একই সঙ্গে মনোনিবেশ করিতে হইবে? আর ঐ সমস্তের মধ্যে প্রত্যেক ব্যাপারে কিছু কিছু দ্বিধা ও সন্দেহের মনোভাবও ব্যক্ত করা হইয়াছে।

মকতুবাতে মাসুমীয়া/৮৪

হে সৌভাগ্যশালী। নামাজ যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহাদের জন্য যাহা নির্ধারিত ও জরুরী তাহা হইতেছে, নামাজের মূল বিষয়গুলির (আরকানের) প্রতি গভীর মনোযোগ রাখা, কওমা জলসা ইত্যাদিতে বিরামের দিকে খেয়াল রাখা এবং বিনীতভাবে ভয়ের (খুজু ও খুশুর) সঙ্গে নামাজ পাঠ করা। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করিয়াছেন, ‘ঐ সমস্ত লোক সফলকাম হইয়াছে যাহারা তাহাদের নামাজ খুশু খুজুর সহিত সম্পন্ন করিতে পারে’। আর নামাজের মধ্যে খুশু হইতেছে, যেমন দাঁড়ান অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং এই রকমভাবে রুকু, সেজদা প্রভৃতির জন্য নির্ধারিত স্থানসমূহে দৃষ্টি নিয়োজিত রাখা। ইহার সঙ্গে কোরআন শরীফের কেরাতের প্রতি মনোযোগ এবং তাহার অর্থ ও ভিতরের মর্মবাণীর প্রতি খেয়াল করিতে হইবে। (যদি সে অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয়) অন্যথায় ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র কোরআনের বাণী (কালাম) এইটুকু খেয়ালে থাকাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্‌র জাতের প্রতি খেয়াল করা নামাজের জন্য নির্ধারিত নিয়মের মধ্যে নয়। তৎসত্ত্বেও আমি বলিতেছি যে, উপরে বর্ণিত (খুশুর অর্থ বর্ণনা করিবার সময় আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি) বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল করিলে, নাম ও গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যাঁহাকে আমরা সেজদা করি তাঁহার প্রতিই খেয়াল করা হয়।

টীকাঃ মখদুমজাদা শায়েখ আব্দুল আহাদ র. ছিলেন হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর প্রপৌত্র হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ সেরহিন্দী র. এর পুত্র এবং হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী র. এর ভ্রাতৃপুত্র। তিনি প্রথমে তাঁহার পিতার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন এবং পরে নিজ চাচা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট হইতে খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি হজ্জতুল্লাহ্‌ শায়েখ খাজা মোহাম্মদ নকশবন্দ ইবনে খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট হইতেও বহু বাতেনী জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বহু পুস্তকের রচয়িতা এবং একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে এবং তাঁহার রচনাবলী হইতে পৃথিবীর বহু ব্যক্তি প্রভূত উপকার ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ১১২৭ হিজরীর ২৭শে জিলহজ্জ তারিখে শুক্রবারে তিনি দিল্লীতে ওফাত প্রাপ্ত হন। সেরহিন্দে তাঁহার দাফন সম্পন্ন হয় (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া)।



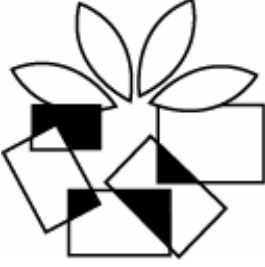
শায়েখ আবুল কাশেমের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩১

বন্ধুগণের ঔদ্ধত্য ও নাস্তিকতায় বিষণ্ণ হইও না। সমস্ত কিছু হকতায়ালার
তরফ হইতেই হয় বলিয়া জানিবে। সমস্ত বান্দার মন আল্লাহ্‌তায়ালার কবজার
মধ্যে, তিনি যে দিকে ইচ্ছা করেন, সেইদিকে তাহা ঘুরাইয়া দেন।

শত্রুরা তো দেখবে তোমার ক্ষতির কারণ খুঁজি
সাথে বন্ধুরাও যদি জোট বাঁধে সেই বিপক্ষের সাথে
খোদার ইচ্ছাতে সব কিছু ঘটে এইটুকু শুধু বুঝি
শত্রু মিত্র সবার মনতো বাঁধা আল্লাহ্র হাতে।

যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে তোমাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে
সরাইয়া রাখিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে চায়। আর তোমার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব
রাখে না (প্রকৃতপক্ষে) সে তোমাকে হকতায়ালার দিকে মশগুল থাকার সুযোগ
প্রদান করে। আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে নিবিষ্ট থাকা উত্তম, নাকি সৃষ্ট জীবের সঙ্গে
বন্ধুত্ব করা?

জনৈক কবি কি চমৎকারভাবেই না বলিয়াছেন :-
এই নিখিল বিশ্বকে হে আল্লাহ, তুমি আমা হতে
বিরূপ বিমুখ কর, যেন তারা আমার হিংসায়
সদা মত্ত থাকে; অস্তিত্বের কীর্তি মোর পথে পথে
মখলুকে মখলুকে হোক লুপ্ত, যেন নির্ধ্বিন্য
দুনিয়ার সব কিছু থেকে পারি ফিরাতে এ মুখ
চতুর্দিক হতে যেন ফিরে আসে এ মন আমার-
বিনিময়ে দাও তোমার অমর প্রেম-ভরা বুক
অন্তরে বিরহ আর বাহিরে মিলন অভিসার।



শায়েখ আবুল কাসেমের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩২

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা। তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি নিজের মধ্যে আপোষ, শান্তি ও মীমাংসার বিষয়ে লিখিয়াছ। ইহা খুবই ভাল কথা। শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন যত নিভিয়া যায় ততই উত্তম। বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ মানবিক কোন দুর্বলতার কারণে অপরাধ হইয়া যায় এবং বন্ধুত্ববিরোধী বাদ-প্রতিবাদের কোন ঘটনাও ঘটিয়া যায়। এই সমস্ত ভুলত্রুটিকে ক্ষমার চক্ষে দেখা উচিত এবং বন্ধুদের গুণাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরান দরকার।

নিহিত প্রজ্ঞাকে তব অন্তরের সাথে যুক্তকরি
পরিচয় দিও প্রকৃত জ্ঞানীর ও বুদ্ধিমানের।

কোন এক ব্যক্তি জনৈক বুজুর্গের সম্মুখে অপর এক ব্যক্তির নিন্দা করিতেছিল। তাহা শুনিয়া এ বুজুর্গ বলিয়াছিলেন, দেখ, আমার দৃষ্টি তো কেবল ঐ ব্যক্তির ভালো দিকগুলির প্রতিই নিবদ্ধ আছে যাহা তাহার দোষত্রুটি অপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা যেন তাহার ভাল গুণগুলি গ্রহণ করি এবং যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহা ক্ষমা ও বর্জন করি। বন্ধুগণে সৎগুণাবলীর দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।

মনিব তাঁহার গোলামের সঙ্গেও এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আচার আচরণ করিয়া থাকেন। গোলামের যে গোলাম তাহার সঙ্গেও এই প্রকার উত্তম আচরণ করা দরকার। তুমি লিখিয়াছ যে, ‘কোন কোন সালেক’ খবরগুলি আপনার নিকট পৌছাইয়া দিয়াছে এবং উত্তম ধারণার বশবর্তী হইয়া আপনি সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন এবং মনে মনে দুঃখিত হইয়াছেন। শিক্ষিত লোকদের নিকট হইতে এই ধরনের কথাবার্তা কেবল বিস্ময়ের উদ্বেক করে। লাগানো ভাঙ্গানোর কথা যাহারা বলে, তাহাদের কথা উত্তম ধারণার বশবর্তী হইয়া স্বীকার

করিয়া লইলে অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে যে উত্তম ধারণার যোগ্য ছিল তাহাকে সেই উত্তম ধারণা হইতে বঞ্চিত করা হয়।

দেখ যে ব্যক্তি চোগলখোরী করে তাহার কথাবার্তা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। চোগলখোরকে বিশ্বাস করা চোগলখোরী করা অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় কাজ— কারণ চোগলখোরী করা মানে দালালী করা, আর তাহা স্বীকার করার অর্থ হইতেছে তাহাতে সম্মতি প্রদান করা। ইহা স্পষ্ট যে, দালালী যে করে এবং তাহা যে স্বীকার করে, তাহারা দুইজনে সমান হইতে পারে না (দুইজনের তুলনায় যে স্বীকারকারী সে অবশ্যই অধিক মন্দের ভাগী হইবে)।



হিস্মৎ খানের নিকট লিখিত।

মকতুব নং— ৩৩

কেবলমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কিছুর গোলামী হইতে আল্লাহ্পাক তোমাকে মুক্তি প্রদান করিয়া নিজ ইচ্ছায় যেন তিনি তোমাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন। দেখ, আল্লাহ্‌তায়ালার মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই এবং মানুষকে তাহাদের মজ্জির উপরও তিনি ছাড়িয়া দেন নাই যে, তাহারা যাহা বুঝিবে সেইমত এবং খেয়ালখুশী অনুযায়ী যাহা করিতে তাহাদের মন চাহিবে সেইমত জীবন অতিবাহিত করিবে। আঁইয়াহ্‌ছাবুল আঁই ইউতরাকা ছুদা অর্থাৎ মানুষ কী এইরকম চিন্তা করে যে তাহাদিগকে এমনি অর্থহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (কোরআন)। মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশসমূহ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাঁহার দাসত্ব করা যাহার ফলে তাঁহার মারেফত লাভ করা যায়। কোন কোন বিষয়সমূহ প্রতিপালন করার জন্য তিনি আদেশ করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয় সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন। যদি এই সমস্ত আদেশ ও নিষেধকে অমান্য করিয়া কেহ (নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া) জীবন যাপন করে তাহা হইলে তাহার ঔদ্ধত্যের জন্য তাহাকে নাক্ষত্রিক বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়াবহ গজব ও আজাবের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। শেষ দিনের সেই ভয়ঙ্কর শাস্তি অবধারিতরূপে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইন্না আজাবা রাব্বুক

লাওয়াকিউম মালাহ্ মিন্ দাফিই— নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত শান্তি অবশ্যই সম্পন্ন হইবে, কেহ তাহা পরিহার করিতে পারিবে না (কোরআন)।

আল্লাহ্‌তায়ালার তাঁহার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচালনার অধীনে মানুষের জন্য তাহার মাথার উপরে অনেক পরিদর্শক (ফেরেশতা) নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের (মানুষের) যাবতীয় কথা ও কাজ এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও শক্তি প্রয়োগের দলিল সুরক্ষিত থাকে এবং তাহার আমলনামা তৈরী হইতে থাকে। হয়, অন্ধকারে পতিত বিপদগ্রস্ত হতভাগ্য পাপী মানুষ কোন উচ্চপদস্থ সরকারী পরিদর্শক কোন এলাকায় হাজির হইলেই তো সেখানকার বাসিন্দারা ভয়ে কাঁপিতে থাকে এবং যে কোন অন্যায় ও খারাপ কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। আর এখানে আল্লাহ্‌তায়ালার এইসব পরিদর্শক (ফেরেশতা) তাঁহাদের দিনের কার্যাবলী রাত্রে এবং রাত্রে কার্যাবলী প্রাতেঃ সেই সমস্ত-সম্মানের মালিক মহাসম্মানীয় প্রভুর নিকট পেশ করে। তবু আমাদের মত গাফেলদের কোন বোধোদয় হয় না এবং আমরা হুঁশিয়ার হইতে পারি না। উপরন্তু আরও অধিক পরিমাণে পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া কেবল অবাধ্য আর বেপরোয়া হইতে থাকি।

টীকাঃ হিম্মত খান মীর ঈসা ছিলেন আসলাম খান বদখশীর পুত্র। আলমগীর র. এর তত্ত্বাবধানে তিনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। তিনি অতিশয় সুন্দর আকৃতির, পবিত্র স্বভাবের ও উদার চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার সকল সময় মার্জিত ও মনোরম ছিল। এই কবিতা তিনিই রচনা করিয়াছিলেনঃ—

যতনে রাখিও গাঁথি প্রেমভরা হৃদয়ে তাহার
প্রেমের একটি চিরস্থায়ী কাঁটা,
ইহা ছাড়া প্রেমের মরুতে মজনুর মনে আর
ছিল নাক কোন কাঁটা, ছিল শুধু প্রেম দুর্নিবার।

আলমগীর র. এর দরবারে তাঁহার পিতার প্রভাব পূর্ব হইতেই ছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নিজ দক্ষতায় তিনি শাহী দরবারের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ আলমগীরের সিংহাসন আরোহণের ৬ষ্ঠ বৎসর পূর্তির সময় তাঁহার পিতা আখ্‌তার সুবেদারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি আখ্‌তার ফৌজদারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কর্মস্থলে বৎসরে বৎসরে তিনি উন্নতি সাধন করিতে থাকেন এবং এলাহাবাদের সুবেদারী পর্যন্ত তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ আলমগীরের রাজত্বের চব্বিশ বৎসর পূর্তিকালে আজমীর শহরের প্রধান সেনাপতির মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদে আসীন হইতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ঐ একই বৎসরে আজমীর শরীফের হেফাজতের জন্য আলমগীর র. তাঁহাকে তত্ত্বাবধানের কাজে আজমীরের কেন্দ্রায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ৫ই মহররম, ১০৯২ হিজরী সনে তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জনশীল ছিলেন। সমসাময়িক কালের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুবক্তা ও ভাষার সৌন্দর্যের জন্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষাতেও তিনি কবিতা বলিষ্ঠেন। লেখক হিসাবে তিনি ‘মীরন’ ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। (মাখুজআয্ মাইসারুল উমরায়ে, দ্বিতীয় খণ্ড)।

মাত্র কয়েক দিনের এই জীবন আমাদের নিকট খুবই প্রিয়। এই সুযোগ আল্লাহ্‌তায়ালার দান ও আশীর্বাদস্বরূপ। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, মূল ও মৌল কার্যাবলীর মাধ্যমে তাহা খরচ করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে, যদি এই প্রিয় জীবন কেবল বেহুদা ও শুধু অকাজের মধ্যে কাটিয়া যায়। একটু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিলেই সেই চিরস্থায়ী জগৎ আমাদের করায়ত্ত্ব হইতে পারে এবং সামান্য অবহেলা ও গাফলতির কারণে তাহা আমাদের নাগালের বাহিরেও চলিয়া যাইতে পারে। সকল সময় বেশী করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করাই হইতেছে আমাদের প্রধান কাজ। পরহেজগারী ও ধর্মভীরুতা (তাকওয়া) হইতেছে সকল সৎ কার্যাবলীর উদ্দেশ্য। দেখা যাক, কোন জওয়ান তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য আয়েশসামগ্রীর সুখ-সওদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলেমার সত্যকে হৃদয়ের সুরতরঙ্গে শ্রবণ করিয়া এই অর্থহীন উপদেশ খানিকে আত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া কবুল করিতে পারে কিনা—

দিলাম তোমাকে আমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের
দিকচিহ্ন আর পূর্ণ পরিচয়,
যদি না পারি পৌছাতে কখনও সেখানে আমি
পৌছে যাবে হয়ত তুমি নিশ্চয়।



মোহাম্মদ মাসুদ র. এর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩৪

মহব্বতের সঙ্গে যে সুন্দর পত্রখানি পাঠাইয়াছিলে তাহা পাঠ করিয়া প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছি। তুমি তোমার মস্তিষ্কে দুর্বলতার প্রভাব সম্পর্কে লিখিয়াছ। আল্লাহ্‌তায়ালার যেন তোমাকে দ্রুত আরোগ্য ও শক্তি দান করেন। দুর্বলতার কারণে যদি জিহ্বা দ্বারা জিকির (জিকিরে লিসান) করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে কলবের মাধ্যমে জিকির ও অন্তরের খেয়ালের মধ্যে অধিক মশগুল থাকিবে। খেয়াল কাহাকে বলে তাহা জান কি?

মোহের ফাঁদে আর কতকাল রইবে ভুলে হকতা'লাকে
বাতিল থেকে ফিরাও হৃদয় এবার তুমি হকের দিকে।

মিথ্যা হইতে সত্যের দিকে প্রত্যাগমন করাই হইতেছে ধ্যান বা খেয়াল।
সর্বপ্রথমে আল্লাহপাকের এবাদত ও তাঁহার মোরাকাবা করাকে সমস্ত খেয়ালের
সারাংশ বলিয়া জানিবে। ইহা সর্বনিম্ন পর্যায়ের জ্ঞান হইতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের
জ্ঞানের দিকে প্রবাহিত করে, প্রমাণপত্র হইতে প্রমাণের দিকে অভিনিবিষ্ট করে,
প্রতিবিন্দু হইতে মূলের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রশংসা ও গুণাবলী হইতে মাহাত্ম্যের
(শানের) দিকে এবং মাহাত্ম্য হইতে সেই মাহাত্ম্যের মালিকের নিকট পর্যন্ত
পৌছানোর সফলতা আনয়ন করে। মোট কথা, জিকিরের উদ্দেশ্য হইতেছে
গাফলতীকে বিতাড়িত করা। যে কোন উপায়েই হউক না কেন, গাফলত হইতে
বিচ্ছিন্ন থাকা জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আর সৎ উদ্দেশ্যের (নিয়তে সালেহা) সঙ্গে
সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজ, তাহা ক্রয়-বিক্রয় হউক বা এই ধরনের যে কোন কাজ
হউক না কেন, সব কিছুই জিকিরের সামিল হইয়া যায়। সঠিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত
দুনিয়াদারীর সকল কাজকর্মও মিলিতভাবে জিকিরে পরিণত হয় এবং তাহা দ্বারা
চিরস্থায়ী অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হইয়া থাকে।

সংসারের দায় দেনা সুখ শান্তি উপার্জন
মিশে গেছে এক হয়ে মোর কাছে এখন;-
শুধু সেই প্রেমিকের চিন্তাটুকু আছে বাকী
তরল আবেহায়াত যেথা পাকা হয়ে উঠে
হৃদয়ের পানপাত্রে যবে তারে ধরে রাখি;-
উন্নতির সিঁড়ি তার কাছে কেবল আসুক ছুটে।



মখদুমজাদা শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ৩৫

তোমার আনন্দদায়ক পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। নিজের বাতেনী ও জাহেরী অবস্থার কথা এইভাবে মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইবে। ইহা অদৃশ্য (গায়েব) হইতে অন্তরের মনোযোগ (তাওয়াজ্জাহ) আকর্ষণ করার জন্য সেতুবন্ধ রচনা করে। তুমি লিখিয়াছ যে, ফরজ ও তাহাজ্জুদ নামাজের মধ্যে এমন এক বিশেষ আবেশ ও আনন্দদায়ক মত্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইচ্ছা হয়, দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া নামাজে নিমগ্ন থাকি। ফজরের পরিব্যতিকালেও প্রায় এই অবস্থার বিকাশ ঘটে।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ। এই মিষ্টি আবেশ ও প্রফুল্লময় মত্ততা যাহা নামাজের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ফরজ নামাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহা প্রকৃত আনন্দদায়ক মত্ততার মূল উৎস। সেই সঙ্গে অন্য সময়েও নামাজের সময়ের মতো সুখদ অবস্থার উৎকর্ষতা বজায় থাকিতে পারে। দীর্ঘ কেরাতের সহিত নামাজ পড় এবং রুকু সেজদাও প্রলম্বিত কর। মাঝে মাঝে কোন ফরাশ বা বিছানা ছাড়া খালি জমিনের উপর নামাজ পড়িবে এবং নিজের পেশানীকে মাটির সহিত সম্পৃক্ত করিবে। কখনও কখনও জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া জনমানবহীন স্থানে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া খুব খুশি ও রগবতের সহিত (নফল) নামাজ পড়িবে। কলেমা তৈয়েবার ক্রমাগত আবৃত্তির জন্য নিজেকে সর্বদা অদম্য ও উৎসাহী রাখিবে। ব্যক্তিগত বাসনা ও প্রার্থনাসমূহের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবে এবং প্রতিবিম্ব হইতে মূলের দিকে আসক্ত হইয়া যাইবে। তুমি স্বপ্নে রসুলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ এবং দেখিয়াছ যে, আঁ-হজরত স. তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন আর তুমি নিজের জবানীতে বলিয়াছ, ইয়া রসুলান্নাহ্ খালা বিহইয়াদিই ইয়া শাফিউল মুজনেবিন খালা বিহইয়াদিই।

ইয়া রসুলুল্লাহ আমি যে ক্ষুদ্র অতি
রিক্ত সহায় সম্বলহীন,
তবু সাধ জাগে তোমার শাফায়াতের
হে শাফিউল মুজনেবিন।

এই স্বপ্ন অত্যন্ত মোবারক স্বপ্ন এবং আগাগোড়া স্বর্গীয় ও সুসংবাদবাহী। এই
আশা হইতেছে যেন ইহা পরকালের মুক্তির অসিলা এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য মুক্ত
বাতায়নস্বরূপ হইয়া যাইবে।

ওয়াসসালাম।



মখদুমজাদা শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ৩৬

যে মূল্যবান পত্রখানি তুমি এই মিসকিনের নামে পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়া
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ রহিয়াছ এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকারীর স্মরণ
হইতে নিজেকে কখনও বিরত রাখ নাই, সেজন্য আল্লাহুতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা
জ্ঞাপন করিতেছি। তুমি বিশিষ্ট সংযোগ (খাস্ নেসবত) সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ
এবং হাজেরীন (উপস্থিত) সঙ্গী-সাথীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছ।

দেখ, আমি তোমার নিকট হইতে কোন জিনিস দূরে সরাইয়া রাখি নাই।
তোমার ব্যাপারে কার্পণ্যতা আর অনুদারতা করা হয় নাই। বরঞ্চ তোমার দিকে
সর্বদা দৃষ্টি খোলা রাখি এবং তোমার উন্নতির আকাংখা পোষণ করি। এই পত্র
লিখিবার সময়েও তোমার প্রতি মনোযোগ (তাওয়াজ্জাহ) দেওয়া হইল, তুমি
মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় প্রকাশ পাইতেছ এবং দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে,
তোমার আলোকরশ্মি সৃষ্টিজগতকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তুমি খানকার হাজেরীনদের
সহিত যে প্রতিযোগিতা করিতেছ তাহা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তুমিও
শ্রেণী বিন্যাসের দিক হইতে এমন কিছু কম নহ, নিজ সঙ্গী সাথীদের মধ্যে তুমি
বিশিষ্ট। তবে হ্যাঁ, কোন কোন ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্য যোগ্যতাবলে অর্জিত হয়
তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার এবং সকল আলোচনার উর্ধ্বে। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন
যোগ্যতা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

সৎ অসতের পরিচয় কর্মে থাকে লেখা,
যুগ যুগ ধরে তাকে কাজ দিয়ে হয় দেখা।

তুমি যে দৌলত অর্জন করিয়াছ, অধিকাংশ লোক তাহা হইতে এখনও বঞ্চিত রহিয়াছে। যে সমস্ত বিষয় লাভ করিবার জন্য তোমার সমসাময়িক সাথীগণ এখনও দম ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না এবং তাহা হাসিল করিবার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করিতেছে, বহুপূর্বেই তুমি সে-সমস্ত বিষয়ে যোগ্যতার অধিকারী হইয়াছ। যে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যসমূহ (ফয়েজ ও বরকত) তোমার সহবতের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যদের মধ্যে তাহা প্রতীয়মান নহে। তোমার সম্পর্কে যাহা প্রতীয়মান হইতেছে তাহাই তোমার পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। তোমার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহাই তোমার বৈশিষ্ট্য এবং সমৃদ্ধময় পোশাকের (লেবাসে ফয়েজ) মধ্যে তোমার সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া উঠে।

তোমার মুরিদের মধ্যে তুমি দুইজন মুরিদের অবস্থা সম্পর্কে চিঠিতে যাহা লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া সীমাহীন খুশী হইয়াছি— হে আল্লাহ, তুমি তাহাদিগকে উর্ধ্বে আরোহণ कराও। মীর আব্দুল্লাহর অবস্থা অন্য তালেবের তুলনায় অধিক উন্নত। তবে এ কথা যেন খেয়াল থাকে যে, এই ধরনের কার্যাবলী যখন আল্লাহর অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন কখনও তাহা যোগ্যতার ভিত্তিতে হইয়া থাকে, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই রকম দেখা যায় যে, প্রতিফলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যাহাতে তাহার নিজস্ব যোগ্যতার পরিমাণ সেরকম থাকে না। যাহাই হউক না কেন, তবু তাহা অনন্যসাধারণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যাহারা হেদায়েতের পথে চলে এবং নবী করিম স. এর সুনুতের অনুসরণ করে তাহাদের সকলের প্রতি সালাম।

টীকাঃ শায়েখ মোহাম্মদ আশরাফ র. ছিলেন খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর চতুর্থ পুত্র। ১০৪৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মীয় বিষয়সমূহে তিনি পূর্ণ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তিবিদ্যায়, ইতিহাসে, ফিকাহ্‌শাফের (শরীয়ত সম্পর্কিত আইন) বিভিন্ন শাখায়, দর্শনে এবং তফসির ও হাদীসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বহু বিখ্যাত গ্রন্থের উপক্রমনিকা ও পাদটীকাসমূহ লিখিয়াছেন। নিজ পিতার নিকট বায়াত হওয়ার পর তিনি মরুদ্যানের পথসমূহ পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে মোজান্দেদিয়া তরিকাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২রা সফর, ১১১৭ হিজরীতে তিনি এই নশ্বর জগৎ হইতে অনন্তলোকে যাত্রা করেন। তাঁহার সম্মানিত পিতার কবরের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার অন্তিম সময়ে তিনি বার বার ‘হাসবী আল্লাহ্, ওয়া নেয়ামুল ওয়াকিল’ পাঠ করিয়াছিলেন। (রওজাতুল কাইয়ুমিয়া-দ্বিতীয় খণ্ড)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মকতুবাতে মাসুমীয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রাক্কালে অবনত মস্তকে আল্লাহ্‌পাকের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আলহামদুলিল্লাহি আলা জালিক। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা প্রবৃত্তিপীড়িত সাম্প্রতিক সমাজ চেতনার মূলে এক জ্যোতির্ময় আঘাত। প্রকৃত পথ অন্বেষণকারীদের অন্তরে এই অব্যর্থ আঘাত যে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌পাক এই মূল্যবান গ্রন্থটি অধ্যয়ন করার এবং এর মর্মবাণী উপলব্ধি করার যোগ্যতা আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

খাস মোজাদ্দেরিয়া তরিকায় দাখেল হবার জন্য আবারও আমরা আমাদের এই সাম্প্রতিকতম পুস্তক প্রকাশের মুহূর্তে সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানালাম। যুগোপযোগী এই মহান তরিকা শরীয়তের তিন উপাদানের (এলেম, আমল ও এখলাস) মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান ‘এখলাস’ অর্জনের অনুকূলে সর্বোত্তম সহযোগী।

জানানোই আমাদের দায়িত্ব। গ্রহণ করানোর মানসিকতা প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌পাকের। তাঁহারই প্রশংসা করি। যাবতীয় প্রকারের উৎকৃষ্ট দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হাবিবে পাক স. তাঁর বংশধর ও সহচরগণের প্রতি। আমিন।

সালাম। সূচনায়। সমাপ্তিতেও।

মোহাম্মদ মামুনের রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া
ভুইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

- ৭ তাফসীরে মাযহারী (১-১২) মোট ১২ খণ্ড।
- ৭ মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- ৭ মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- ৭ মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- ৭ মাব্দা ওয়া মা'আদ
- ৭ মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- ৭ নকশায়ে নকশ্বন্দ
- ৭ চেরাগে চিশ্তী
- ৭ বায়ানুল বাকী
- ৭ জীলান সূর্যের হাতছানি
- ৭ নূরে সেরহিন্দ
- ৭ কালিয়ারের কুতুব
- ৭ প্রথম পরিবার
- ৭ মহাপ্রেমিক মুসা
- ৭ তুমিতো মোর্শেদ মহান
- ৭ নবীনন্দিনী
- ৭ পিতা ইব্রাহীম
- ৭ আবার আসবেন তিনি
- ৭ সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ৭ ফেরাতের তীর
- ৭ মহাপ্লাবনের কাহিনী
- ৭ দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- ৭ কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- ৭ THE PATH
- ৭ পথ পরিচিতি
- ৭ নামাজের নিয়ম
- ৭ রমজান মাস
- ৭ ইসলামী বিশ্বাস
- ৭ BASICS IN ISLAM
- ৭ মালাবুদ্দা মিনহ্
- ৭ সোনার শিকল
- ৭ বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- ৭ সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- ৭ তৃষিত তিথির অতিথি
- ৭ ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- ৭ নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ৭ ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা



আহা এই অদৃশ্য বিস্ময়ভরা উদার হৃদয়
অন্তহীন অনন্ত আকাশে সদা বিচরণশীল,
স্বপ্নলোকে ধ্যানমগ্ন বিমূর্ত রহস্য করি জয়
দেখিল কী নিবিড় বন্ধনে ধরা তুচ্ছ এ নিখিল ।

কী গভীর মমতা আকীর্ণ রহস্য আকর মন
চমুক হয়ে টানিত সদা শত অভাজন জনে,
দিত অনন্তলোকের অমৃত সন্ধান-গুণ্ডধন
প্রেমের নিঃশব্দ ধারা চুপি চুপি বহতা যেখানে ।

ভোগের জোয়ারে জীবন ভাসানো সৃষ্টি তত্ত্ব নহে
অনাবিল এই সোজাপথে আছে উত্তরণী সেতু,
মারেফাত ছাড়া অন্তর কেমনে মুক অন্ধ রহে
পথে এস তবু খুঁজে পাবে পথপ্রস্তুতার হেতু ।

হেলাফেলা করে কেটে গেছে জীবনের বহুদিন
বিলাস বাসন সঞ্চয়ে নিত্যদিনের তুচ্ছতায়;
এদিকে রয়েছে পড়ে নফসের ক্ষেত কৃষিহীন
ভরে গেল রক্ষ ভূমি সবুজ সজীব মুগ্ধতায় ।

অবশেষে এই হৃদয়ের প্রেম-পিয়াসী পথিক
সেরহিন্দে খুঁজে পেয়েছিল হারানো পথের দিক ।



বালা গাল উলা বি কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি
হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি



খাজা দিনারের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি।

ইহকালে এবং পরকালে নগদ রোজগারের সৌভাগ্য, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের সরদার হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সম্পর্কের সহিত বিজড়িত। দোজখ হইতে অব্যাহতি এবং জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারার মত যোগ্যতা অর্জন, সকল ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিকগণের নেতা এবং শ্রেষ্ঠ মানব ও মহাপুরুষগণের সর্দার একমাত্র নবী করিম স. এর আনুগত্যের উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল। এমন কি আল্লাহুতায়ালার রেজামন্দী (সন্তুষ্টি) পর্যন্ত রসূলে-মোখতার স. এর অনুসরণের ভিত্তিতে ওয়াদাবদ্ধ। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, ধর্মের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস- একনিষ্ঠভাবে আঁ-হজরত স. এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আল্লাহর স্মরণ, ধ্যান এবং তাঁহাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও আশার আনন্দ সমস্ত কিছু রসূলেপাক স. এর মাধ্যম ও সহায়তা ব্যতীত নিষ্ফল ও ভিত্তিহীন। আওলিয়া র.-গণ, আকায়ে নামদার রসূলে মকবুল স. এর অন্তহীন সমুদ্রের ভাণ্ডার হইতে মাত্র এক চুমুক পরিমাণ মত পানির দ্বারা অনুগ্রহের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান এবং আশিয়া আ.গণ তাঁহার স. সেই অনন্তপ্রসবণ ধারার মধ্যে মাত্র একটি পাত্রের সমান পূর্ণতা দ্বারা প্লাবিত হইয়াছেন। ফেরেশতাগণ তাঁহার সহিত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যম, বেহেশত তাঁহার আবাস স্থল, যাবতীয় সৃষ্টির অস্তিত্ব তাঁহারই অস্তিত্বের সহিত মিলিত এবং সৃষ্টির সকল ধারাবাহিকতা তাঁহার যোগসূত্রের সহিত সম্পর্কিত। সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁহার অনুগত এবং এই পৃথিবীসহ অন্যান্য সমস্ত জগতের অধিপতি তাঁহার সন্তুষ্টির ব্যাপারে আত্মহী ও সন্ধানী।

অনাচারী পাপ আবার কেমন করে বাঁধে বাসা,
মহান নেতা আছেন যেথা নিয়ে পথের দিক ও দিশা।

নিঃসন্দেহে জনাবে রসুলুল্লাহ স. এমন একটি নূর যাহা হইতে রোশনী লাভ করা যায় এবং তিনি আল্লাহুতায়ালার তলোয়ারের মধ্যে সর্বোত্তম তলোয়ার।

সমস্ত দরুদ, সালাম ও সম্মান রসুল স. তাঁহার পরিবার পরিজন এবং তাঁহার সাহাবীগণের উপর কায়ম থাকুক।

সুতরাং ইহা সেই সমস্ত কর্তব্যপরায়ণ ও বুদ্ধিমান নওজোয়ানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, তাহারা যেন বাহিরে এবং অন্তরে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে সর্বদা রসুলেপাক স. এর আনুগত্যের প্রচেষ্টায় রত থাকে এবং যে সমস্ত কথাবার্তা রসুলে মকবুল স. এর আনুগত্যের বিরোধী, তাহাতে যেন তাহাদের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিশ্বাস যেন তাহাদের ঠিক থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি বহুবিধ গুণের অধিকারী এবং অসংখ্য কারামতের দাবীদার হয়, কিন্তু রসুলে করিম স. এর আনুগত্যের প্রতি সে যদি অলস হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির সাহচর্য ও ভালবাসা ঘাতকের বিষের মত জীবননাশক হইয়া দাঁড়াইবে। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তির যদি কিছুমাত্র কারামত বা অন্যান্য গুণ না থাকে কিন্তু তাহাকে যদি রসুলুল্লাহ স. এর আনুগত্যের প্রতি অটল ও অকপট দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সাহচর্য ও ভালবাসাকে যে কোন বিষনাশক পাথরের মত উপকারী বলিয়া জানিবে।

শত চেষ্টা হবে নিষ্ফল প্রয়াস,
সত্যপথ খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
যতক্ষণ না, হে সাদী, মোস্তাফার
পদধূলি নিতেছ সাদরে চুমি।

তাঁহার প্রতি দরুদ, সালাম ও সম্মান বরকতসমূহ অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হউক।
(আমিন)।



কালিজ উল্লাহর নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২

পত্রে ষষ্ঠ প্রশ্ন ছিল, মৃত ব্যক্তির আত্মার পুণ্যের (রুহের সওয়াবের) জন্য, মৃত্যুর তৃতীয় এবং দশম দিবসে খানা খাওয়ানোর আয়োজন করা এবং তৃতীয় দিবসে ফুলের সমারোহপূর্ণ আয়োজন পালনের রীতিনীতি কোথা হইতে কীভাবে স্থির করা হইয়াছে?

দেখ, কোন আড়ম্বর ও কপটতা ছাড়া আল্লাহর ওয়াস্তে খানা খাওয়ানো এবং তাহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পৌছানো অত্যন্ত সৎ চিন্তা ও নেক কাজ। কিন্তু এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ স্থির করা সম্পর্কে বিশ্বস্ত কোন রীতিনীতির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৃতীয় দিবসে মৃতের জন্য ফুল দ্বারা কোন সামাজিক আচার পালন করার ব্যবস্থা শরীয়ত বিরুদ্ধ অপরাধমূলক (বেদাত) কাজ। তবে মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে শোক-দুঃখ ভোলায় জন্য মহিলাদের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করার ব্যাপারে প্রমাণাদি পাওয়া যায়। কেননা, মৃতের নিকটআত্মীয়দের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা শরীয়ত বিরোধী কাজ।

টীকাঃ কালিজ উল্লাহ ছিলেন মোহাম্মদ আনুদ্জানীর নিকট আত্মীয়। তাঁহার সম্পর্কে আর বিশদ কোন বিবরণ জানা যায় না। মকতুবাতে মাসুমীয়ার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার নাম ফতেহ্ উল্লাহ্ লেখা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার আসল নাম কালিজ উল্লাহ।



আবিদউল্লাহ বেগের নিকট
লিখিত। মকতুব নং- ৩

প্রশংসা ও দরুদ এবং দ্বীনের দাওয়াতের প্রতি আহ্বানের পর, প্রিয় ভাই মিরযা আবিদউল্লাহ বেগের খেদমতে জানাইতেছি যে, যে পত্রখানি তুমি মীর জিয়াউদ্দীন হোসেনের হাতে পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়া পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হইয়াছি। তোমার পত্রে অবস্থাসমূহের বিবরণ সুন্নতের স্বাদেগন্ধে ভরপুর থাকায় তাহা হইতে বিশেষ তাৎপর্যময় মৌলিক আনন্দের আশ্বাদ লাভ করিয়াছি। আল্লাহুতায়ালার যেন উন্নতির পথে সব সময় তোমাকে দৃঢ়পদক্ষেপের সহিত গতিশীল রাখেন এবং সুন্নতপালনের আনুগত্যে তোমাকে অটল রাখেন।

জ্ঞানীদের কোন কাজই অন্তর্নিহিত বিজ্ঞতা (হেকমত) হইতে খালি থাকে না। তোমার দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাওয়ার পিছনে অবশ্যই কোন তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক স্থানের মাটির ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও তাৎপর্য থাকে। প্রত্যেক শহরের একটা স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে, এমনকি প্রত্যেক গ্রামের আলাদা আলাদা নিজস্ব প্রকৃতি রহিয়াছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সকল স্থান হইতে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারে এবং প্রত্যেক স্থান হইতে পরিপূর্ণতার এক বিশেষ অবদান পাইয়া থাকে।

হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. একবার সুলতান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে লাহোরে তশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে প্রথম দিকে দুই-এক মাস তিনি খাজা কাসেমের বাস ভবনে অবস্থান করেন। সেই স্থান হইতে তিনি এমন সব রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমূহ লাভ করিয়াছিলেন, যাহার সম্পর্ক পরিপূর্ণরূপে বিলীন হওয়া (কামালতে ফানা) এবং ধ্বংসশীল বস্তুজগতের সমস্ত কিছু অস্তিত্ব-হীনতার মধ্যে পাওয়া যায়। আর সেই পত্রের (মকতুবের) প্রতি তিনি উদ্দিশ্ট হইয়াছিলেন—

“মানুষের উপর এমন এক সময়ও আসিয়াছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না” (সুরা দাহর)। এই ধারণা ও অবস্থার কাছাকাছি অবস্থান করিয়া তিনি কয়েকটি মকতুব সেই স্থান হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু উক্ত আবাসগৃহ অত্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ ছিল বলিয়া সেখান হইতে তিনি অন্যস্থানে অবস্থান করার এরাদা করেন, যাহা “মোল্লা ভবন” নামে পরিচিত ছিল।

এই দ্বিতীয় আলয়ে পদার্পণ করিবার পূর্বেই হজরত মোজাদ্দের আলফে সানী র. বলিয়াছিলেন যে, এখানে এমন সব রহস্যপূর্ণ মারেফাতসমূহ পাওয়া যাইবে যাহার সম্পর্ক, ইনশাআল্লাহ, অমরত্বের পূর্ণতা (কামালতে বাকা) দ্বারা ভরপুর হইয়া থাকিবে। তাঁহার উক্তি মত পরে ঠিক সেই রকমই ঘটিয়াছিল।

বন্ধুগণের নিকট হইতে দোয়া এবং তাঁহাদের অদৃশ্য মনোযোগ প্রকাশিত হওয়ার প্রত্যাশায় আছি। ওয়াসসালাম।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪

রসুলে করিম স. এর প্রতি দরুদ, সালাম ও প্রশংসা জ্ঞাপনের পর জানাইতেছি যে, কেয়ামতের কাল ক্রমশঃ নিকটের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেই সঙ্গে এই জামানায় জুলুমের প্রাবল্যও বাড়িয়া উঠিতেছে। সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে এবং দিনে দিনে ক্রমশঃ আরও বেশী করিয়া অন্ধকারের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে। এখন এই রকম হিম্মতওয়ালা জোয়ান মরদের দরকার, যে এই ভয়াবহ বিপদসংকুল জামানায় সুন্নতকে পুনর্জীবিত করিতে এবং বেদাতকে ধ্বংস করিতে পারিবে। নবী করিম স. এর সুন্নতের আলো ব্যতীত সঠিক পথের দিশা পাওয়া অসম্ভব এবং নবুয়তের অধিকারী রসুল স. এর রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সাধনা ও অধ্যাবসায় ব্যতীত মুক্তির (নাজাতের) সন্ধান করা মিথ্যা কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সূফীগণের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ এবং অখণ্ড ভালবাসার জন্য মূল বস্তুর সন্ধান প্রাপ্তি, সেই সমস্ত-বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বন্ধুর (হাবীবে রব্বুল আলামীনের) আনুগত্য ব্যতীত কোনক্রমেই সত্য ও সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। আয়াত শরীফে বলা হইয়াছে, “বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসিতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, (তাহা হইলে) আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন” (সূরা আলে ইমরান)— আয়াত শরীফের এই উক্তি আমার উক্ত বর্ণনার প্রমাণ। যাবতীয় অভ্যাস, ইবাদত ও লেনদেনের পদ্ধতিসমূহে আঁ-হজরত স. এর সহিত সংযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার মধ্যেই নিজের সমস্ত সৌভাগ্য যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। বাস্তব জগতেও দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি

প্রিয়তমার পছন্দ ও খুশীর সহিত নিজের সাদৃশ্য ও আনন্দকে গঠন করিয়া তোলে, প্রিয়তমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি কতনা মধুর ও সুন্দর, কমলীয় ও মনোহররূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে।

প্রেমিকের বন্ধু ও তাহার প্রিয়ার নজরে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান হিসাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং প্রেমিক যাহাকে ঘৃণা করে প্রিয়ার দৃষ্টিতেও সে ঘৃণার পাত্র হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। বাহ্যিক এবং মৌলিক পরিপূর্ণতা কেবলমাত্র আঁ-হজরত স. এর ভালবাসার সহিত সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনুগত্য হইতেছে আওলিয়াগণের অনুসরণ করা এবং তাঁদের শত্রুগণের সহিত শত্রুতা করা।

কিন্তু সাহাবা কেরাম রা.-গণের সম্পর্কে এই কথা কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না যে, বরণ্য ও অভিজাত সাহাবাগণের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুদ্ধ হওয়া ব্যতীত হজরত আলী করিমুল্লাহ ওয়াজহুর বন্ধুত্ব লাভ করা যায় না। যাহারা এই ধরনের কথা চিন্তা করে, তাহা তাহাদের ভুল ধারণা। ভুল ধারণা এই জন্য যে, কাহারও প্রতি ক্ষুদ্ধ ও রাগান্বিত থাকার অর্থ হইতেছে তাহার সহিত শত্রুতার পূর্বলক্ষণ। আপনজনদের প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট বা ক্রোধান্বিত হইতে পারে না। যিনি সকল সুবিচার, প্রশংসা ও পবিত্রতার মালিক সেই মহান আল্লাহ্‌তায়াল্লা সাহাবা কেরামগণের মাহাত্ম্যকে ‘রুহামাউ বায়নাহুম’ অর্থাৎ “তাহারা পরস্পরের প্রতি দয়ালু” (সুরা ফাতাহ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ‘রহিম’ শব্দের বহুবচন হইতেছে ‘রুহামাউ’ যাহা কেবলমাত্র গুণবাচক অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইতেছে, এই সব বুজুর্গ সাহাবা কেরামগণ যেন পরস্পরের মধ্যে দয়ার পরিপূর্ণ আধার হিসাবে প্রশংসিত হইয়া থাকিতে পারেন। যেহেতু তাঁহাদের গুণাবলীর তুলনা কালের প্রবাহে চিরস্থায়িত্বের নিদর্শন, সেই জন্য ইহা জরুরি যে, দয়ার আধারস্বরূপ তাঁহাদের এই সমস্ত গুণাবলী যেন সঠিক নিয়মানুযায়ী চলমান কালের বুকে প্রবাহিত হয় এবং চিরস্থায়ী থাকে। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা শত্রুতা সব কিছুই দয়ার (রহমের) পরিপন্থী ও ঘোর বিরোধী, যাহার স্থায়িত্ব ও প্রবাহিত থাকার বিষয় তাঁহাদের (সাহাবাগণের) উপর প্রযোজ্য নয়। হাদিস শরীফে আছে, ‘আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক রহম (দয়া) করেন আবু বকর রা.।’ সুতরাং যে ব্যক্তি এই ধরনের দয়ালু (আরহাম), তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা কিভাবে উম্মতের জন্য সঠিক ও সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?



মিরযা আবিদ উল্লাহ্ বেগের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম
পয়গম্বরগণের নেতা মোহাম্মদ স. এর উপর, তাঁহার পরিবার পরিজন ও সাহাবী
সকলের উপর বর্ষিত হোক অনন্তধারায়। (আমিন)

বর্তমানকালে মানুষের মুখে মুখে সাধারণভাবে এই কথা শোনা যায় যে,
সুফীসাধকগণের ধর্ম ও নীতি হইতেছে, বিশ্বের বর্তমান অবস্থা ও হাল-হকীকতের
প্রতি যেন কোন রকম প্রতিবাদ বা বিরোধীতা না করা হয় এবং নিজেরা যেন
কাহারও নিকট মন্দ বলিয়া বিবেচিত না হয়। যেহেতু এই কথা প্রকৃত সত্যের
সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ইহা দ্বারা অনেক রকমের ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া বিবাদের
সূত্র হিসাবে নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে, সেই জন্য এই বিষয়ে কিছু
লিখিবার মনস্থ করিয়াছি, যাহাতে এইরূপ ধারণার অনিশ্চিন্তা ও কুপ্রভাবের বিষয়ে
সকলে অবগত হইতে পারে। এই সব সম্পর্কে লিখিবার সময় সেই সমস্ত হাদিসের
কথা বর্ণনা করিব- যাহা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, আল্লাহর জন্য
ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর পথে জেহাদের শ্রেষ্ঠত্ব,
মহামর্যাদাসম্পন্ন মুজাহিদগণ এবং ধর্মের জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রাণ
উৎসর্গকারী উচ্চমর্যাদাবাহী শহীদানদের বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে। সেই সঙ্গে
সম্মানিত সুফীগণের কিছু প্রসঙ্গেরও উল্লেখ থাকিবে। যাহা এই বিষয়ের সহিত
সঙ্গতিপূর্ণ এবং যদ্বারা তাঁহাদের (সুফীগণের) পথ শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে বলিয়া জানা যাইবে। কিছু কিছু লোক আছে, যাহারা সুফীগণের সহিত
নিজেদের সম্পর্ক ও যোগসূত্র বজায় রাখে কিন্তু শরীয়তের সীমানা হইতে বহুদূরে
সরিয়া যায়, তাহাদের সম্পর্কেও এখানে কিছু লিখিব এবং বন্ধুদিগকে আল্লাহ
সোবহানাহুর পক্ষ হইতে সুষ্ঠু তওফিকের বিষয় প্রেরণ করিব।

দেখ, যে ব্যক্তি নির্বোধের মত সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ
করাকে সুফীগণের পথ ও পন্থার পরিপন্থী বলিয়া মনে করে- জানি না সে ব্যক্তি
কোন শ্রেণীর সুফীগণের সম্পর্কে এই ধরনের কথাবার্তা বলে। আমাদের সম্মানিত

ও বুজর্গ পীর মোর্শেদ অর্থাৎ নকশ্বন্দিয়া তরিকার মাশায়েখগণের নীতি হইতেছে, সুন্নতের প্রতি নিজ আনুগত্য দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা এবং বেদাত বা সুন্নত বিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করা— যাহা উল্লিখিত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জ্ঞানী-গুণীগণের লিখিত কেতাব ও পুস্তিকাসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সৎ কাজের জন্য আদেশ ও অসৎ কাজের জন্য নিষেধ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা— এই সমস্ত তো হজরত মোস্তফা স. কর্তৃক নির্ধারিত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত। বরং বলা যায় যে, এইগুলি ওয়াজেব এমন কি ফরজের পর্যায়ভুক্ত। বিনা কারণে সৎ কাজের আদেশকে পরিহার করা যেন এই নকশ্বন্দিয়া তরিকার আমলসমূহকে অস্বীকার করারই সামিল। হজরত খাজা নকশ্বন্দ র. বলেন, আমাদের তরিকা হইতেছে অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এই তরিকা অনুযায়ী রসুলে করিম স. এর আনুগত্যের আঁচলকে শক্ত করিয়া ধরা এবং সাহাবা কেরাম (রাজিঃ)-গণের কাজকর্মের অনুসরণ করা খুবই জরুরি। এই আনুগত্য ও অনুসরণের পথে অতি অল্প আমলের মধ্যে অনেক কিছু লাভ করা যায়; পক্ষান্তরে যে এই কথা অমান্য করিবে বা ইহার প্রতি অসন্তোষের মনোভাব পোষণ করিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ভয়াবহ বিপদ। পূর্ব পুরুষগণের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় রীতি (তরিকা) ও সুফী মাশায়েখগণের অবস্থাসমূহ এই বিশ্বস্ত আমলের উপর অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চিন্তা করিয়া দেখ, সম্মানীয় সুফী সাধকগণ যে সমস্ত রীতিনীতি, সাধনা ও উপদেশের বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত বিবরণ ও বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন এবং ধ্বংসকারী ও রক্ষাকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে যে প্রমাণসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন— তাহা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী কুদ্দেসা সিররুহ নিজের পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা ওসমান হারুনী র. এর উপদেশবাণী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমার মোর্শেদ বলিতেন, “বন্ধুত্বের পথ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম। তোমার উচিত যে, আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে তুমি উপদেশ দিতে থাক এবং আল্লাহ্‌তায়ালার শান্তিকে ভয় করার জন্য মানুষকে বল।”

শায়েখ মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী কুদ্দেসা সিররুহ— যিনি একত্ববাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী অনুসারীবৃন্দের মধ্যে প্রধান ধর্মীয় নেতা ছিলেন— তাঁহার সমসাময়িক কালে যে সমস্ত সুফীগণ ধর্মে নাচ ও গানের (সামা ও রককাসী) পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি সেই সমস্ত কাজকর্মে বাধা প্রদান করিতেন এবং এ সমস্ত নাচ-গান বর্জন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার আদেশ মোতাবেক এ সব নাচ-গান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ উক্ত নাচ-গানের ধারা হইতে বিরত না থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের দোষ স্বীকার

করিয়াছিলেন। শায়েখ মহীউদ্দীন র. তাঁহার লিখিত কোন কোন পুস্তিকায় এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী র. তাঁহার একটি পুস্তিকায় সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সেই পুস্তিকায় লিখিয়াছেনঃ—

“যদি ইহা স্থির করা হয় যে, শক্তি সামর্থ্যহীন অবস্থায় অসৎ কাজে নিষেধ করা ওয়াজেব (কর্তব্য) নহে, তাহা হইলে এমন কোন সংকটাপন্ন সময়ে যখন তাহা নিজের জীবনের উপর আপতিত হওয়ার আশংকাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করিতে থাকে, তখন সেই অবস্থায় অসৎ কাজে নিষেধ করা আমাদের নিকট জায়েজ, নাকি তাও নয়? অবশ্যই তাহা তখন আমাদের নিকট জায়েজ (বেধ) এবং সর্বোত্তম—অবশ্য যাঁহারা তাহা (অসৎ কাজে নিষেধ) করেন না, তাঁহারা যদি দৃঢ় প্রত্যয়ী, সংযমী ও ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন তো স্বতন্ত্র কথা। অতএব, এই অসৎ কাজে নিষেধ করা আল্লাহর পথে জেহাদ করার সামিল—যাহা অবিশ্বাসী (কাফের)-গণের দলভুক্তদের সহিত জেহাদ করার মত। আল্লাহ্‌তায়ালার সুরা লোকমানের মধ্যে বলিয়াছেন, “সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং (ইহার পরিণতিতে) যে বিপদাপদ আসিবে তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য কর—নিঃসন্দেহে ইহা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।”

বিচার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সুফীগণের মধ্যে এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ দেশ-বিদেশে ধর্মীয় নেতা, পরিচালক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ যদি ভাল না হইত, তাহা হইলে ভাল কাজের নির্দেশ দানের জন্য কেন তাঁহারা এত বেশী গুরুত্ব প্রদান করিবেন?

হজরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ র. শ্রেষ্ঠ সুফীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি কোন বেদাতকারীর সহিত বন্ধুত্ব রাখিবে, আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার (ভাল) আমল বরবাদ করিয়া দিবেন এবং তাহার অন্তর (কলব) হইতে ঈমানের নূর উঠাইয়া লইবেন। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই আশা রাখি যে, কোন ব্যক্তি যদি বেদাতকারীর সহিত শত্রুতা রাখে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার যখন তাহা জানিতে পারেন, তখন সেই শত্রুতার কারণে নিঃসন্দেহে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন—এমন কি তাহার নেক আমলের পরিমাণ যতই কম থাকুক না কেন। হে বৎস, যখন তুমি কোন বেদাতীকে এক রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিবে, তখন তুমি তাহাকে পরিহার করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবে।”

খোদ রসুলেপাক স. এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া বেদাতকারীগণকে অভিশাপ (লানত) দিয়াছেন, “যদি কেহ কোন বেদাতের সৃষ্টি করে অথবা কোন

বেদাতীকে প্রশ্ন দেয়, তাহার উপর আল্লাহুতায়ালার, তাঁহার ফেরেশতাবৃন্দের এবং যাবতীয় মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হয়। এই ধরনের লোকের না কবুল হয় ফরজ, না গৃহীত হয় নফল।”

হাদিস শরীফে আছে, রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, “হে আয়েশা! ঐ সমস্ত লোক যাহারা দ্বীনের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহারা সকলেই ধর্মে পবিত্রতা সাধনের সহচর এবং লালসা ও কামনাবাসনার মিত্র। তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা করার সৌভাগ্যও হয় না। আমি তাহাদের হইতে মুক্ত এবং তাহারা আমা হইতে।”

সৎ কর্মে আহ্বান করাকে ত্যাগ করাই যদি সুফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইত তাহা হইলে অতিশয় উচ্চামর্যাদাধারী কোন এক সুফী কেন বলিয়াছেন, “সুফীগণের মধ্যে যেদিন সৎকার্যের জন্য আদেশ ও অসৎ কার্যের জন্য নিষেধজনিত কোন কাজ সম্পাদিত না হয়, বুঝিতে হইবে সেই দিনটি তাঁহাদের জন্য ভাল দিন নয়।” সুতরাং ইহার উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে বোঝা যাইতেছে যে, সুফীগণের যে দিনটি ঐ সমস্ত কাজ হইতে খালি থাকে, সেই দিনটি তাঁহাদের জন্য মঙ্গলের দিন নয়।

ঐ সমস্ত লোক যাহারা মন্দ কাজে প্রতিবাদ না করার এবং ভাল কাজে আদেশ না করার বিষয়ে বিশ্বাসী, তাহাদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখ, আখেরাতের সেই শাস্তি ও পুরস্কার এবং সেই কঠিন অঙ্গীকার, যাহাদের মন্দ কাজের জন্য কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জন্য তাহারা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কি না? যদি তাই হয়, তাহা হইলে সেই সব হতভাগ্য লোককে কেন ভয়াবহ ধ্বংসের পরিণাম হইতে পরিত্রাণের দিকে টানিয়া আনিবে না এবং কঠিন শাস্তি হইতে বাঁচানোর জন্য মুক্তির পথ দেখাইবে না? কোন অন্ধের চলার পথে যদি কোন কূপ বা সাপ পড়ে অথবা কোন ব্যক্তির জাগতিক কোন বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন তো লোকেরা তাহাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেও বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পথ বাহির করে এবং বিপদগ্রস্ত সেই ব্যক্তির দুরাবস্থার প্রতিবাদ করে।

হায়! আফসোস হয় আখেরাতের সেই বিপদের কথা চিন্তা করিয়া যাহা হইবে অত্যন্ত কঠিন ও চিরস্থায়ী। কিন্তু সে সম্পর্কে লোকদিগকে সতর্ক করা হয় না ও তাহাদিগকে মুক্তির পথ দেখান হয় না। যেন এই রকম মনে হয় যে, কিয়ামত, পুনরুত্থান, সেই দিনের আক্ষেপ ও অস্থিরতা এবং হাশরের ময়দানে যাহা কিছু হইবে সেই সব বিষয়ে তাহারা যেন আদৌ বিশ্বাস করে না। আল্লাহুতায়ালার যেন ঐ ধরনের মন্দ লোকদের খারাপ মতবাদ হইতে আমাদিগকে নিরাপদ রাখেন।

সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন বাধা না দেওয়াই যদি আল্লাহুতায়ালার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি আশ্বিয়াগণকে কোন উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন এবং দ্বীন

ইসলামে আমন্ত্রণের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মকে কেনই বা বাতিল করিয়াছেন? পূর্বে যে সমস্ত সম্প্রদায় আশিয়া আ.-গণের দাওয়াত কবুল করে নাই, সেক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিবিধ শাস্তির মধ্যে কেন আবদ্ধ করা হইবে? আর কেনই বা তাহাদের অনেককে সমূলে ধ্বংস করা হইয়াছে? তাহার পরিবর্তে, তাহা হইলে, ইহাই তো হওয়া উচিত ছিল যে, তাহাদিগকে তিনি (আল্লাহ) তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল খুশীর উপর ছাড়িয়া দিতেন।

জেহাদকে কি জন্য ফরজ করা হইয়াছে? কেননা ইহা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদিগকে উৎপীড়ন ও হত্যাকারীগণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিবে এবং সেই সঙ্গে কাফেরদিগকে কতল করার দুঃখ কষ্টও বরণ করিবে। মুজাহেদীন ও আল্লাহর রাস্তায় শহীদানগণের শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াতসমূহের অর্থ হইতে স্বতঃ প্রকাশিত এবং প্রমাণিত— কেন তাহার বর্ণনা তাহা হইলে করা হইয়াছে?

আল্লাহ্‌তায়ালার তাঁহার পরিপূর্ণ রহমত দ্বারা আশিয়া আলাইহিসুস সালামগণকে মৌলিক আদর্শের জন্য এবং আউলিয়াগণকে তাঁহাদের অনুসরণকারীরূপে ধর্মের দিকে আহ্বান করার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই তিনি (আল্লাহ) মানবসম্প্রদায়কে ভয়াবহ শাস্তি ও যথোচিত পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। এই ভাবেই তিনি ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণের উপর যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাদের মৌখিক ওজর-আপত্তিসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।— ‘যাহাতে রসুলগণের আগমনের পর লোকদের জন্য কোন ওজর-আপত্তি বাকী না থাকে’ (সুরা নেসা)। অতএব আঁ হজরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাক্ষা আনুগত্য— ধর্মের প্রতি আহ্বান ও সৎ কাজে আদেশ প্রদান করার অংশের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি সৎ কাজে আদেশ করার কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে প্রকৃতপক্ষে সে রসুলে করিম স. এর অনুগত নহে।

ন্যায়ের খাতিরে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, যদি পাপী ও অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর ঘৃণার পাত্র না হইত তাহা হইলে আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা ধর্মে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহা হইলে ইহা সর্বোত্তম নৈকট্য লাভ ও ঈমানে পরিপূর্ণতা অর্জনের বিষয় হইতে পারিত না এবং সেই সঙ্গে তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের (বেলায়েতের) ভিত্তি, তাঁহার সম্মতি (রেজা) অর্জনের কারণ ও তাঁহার নৈকট্যের জন্য প্রবেশাধিকার পাওয়ার উপায়ও হইতে পারিত না।

হজরত ওমর ইবনে আল জামুহ রা. হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আঁ-হজরত স.কে বলিতে শুনিয়াছেন, “বান্দা কখনও অকৃত্রিম ঈমানের অধিকারী হইতে পারে না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর জন্য শত্রুতা না করে। যাহার মধ্যে এই গুণ সঞ্চারিত

হইয়াছে যে, সে কেবল আল্লাহর জন্যই তাহার হৃদয়ের ভালবাসা পোষণ করে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করে, সে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়াছে। (আহমদ)।

হজরত আবু আমামা রা. হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আঁ-হজরত স. বলিয়াছেন, “যে কেহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা স্থাপন করিয়াছে ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করিয়াছে এবং আল্লাহর খাতিরে দান করিয়াছে ও আল্লাহর ওয়াস্তে নিষেধ করিয়াছে, তাহার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।” (আবু দাউদ)।

আসল কথা হইতেছে, প্রেমিকের প্রিয়জনদের সহিত ভালবাসা এবং দুশমনের প্রিয়জনদের সহিত শত্রুতার মধ্যে ভালবাসার প্রকৃত উপকরণ নিহিত রহিয়াছে। খাঁটি দরদী প্রেমিক, এই দুইটি বিষয়কে তাহার নিজের প্রিয় কাজ বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য সে কোন লাভ বা উপদেশের ধার ধারে না। প্রেমিকের প্রিয়জনদিগকে তাহার নিজের চোখে কতই না সুন্দর ও সম্মানীয় বলিয়া মনে হয়, অন্যদিকে শত্রুর আপনজনদিগকে কি বিশী ও কদাকার বলিয়া মনে হয়। এই ধরনের কার্যকলাপ অপ্রকৃত (অর্থাৎ আসল নয় এই ধরনের জাগতিক) ইশকের ক্ষেত্রেও প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ জানায়, তাহার মধ্যে বন্ধুর শত্রুগণের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ বন্ধুর সম্মুখে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহ্‌তায়ালার বলেন, “হজরত ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ্‌ আ. এর চরিত্রে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।”

অন্য একস্থানে আল্লাহ্‌তায়ালার বলেন, “নিশ্চয় রহিয়াছে তোমাদের জন্য তাঁহাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র।” এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, সত্য পথের প্রেমিকদের (তালেবে হকের) জন্য (যে সমস্ত লোক ক্রটির মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে) দুঃখ-কষ্ট পাওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক।

...একত্ববাদের অস্তিত্বে যে সমস্ত মহাত্মাগণ বিশ্বস্ত অবস্থায় রহিয়াছেন, দ্বীনের দৃঢ়তার জন্য তাঁহাদের ধর্মভীরুতা ও পূর্ণতা অর্জন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত—যাহা এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের হজরত (হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী রঃ) যিনি ওজু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নামাজ এবং নামাজের আদবসমূহের ব্যাপারে সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, তিনি বলিতেন, “আমি আমার পিতা হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ র. এর নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছি। কেবলমাত্র জানিয়া নিয়া এই সমস্ত বিষয়ে সফলতা অর্জন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।” আমার দাদা (হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ ফারুকী র.) একত্ববাদের অস্তিত্বে অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী। আমার দাদার সম্পর্কে ইহা

সুবিদিত যে, তিনি বলিতেন, “শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ও সাবধানতার বিষয় আমি আমার পীর ও মোর্শেদ হজরত শায়েখ রোকন উদ্দীন গাঙ্গুহী র. এর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি।” হজরত শায়েখ রোকন উদ্দীন র. আল্লাহর একত্ববাদের অস্তিত্বে অন্তহীন রহমতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণতার সহিত শরীয়তের অনুসরণ করিতেন। তিনি এই সাবধানতা নিজ পিতা ও মোর্শেদ হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. এর নিকট হইতে অর্জন করিয়াছিলেন (টীকা দ্রষ্টব্য) হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. আল্লাহুতায়ালার একত্ববাদের অস্তিত্বে এক দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় সেই পরম করুণাময়ের একত্ববাদের প্রভাবে ডুবিয়া থাকিতেন, তথাপি শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রতিপালনে এবং তৎসংক্রান্ত বাহ্যিক সাবধানতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পূর্ণতার প্রতীক।

হজরত খাজা আহরার র. যদিও একত্ববাদের অস্তিত্বের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন তবুও শরীয়ত প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পর্বতের মত অটল। তিনি বলিতেন, “আমি যদি পীরি-মুরিদী (পীর হিসাবে লোকদিগকে মুরিদ করার কাজ) করি, তাহা হইলে আমার জমানার অন্য কাহারও পক্ষে পীরি-মুরিদী করার সাহস হইবে না। কিন্তু আমাকে তো দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে, শুধু পীরি-মুরিদী করার জন্য নয়।’

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী হাদিস শরীফে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সনদের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ফেকাহ শাস্ত্রে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “কোন কোন দরবেশ “পরকালের হিসাব-নিকাশের পূর্বেই নিজ আমলসমূহের হিসাব কর”, এই আশুবাধ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের দিবারাত্রির আমলসমূহের হিসাব করিতেন। আর আমি নিজের জন্য তাহার সহিত আরও কিছু যোগ করিয়াছি, তাহা এই যে, আমলসমূহের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে আমি অনিষ্টকর বিষয়সমূহেরও হিসাব করি।

টীকাঃ জুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. সম্পর্কে তাঁহার মাত্রাতিরিক্ত মগ্ন অবস্থা এবং বহুদিকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সুন্নতের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য, সংযম ও সহনশীলতা, অধ্যাবসায় ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং দৃঢ়চেতা ও মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (পৃঃ ৯৭)। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনার শেষ দিকে, হজরত মোজাদ্দের আলফেসানী র. এর মৌখিক বর্ণনার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, হজরত শায়েখ যখন একবার দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শায়েখ হাজী আব্দুল ওহাব বোখারী র. (হজরত জালালুদ্দীন বোখারী র. এর পুত্র)– যিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন,– নিজের লেখা একখণ্ড তফসীর (মূল রচনার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ) পড়িয়া দেখার জন্য হজরত শায়েখের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুতুবে গাঙ্গুহী ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি

সুলতানুল আরেফীন সাইয়িদুত্ তাইফা হজরত জুনাইদ বাগদাদী র. যিনি একত্ববাদের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন থাকিয়া সেই অস্তিত্বকে আবিষ্কার করিতেন, তিনিও আপাদমস্তক শরীয়তের সাজে নিজেকে উত্তমরূপে সজ্জিত রাখিতেন।

সৎ কাজের আদেশকে ত্যাগ করাই যদি একত্ববাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসীগণের নীতি ও ধর্ম হইত, তাহা হইলে মাওলানা আব্দুর রহমান জামী র. যিনি একত্ববাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক বিরল দার্শনিক ছিলেন, তিনি কেন নিজ মসনবী ‘সিলসিলাতুল জাহাব’ (কাব্যগ্রন্থ সোনার শিকল) গ্রন্থে লোকদের ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিবেন, যাহারা সৎকাজের আদেশ পরিত্যাগ করার পক্ষে ছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত ও হাস্যকর ব্যাপার হইতেছে, যে সমস্ত লোক ধর্মের ব্যাপারে কম কষ্টকর এবং নীতির ব্যাপারে সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের মনোভাব পোষণ করে, তাহাদের সহিত ইহুদী, যোগী, ব্রাহ্মণ, জৈন, জিন্দিক (আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী) ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বেশ ভাল। তাহাদের সহিত তাহারা সদ্ভাব রাখে, উঠাবসা ও আমোদ-আহলাদ করে এবং ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু সুন্নত জামাতভুক্ত লোকজন, যাহারা আল্লাহুতায়ালার ক্ষমাপ্রাপ্তগণের শ্রেণীভুক্ত, তাহাদের সহিত বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক আচরণ করে। তাহাদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার অন্যান্যদের সঙ্গে ঠিকই থাকে, কিন্তু এই সঠিক ও সত্য জামাতের লোকজনের উপর তাহারা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে এবং তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রয়াস চালাইয়া যায়। সকলের সহিত সদ্ব্যবহার ও সৌহার্দ্যের কি সুন্দর নমুনা। হজরত মোহাম্মদ স. এর সঠিক অনুসারীগণের সঙ্গে শত্রুতা এবং তাহার বাহিরে অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব।

খুব ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, যদি মন্দ কাজে প্রতিবাদ পরিহার করাই প্রশংসনীয় হইত, তাহা হইলে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ধর্মের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হইত না। সেক্ষেত্রে আল্লাহুতায়ালার তাহা হইলে আদেশ ও বাধা প্রদানকারীদিগকে উত্তম উম্মত হিসাবে মর্যাদাসূচক পদবীতে ভূষিত করিতেন না, যেমন তিনি জানাইয়াছেন :

খুলিলে ঘটনাক্রমে যে আয়াত বাহির হইয়া আসে শায়েখ আব্দুল ওহাব র. সেখানে তাঁহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলেন, ‘নবী করিম স. এর আওলাদগণ সকলেই নিরাপদে গত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিণাম অবশ্যই শুভ হইবে’। হজরত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস কুদ্দিসা সিররুহ সেই লেখার একপ্রান্তে লিখিয়াছিলেন, “ইহা আহলে সুন্নত জামাতপন্থীদের বিশ্বাসের পরিপন্থী” – অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা সুন্নতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের (আহলে সুন্নত জামাতের) নীতি বিরুদ্ধ। ইহার পর তিনি গ্রন্থটি ফেরত দিলেন। দিল্লীর বিখ্যাত আলেম ওলামাগণ এই বিষয়ের উপর কয়েকদিন ধরিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া সেই কথাই সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলেন, যাহা হজরত শায়েখ গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররুহ তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন।

“তোমরা হইতেছ উত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।” (সুরা আল ইমরান)। আর এক জায়গায় এই সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, “ভাল কাজে আদেশ প্রদানকারী, মন্দকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহতায়ালার সীমারেখার রক্ষণাবেক্ষণকারী।” অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, “মোমেন পুরুষ এবং মোমেনা স্ত্রীলোকগণ (দ্বীনের কাজে) একে অপরের পরিপূরক—(তাহারা) ভাল কাজের হুকুম করে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে।”

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনগণ এবং বিগত মহৎ পুণ্যাত্মাগণ তাঁহাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের জন্য কতকিছুইনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সমস্ত সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা শুধুমাত্র এক নিরর্থক কাজের জন্য যদি হইত (নাউজ্জবিলাহ), তাহা হইলে আগাগোড়া সমস্ত কিছু তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে। মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা হইতে বিরত থাকা যদি প্রশংসাসূচক ভাল কাজ হইত, তাহা হইলে ইসলাম ধর্মের নীতি-পদ্ধতি (শরীয়ত) অস্বীকারকারীকে দেখার পর মনে মনে তাহাকে ঘৃণা বা অস্বীকার করা কেন সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমান বলিয়া বিবেচিত হইবে— যেমন হাদীস শরীফে আছেঃ “ইহা সর্বাপেক্ষা দুর্বল শ্রেণীর ঈমান।” যদি বলা হয় যে, এই আয়াত শরীফে “হে ইমানদারগণ, তোমাদের আপন আপন প্রবৃত্তিসমূহ (নফস) সম্পর্কে চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছ তখন কাহারও পথভ্রষ্ট হওয়া তোমাদের কোন ক্ষতির কারণ হইতে পারে না” (সুরা মায়দা)। আদেশ ও নিষেধ পরিত্যাগ করার বিষয়ই প্রমাণ করিতেছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভুল এইজন্য যে, “যখন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছ” এর মধ্যে সরল ও সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার কথাও আছে, যাহাতে সৎ কাজে আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কোরআন শরীফের ব্যাখ্যাদাতাগণ (মোফাসসেরীন) যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই আয়াত শরীফের অর্থ দাঁড়াইতেছে, যখন তোমরা পুণ্য কর্মের আদেশসমূহ পালন করিবে এবং সৎ কর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান করিবে, তখন অন্য লোকের পথভ্রষ্টতা তোমাদের আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার মাহাত্ম্য (শানে নজুল) দ্বারাও এই একই অর্থ প্রকাশিত, আর তাহা হইতেছে, কাফেরদের দিক হইতে মুসলমানগণের অন্তর যখন সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল তখন তাহাদের সাত্ত্বনা দিবার জন্য আল্লাহতায়ালার এই আয়াতের মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে, তোমরা যখন নিজেদের কাজ সম্পন্ন করিয়াছ, সঠিক পথের দিকে পথ-প্রদর্শকের কাজ করিয়াছ এবং অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়াছ, ইহার পর আর ঐ সমস্ত লোকের অবিশ্বাস তোমাদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হইতে পারিবে না। আর যে দল এই আয়াতশরীফের কেবল বাহ্যিক অর্থ সমর্থন করে, তাহারা মনে করে সৎ কর্মে আদেশ প্রদান করার বিষয়টি ইহাতে রহিত করা হইয়াছে।

হজরত আবু বকর স্দ্দীক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, “হে মানুষগণ, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু আলায়কুম আনফুসাকুম (হে ইমানদারগণ তোমাদের আপন আপন প্রবৃত্তিসমূহ (নফস) সম্পর্কে চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য’...)। আর আমি নিজে আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক জবান হইতে শুনিয়াছি, তিনি স. বলিয়াছেন, “মানুষ যখন অস্বীকারকারীদের কাণ্ডকারখানা অবলোকন করে এবং তাহা বিনষ্ট করার জন্য কোন চেষ্টা করে না, সেক্ষেত্রে অতি নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহুতায়ালার তাঁহার শাস্তি সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত করিয়া দেন।” (ইবনে মাজা ও তিরমিজী)।

যদি বলা হয় যে, সৎ কাজে আদেশ প্রদান করা এবং আল্লাহর জন্য জেহাদ করা (জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহ) নবীগণের পদ্ধতি (তিরিকা) এবং নিষেধ ও আদেশ পরিত্যাগ করা আওলিয়াগণের পদ্ধতি— যেমন আজকাল কোন কোন লোক এই ধরনের কথাবার্তা বলে— সেক্ষেত্রে আমার কথা হইতেছে, বর্ণিত বিষয়সমূহ আল্লাহুতায়ালার আদেশের বিষয় এবং তাহা প্রতিপালন করার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্বের ও পরিত্যাগ করার মধ্যে যে শাস্তির প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে কোরআন শরীফের সেই সমস্ত আয়াত দ্বারা যাহার অর্থ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত। আল্লাহর হুকুম, শাস্তির ওয়াদা, শাস্তির প্রতিজ্ঞা, মানবজাতির জন্যই পূর্ণ করা হইয়া থাকে। ইহাতে কাহারও কোন বিশেষত্ব থাকে না— খাস্ ও আম (বিশেষ ও সাধারণ), আমিয়া ও আউলিয়া সকলেই আল্লাহুতায়ালার হুকুম (ফরজ কাজ) সমূহ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সমান। তবে পরিত্রাণ (নাজাত) লাভ করার বিষয় যোগ্যতা ও পূর্ণতার ক্রম অনুযায়ী নবীগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আওলিয়াগণ যে পরিমাণ বেলায়েত, ভালবাসা, মারেফাত ও আল্লাহুতায়ালার নৈকট্যের অংশ পাইয়াছেন, তাহা নবীগণের মাধ্যমেই পাইয়াছেন। উদ্ধার প্রাপ্তির পথ কেবলমাত্র নবীগণের আনুগত্যের উপরে নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ থাকে।

‘(হে রসুল স.) আপনি বলিয়া দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহর সহিত মহব্বত (বন্ধুত্ব) করিতে চাও, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, (এই পুণ্য কর্মের বদৌলতে) আল্লাহুতায়ালার তোমাদের সহিত মহব্বত (বন্ধুত্ব) করিবেন।’ ইহা ব্যতীত আর যে সমস্ত পথ রহিয়াছে তাহা ভ্রষ্ট ও গোমরাহীর পথ এবং শয়তানের রাস্তা। কোরআন শরীফের আয়াত :

“সত্যের পরে গোমরাহী (ভ্রষ্টতা) ছাড়া আর কী আছে?” এবং অন্য আয়াত

“ইহা আমার সোজা রাস্তা, এই রাস্তায় চল”— এই দাবীর সপক্ষে সাক্ষীস্বরূপ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাবে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রেখা টানিয়া বলিলেন, “ইহা আল্লাহর রাস্তা”।

পুনরায় ইহার ডাইনে ও বামে কতিপয় রেখা টানিয়া বলিলেন, ‘এইগুলি শয়তানের দলের রাস্তা’ তাহার পর তিনি এই আয়াতশরীফ পাঠ করিলেন :

“ইহা আমার সোজা পথ, এই পথে চল ।” (আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী) ।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি আশিয়া আলাইহিমুস সালামের অধীনতা ব্যতীত সত্য পথে চলিতে চায়, সে কখনও সফলকাম হইতে পারে না । কেবলমাত্র পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া তাহার আর অন্য কিছু লাভ হইবে না । যদিবা কোন কিছু লাভ হয় তাহা নূতন ধরনের কিছু হইবে এবং আখেরাতে (পরকালে) তাহা সমূহ ক্ষতি ও শাস্তির কারণ হইবে ।

“যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য তরিকা (পদ্ধতি) অবলম্বন করিবে, তাহা কবুল করা হইবে না । আর এই ধরনের ব্যক্তি আখেরাতে (পরকালে) ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সামিল হইবে ।”

শত চেষ্টা হবে নিষ্ফল প্রয়াস
সত্য পথ খুঁজে পাবে নাক তুমি
যতক্ষণ না হে শাদী, মোস্তফার
পদধূলি নিতেছ সাদরে চুমি ।

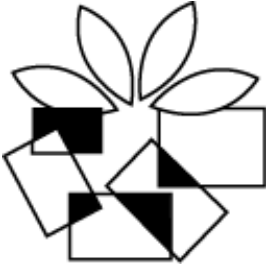
হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. যিনি সুফীগণের সর্দার ছিলেন তিনি বলিয়াছেন, যে কোরআন কণ্ঠস্থ (হেফস) করে নাই এবং হাদিসের কেতাব পাঠ করে নাই, আমাদের ধর্মের পথে অনুগামী (মুজাদী) হওয়ার মত যোগ্যতা তাহার নাই । কেননা, আমাদের তরিকার আদি-অন্ত সমস্ত কিছু কেতাব ও সুন্নত অনুযায়ী শৃঙ্খলিত ও সম্পর্কযুক্ত ।

হজরত খাজা আহরার র. হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেন, যদি সমস্ত ভাল অবস্থা ও উপকরণ আমাদেরকে প্রদান করা হয় এবং আমাদেরকে আহলে সুন্নত জামায়েতের ধর্মীয় বিশ্বাস (আকীদা)সমূহের সহিত যদি আলোকিত না করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাহাকে খারাপ ব্যতীত আর অন্য কিছু চিন্তা করিব না । অন্যদিকে আমাদের মধ্যে সমস্ত খারাপ যদি পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে কিন্তু আমাদেরকে যদি সুন্নত জামায়েতের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সহিত একীভূত করা হয়, তাহা হইলে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই ।

ভালভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন নবুয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রত্যাদেশের কাল (অহির জমানা) বিলুপ্ত হইয়াছে, দ্বীন পরিপূর্ণ হইয়াছে, নিয়ামত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে— সেক্ষেত্রে এমন কোন দলিল ও সনদের বলে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মীয় নির্দেশাবলীকে আজ বিচ্যুত করিয়া রাখা যাইতে পারে? আর নিজ কল্পনা ও খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করিয়া, নবীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী, যাহা নিশ্চতভাবে অহি ও আল্লাহর সংবাদবাহকের নিকট হইতে গৃহীত

হইয়াছে, কিভাবে তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নেওয়া যাইতে পারে? জ্ঞানের দূরদর্শীতাকে কাজে লাগাইতে হইবে যাহাতে কল্পনা ও স্বপ্নের ধোকায় পতিত হইতে না হয়। শয়তানের পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের সুন্নত— যাহা সহজ ও সরল পথের দিশারী— যেন কখনও হাতছাড়া না হয়। নবীগণই নিঃসন্দেহে ও নির্দিধায় পরিত্রাণের উপায় এবং প্রাচুর্যের উৎস। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ। আল্লাহপাক তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। নিশ্চিত পরিত্রাণের পথ পরিহার করিয়া বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করা, অভিশপ্ত শয়তানের পথে আবদ্ধ হওয়া এবং নিজেকে নিজে চির ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা— জ্ঞান বুদ্ধি বহির্ভূত উদ্ভট অযৌক্তিক ব্যাপার। যাহারা উন্মত্ততা বশতঃ কল্পনার বশবর্তী হইয়া পয়গম্বরগণের বিরোধীতাকে সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা—

“সমতল বালুকাময় ময়দানে মরীচিকার মত, যাহাকে (কাল্পনিক ঢেউয়ের মত মনে হওয়ার কারণে) তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি বলিয়া মনে করে”— ইহার অনুরূপ। যখন আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হইবে এবং কবর ও কিয়ামতের মনজিলসমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে, সেই সময়ে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুসরণ ব্যতীত আর কোন কিছুই ফলপ্রদ ও সহায়ক হইবে না। অবশ্য উন্নত অবস্থা (হাল) সমূহ, অন্তরের স্বচ্ছতা হইতে আগত দৃশ্যমান সত্য (কাশফ) ও অদৃশ্যলোক (গায়েব) হইতে প্রাপ্ত অভ্যাত বাণী (এলহাম)সমূহ নবীগণের আনুগত্যের মধ্যে থাকিয়া যদি জমা হইতে থাকে, তাহা আলোর উপরে আরও অধিক উজ্জ্বল আলোর বিকিরণে প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।



জনৈক মহিলার নিকট

লিখিত— মকতুব নং-৬

তুমি লিখিয়াছ যে, এমন অসম্মান ও দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাপন আর কখনও তুমি কর নাই, যেমন বর্তমানে করিতেছ।

কোন অসহায় বান্দা যখন নিজের মত আর একজন অসহায় বান্দার নিকট তোষামোদ, অনুনয় বিনয় ও প্রার্থনা করে, সেক্ষেত্রে দৃংখ ও অপমানজনক পরিস্থিতিতে পতিত হওয়াই তাহার পরিণাম হওয়া উচিত।

সেই অমুখাপেক্ষী ও প্রকৃত ধনীর দরবারে অনুনয়-বিনয় সহকারে কান্নাকাটি ও প্রার্থনা কর না কেন? প্রকৃতপক্ষে সেই সুমহান সত্তার একক অস্তিত্বই তো সকল যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী; যাঁহার নিকট অনুনয় বিনয় ও প্রার্থনা করা যায়। কেবলমাত্র তাঁহার দয়াতেই সকল অসুবিধা ও বিপদ আপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং তিনি ব্যতীত আর কেহ এই যোগ্যতার অধিকারী নয়। রিজিকের (আহার-সামগ্রীর) প্রসারতা ও সংকীর্ণতাও তো তাঁহারই নিকট হইতে আসে, অন্য কাহারও নিকট হইতে নয়—

“যদি আল্লাহ্‌তায়াল্লা তোমাকে কোন অসুবিধার মধ্যে রাখেন সেক্ষেত্রে এমন কেহ নাই যে তাহা দূরীভূত করিতে পারে, কেবলমাত্র তিনি ব্যতীত। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করিতে চান সেক্ষেত্রে তাঁহার অনুগ্রহকে ফিরাইয়া দেওয়ার মত কেহ নাই এবং এই মঙ্গল তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা দান করেন।”



হাজী মোহাম্মদ আফগানের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৭

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম— শুরু করিতেছি মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও দয়াবান। যে পত্রখানি তুমি পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি নিজের জন্য এবং তোমার মুরিদদের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগ (তাওয়াজ্জাহ) প্রদান করার ব্যাপারে আবেদন জানাইয়াছ। মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য আধ্যাত্মিক মনোযোগ প্রদান করা হইয়া থাকে। ইনশাআল্লাহ তায়াল্লা, ভবিষ্যতে আরও বেশী করিয়া তাহা করা হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এতটুকু জানিয়া রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, আধ্যাত্মিক স্তরসমূহে পরিভ্রমণের কাজ একান্তভাবে আল্লাহর সহিত মৌলিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে সংযুক্ত— অন্য কথায় যাহাকে ভালবাসার বন্ধন, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। নিজ মোর্শেদের (পীরের) সহিত মুরিদগণের এই সম্বন্ধ যত বেশী মজবুত হয়, শায়েখের অর্থাৎ মোর্শেদের বাতেন (অভ্যন্তর) হইতে ফয়েজ ও বরকতের (সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের) পরিমাণও তত বেশী পাওয়া যায়। একজন কামেল কুতুবের (দরবেশের) বাতেন হইতে সৌভাগ্য আদায় করিয়া লওয়ার জন্য নিখাদ ভালবাসা

ও মৌলিক সম্বন্ধই যথেষ্ট— সেখানে যদি তাওয়াজ্জাহর কোন উপস্থিতি না-ও থাকে। অন্তরের ভালবাসা ও মৌলিক সম্পর্কের অবর্তমানে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ মনোযোগ দ্বারা খুব কমই ফল পাওয়া যায়। তাওয়াজ্জাহর কার্যকারিতার জন্য উপযুক্ত স্থানের দরকার হয়। অবশ্য ওই ধরনের তাওয়াজ্জাহ যদি পূর্ব বর্ণিত মৌলিক সম্বন্ধের সহিত যুক্ত হয়, তাহা আলোর উপরে আরও অধিক আলোকময় হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধ স্থাপনের সামর্থ্য ও পয়গম্বর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনুতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই হইতেছে একমাত্র শর্ত এবং ইহার উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে। এই দুইটি বিষয়ের উপর যদি কোন ব্যক্তির দৃঢ়তা ও পরিপক্ব ধারণা থাকে তাহা হইলে তাহার আর কোন চিন্তা নাই। তাহার পরিণাম কখনও নিষ্ফল হইবে না এবং ঐ ব্যক্তি অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত পূর্ণতার প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। আর যদি ঐ দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে যত আধ্যাত্মিক সাধনাই করুক না কেন, সে ভয়ানক ক্ষতি ও বিপদের মধ্যে থাকিয়া যায়। ওয়াস্‌সালাম।



হাফেজ আব্দুল করিমের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৮

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহীল্লাজী নাস্তুফা— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।

পৃথিবীতে এই জীবনের চাহিদা অনুভূতি ও গতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। অন্য জীবন যাহা মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের (বরযখের) সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা গতিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র অনুভূতিসম্পন্ন। আল্লাহ্‌তায়ালার একচ্ছত্র জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই সমস্ত স্থান ও কালের উপযোগী জীবন (হায়াত) দান করিয়াছেন— এই মধ্যবর্তী অবকাশকালীন সময়ে অনুভূতি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই, যাহার দ্বারা শান্তি ও শান্তি হইতে পারে— সেখানে গতির কোন প্রয়োজনই নাই। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক উত্তরকালে— উভয় স্থানে দুইটি জিনিসেরই (অনুভূতি ও গতি) প্রয়োজন আছে। ইহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ। ওয়াস্‌সালাম।



মোহাম্মদ ওফার নিকট
লিখিত। মকতুব নং- ৯

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন আ'লা ইবাদিহীল্লাজী নাস্তাফা- সমস্ত প্রশংসাইতো আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক দরুদ ও সালাম। তোমার পত্র, যাহা প্রেমের সুখ সংবাদে পরিপূর্ণ ছিল, পাইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিয়া উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি এইভাবে নিজের বিভিন্ন অবস্থার কথা লিখিতে থাকিবে, কারণ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অদৃশ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হইয়া থাকে। দারিদ্র ও উপবাসের কারণে অন্তর কখনও সংকীর্ণ হইতে পারে না। জীবিকার স্বল্পতাহেতু মনকে ছোট করিও না।

“আল্লাহুতায়াল্লা যাহাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করিয়া দেন এবং তিনিই জীবিকা সংকীর্ণ করেন।” আল্লাহর সন্ধানে ব্যাপ্ত প্রেমিকগণের উচিত, তাহারা যেন প্রভুর সকল কাজে আনন্দিত ও সম্ভুষ্ট থাকে- এমনকি সেইসব কাজের তৃপ্তিদায়ক আনন্দও যেন গ্রহণ করিতে পারে। যাহা কিছু সেই অনন্তলোকের প্রেমিকের পক্ষ হইতে আসে তাহার সবকিছুই প্রেমময় হইয়া থাকে- তাহা তিরস্কার কিংবা পুরস্কার অথবা অনুকম্পা কিংবা যত্নগা যাহাই হউক না কেন।

বিষের শরবত না তিক্ত মদ কিছু নাহি জানি

এই তো অমৃত সুধা দিয়েছে প্রেয়সী যাহা আনি

বাহ্যিক অভাব অনটনের সময় তো কায়দা কৌশল অনুযায়ী চেষ্টাচরিত্র করা হয়, মৌলিক বিজয়ের জন্য তাহা আরও বেশী করিয়া করা উচিত, এইজন্য যে, বাহিরের দুঃখকষ্ট ভিতরের প্রশান্তির কারণ হইয়া থাকে। বাহিরের সংকীর্ণতা অন্তরের উপস্থিতিকে কীভাবে বিশৃঙ্খল করিতে পারে? যে বিস্ময়কর অবস্থাসমূহ, সংকীর্ণতার পূর্বে, সুসময়ে প্রকাশিত হইতে থাকিত, তাহা সংকীর্ণতার সময় কেন প্রকাশিত হইবে না? সংকীর্ণতা কি কোন বিপদ নাকি? তাহা হইলে কি কেবল আরাম ও সুখের কালে মওলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকিবে এবং অভাব অনটনের সময়ে সে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। বরঞ্চ

অভাব অনটনের সময়ে বাহিরে ও ভিতরে সম্পূর্ণরূপে হকতায়ালার প্রতি আন্তরিকতার সহিত নিবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাকে পাওয়ার পথ হইতে যেন কখনও প্রত্যাবর্তন না ঘটে।

তুমি নিজের সম্পর্কে কত সুন্দর অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছ। যদি পবিত্রতা অর্জনের যোগ্যতাকে ধূলিস্মাৎ করিয়া দিয়া এবং মনিমুক্তাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ মৃৎপাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হও, তাহা হইলে সত্যিই তাহা পরিতাপের কথা। “অবশেষে আফসোস তাহার জন্য, যে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহারই জন্য দুঃখ ও পরিতাপ যে অন্যায় করে এবং সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, আল্লাহর হক পালন করার প্রতি।”

মনে রাখিও, পার্থিব জগতে বিত্ত বৈভবের অভাব (পরকালে) হিসাব সহজ হওয়ার কারণ হয়। তুমি জীবিকার অভাব অনটন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ফজর নামাজের পর নির্ধারিত কিছু আয়াতশরীফ পাঠ করিবার অনুমতি চাহিয়াছ। এই অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের ব্যাপারে তোমার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তাহা হইলে আর অসুবিধা কিসের, পড়িতে পার।



মোহাম্মদ সাদেকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১০

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, অগণিত দরুদ ও সালাম সমস্ত পয়গাম্বরগণের নেতা (সাইয়্যিদুল মুরসালীন) মোহাম্মদ স., তাহার পরিবার পরিজন ও সাহাবী সকলের উপর বর্ষিত হউক অনন্তকাল ব্যাপী।

সেই চিরন্তন সত্য ও পরম করুণাময় আল্লাহুতায়ালার বান্দা (দাস) গণকে সহজ সরল পথে চলার জন্য উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন সকল প্রকার হীনতা ও সংকীর্ণতাকে তাহাদের অন্তর (সিনা) হইতে দূর করিয়া দেয় এবং কোন ধরনের সংকীর্ণতা ও নীচতা যেন কোন দিক হইতে তাহাদের অন্তরে কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার মাধ্যমে যেন তাহাদের সবকিছু সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে। আল্লাহুতায়ালার ইচ্ছার অনুকূলে বান্দার সম্মতি একীভূত হইয়া যেন তাঁহার অধীনে ন্যস্ত থাকে। নিজেকে

এমনভাবে তাঁহার অধীনে ন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত পৃথিবীও যদি কোন বান্দার প্রতি বিমুখ হইয়া যায় কিংবা সে যদি কোন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও পতিত হয়, তবু তাহার মধ্যে যেন কোন অসন্তোষের সৃষ্টি না হয় এবং এইসব বিষয়কে যেন সে মূল্যবান ও পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করে। সাময়িকভাবে আপতিত এই সমস্ত অবস্থাকে সে যেন খুশীর সহিত গ্রহণ করে, এমনকি যে সমস্ত বিপদ আপদের সম্মুখীন তাকে হইতে হয়, সেগুলিকেও যেন সে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের (নিয়ামতের) অংশ হিসাবে গণ্য করে এবং তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যখন আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি (আরিফ কামিল) এই মহৎ কারামত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া যায় তখন আল্লাহ্‌তায়ালার হেদায়েত দ্বারা সত্যপথ প্রাপ্ত হয়। (সিরাতে মুসতাকীম) ও তদসংক্রান্ত মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা এই সত্য পথ প্রাপ্তির পরিচায়ক। আল্লাহ্‌তায়ালার বলিয়াছেন :

‘আল্লাহ্‌তায়ালার কাহাকেও সত্য পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে ইসলামের জন্য তিনি তাহার হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ যেন আকাশে আরোহণের মত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।’ ওয়াসসালাম।

— সুরা আন্‌ আ’ম



মীর মোহাম্মদ খাফীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং- ১১

অন্তর হইতেছে সেই মহান মালিক আল্লাহ জাল্লা শানুল্লর দৃষ্টিপাতের স্থান। মনকে সদাসর্বদা পবিত্র রাখা দরকার। আল্লাহপাকের অবলোকন স্থল অন্তরকে সৃষ্টিসমূহের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী ও সুশোভিত সৌন্দর্যসমূহের পরিপূর্ণ আশ্বাদ গ্রহণ করা হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। অন্তরের পবিত্রতা আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ করার (জিকিরের) সহিত সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং তাঁহার স্মরণ ও চিন্তাভাবনার মধ্যে নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখিবে আর অন্তর্নিহিত সবককে (পাঠকে) অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান বলিয়া জানিবে। প্রকৃত অস্তিত্বহীনতার গুণে গুণান্বিত

হইয়া আল্লাহর প্রতি অটল আন্তরিক মনোযোগ (তাওয়াজ্জাহ) প্রদানকে সুখদ ও তৃপ্তিদায়ক অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিবে। আর সেই সুমহান সমুচ্চ রাজাধিরাজের দরবারের সহিত নিজের সুদৃঢ় সম্পর্ককে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হিসাবে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

নিখাদ প্রেমের বৃত্তে আছে শুধু
আল্লাহর ভালবাসা,
তাহার বাহিরে আছে যাহা কিছু আর
যদি হয় তাহা মধুমাখা-তথাপি লালসা
এবং অনিষ্টের সমূহ কারণ
আর ক্ষতির আধার।



শায়েখ আসাদউল্লাহ্ আফগানীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১২

(এই মকতুবে আটটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, যাহার মধ্যে কেবলমাত্র তিন নম্বর প্রশ্নের জবাব উর্দুতে অনুবাদ করা হইয়াছে)।

তুমি জানিতে চাহিয়াছ যে, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড (কারামত) উত্তম নাকি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করা উত্তম? যদি পরিচিতি লাভ করা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে পাপী ও দুশ্চরিত্র (ফাসেক ও ফাজের) শ্রেণীর মানুষও কোন কোন সময়ে পরিচিতি বিষয়ক কথাবর্তা বলে, কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না।

ইহার জবাবে জানান হইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচিতি কারামত বা অলৌকিক কার্যকলাপ ও সৃষ্ট বস্তুসমূহ সম্পর্কে অন্তরে প্রকাশিত অদৃশ্যের প্রকাশ (গায়েবী কাশফ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেন? তাহা এই কারণে যে, পরিচিতি হইতেছে আল্লাহ্‌তায়ালার অভিন্ন ও মৌলিক সত্তার রহস্য এবং স্রষ্টার গুণাবলীর প্রকাশ, পক্ষান্তরে কারামত হইতেছে সৃষ্ট জীব বা বস্তুসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রকাশ। এখন ভাবিয়া দেখ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যতখানি প্রভেদ বিরাজমান, পরিচিতি ও কারামত বা অলৌকিকতার মধ্যেও ঠিক ততখানি প্রভেদ বিদ্যমান। প্রথমটি অর্থাৎ পরিচিতি সংক্রান্ত বিষয় খোদ স্রষ্টার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কারামতের সম্পর্ক শুধু সৃষ্ট বস্তুর সহিত। ইহা ছাড়াও সঠিক পরিচিতি প্রাপ্তির জ্ঞান পরিপূর্ণ ইমানের অন্তর্ভুক্ত ও বলিষ্ঠ ইমানের ভিত্তিস্বরূপ—কিন্তু অলৌকিকতা বা কারামতের সে ক্ষমতা নাই এবং কোন পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষের সহিত কারামতের কোন সম্পর্ক নাই।

অবশ্য আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সফলতার অধিকারী কোন কোন কামেল ব্যক্তিত্ব, অলৌকিক ক্ষমতা বা কারামতেরও অধিকারী হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব থাকে আল্লাহর সেই পরিচিতি অর্জনের দিকে, যাহার মূল ভিত্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কারামত বা কাশফের মাধ্যমে উদঘাটিত অলৌকিক কোনকিছুর প্রতি তাঁহাদের কোন বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। কারামত যদি আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচিতি অর্জন করা অপেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে ফকির দরবেশগণের তুলনায় (আল্লাহর পরিচিতি সম্পর্কে যাঁহাদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়, যাঁহারা জনসমক্ষে কারামত প্রকাশের দিকে কোন মনোযোগ প্রদান করেন না, সেইসঙ্গে কাশফের মাধ্যমে সৃষ্ট জগতের সত্য বা রহস্য উদঘাটনের প্রতি মনোযোগী হওয়াকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার তুলনায় যাঁহারা নিজেদের পতন ও পদস্থলন বলিয়া মনে করেন) যোগী ও ব্রাহ্মণগণ (যাহারা যোগসাধনার বলে কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ প্রকাশে সক্ষম) উৎকৃষ্ট হইত। তুমি অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে এক আশ্চর্য প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ—মনে রাখিও, অলৌকিকতা বা কারামত কখনও এলাহীর (আল্লাহ্‌তায়ালার) নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে কোন দলিল বা প্রমাণ হইতে পারে না। কারামত বা এই জাতীয় কোন কর্ম বাতিল সম্প্রদায়ও অর্জন করিতে পারে—যাহার সম্পর্ক কেবল কঠোর পরিশ্রম, ক্ষুধা ও যোগসাধনার সহিত—নৈকট্য ও মারেফত বা আল্লাহ পরিচিতির সহিত তাহার আবার সম্পর্ক কি? যাহারা অলৌকিকতা বা কারামতের অনুসন্ধানকারী হইয়া থাকে তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুর অনুসন্ধান লিপ্ত ও আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং আল্লাহপাকের পরিচিতি (মারেফত) ও তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়।

ধোঁকাবাজ শয়তান জানে শত শত ভেঙ্কিবাজী
অভিশপ্ত ইবলিস জানে বিভ্রান্তির কারামত—
বাসগৃহে বেড়ে উঠে বহুবিধ আগাছা জঞ্জাল
মানব মনেও জন্মে তেমনি কত আগাছা বেদাত—
তাই বলে কারামত দেখালে যে হবে খোদাভক্ত
এমন বিশ্বাস নহে তার আলামত কিংবা সত্য।
খাঁটি কারামত আছে আল্লাহর এবাদত মাঝে
নিজেকে বিলীন করে সত্যপথে থেকে সব কাজে।
বাকী সব প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার আশ্রয়ে লালিত
লালসার সীমাহীন প্রলোভনে মোহ-আচ্ছাদিত।

মানুষ যখন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে তখন সে অস্তিত্বহীনতা ও সত্তার বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ হয়। এবাদত ও আনুগত্য, আধ্যাত্মিক পথে পরিভ্রমণ ও তজ্জনিত সমস্ত পরিশ্রম ও সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতেছে যে, মানুষ যেন তাহার অস্তিত্ব হীনতা ও সত্তার লয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। সেইসঙ্গে ইহাও যেন জানা থাকে যে, অস্তিত্ব তাহার সকল উপাদানের সঙ্গে আসলে চিরস্থায়ীত্বের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

যখন কেহ মনে করে যে, কারামত প্রকাশের মাধ্যমে সে জনসাধারণকে তাহার অনুসারী করিয়া লইবে, নিঃসন্দেহে তাহার জন্য তাহা আত্মগর্ব ও অহংকার হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই ধরনের ব্যক্তি বেদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অমনোযোগী ও অকৃতকার্য থাকিয়া যাইবে এবং তাহার জন্য মারেফতের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের কাহারও ক্ষেত্রে যেন কখনও এইরূপ না হয় সেজন্য আমরা আল্লাহুতায়ালার নিকট পানাহ্ (আশ্রয়) প্রার্থনা করিতেছি।

শাইখুল ইসলাম হরবী কুদ্দিসা সিররুল্লহ বলিয়াছেন, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও জনাবে কুদ্দুস (আল্লাহুতায়ালার) সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে দুনিয়াদারীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। আকৃতিগত আত্মিক দর্শন (কাশফে সুর) ও গায়েবের (অদৃশ্যের) খবরাখবর তাহাদের নিকট খুব প্রিয়। আকৃতিগত আত্মিকদর্শনধারীদিগকে তাহারা অলিআল্লাহ ও ঘনিষ্ঠ আপনজন বলিয়া বিবেচনা করে এবং মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পরিচিতির প্রকৃত সত্য যাঁহাদের আধ্যাত্মিকদর্শন দ্বারা উদঘাটিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রতি উহার বিমুখ ও বিরূপ থাকে। যাঁহারা সত্যের বাহক হইয়া চিরকালীন সত্যের পক্ষ হইতে যে সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন, তাহারা তাহা বিশ্বাস করে না অথবা ঐ সকল সংবাদের উপর কোন ভরসা রাখে না। উপরন্তু ইহার বিরোধিতা করিয়া তাহারা বলিয়া থাকে, সত্যি সত্যি তাহারা যদি সত্যের বাহক হইত, তাহা হইলে এই সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে কেন তাহারা খবরাখবর প্রদান করে না এবং তাহারা যখন বিশ্ব সংসারের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে সত্য উদঘাটনের ব্যাপারে সক্ষম নয়, সেক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা উচ্চ মার্গের আত্মিক দর্শন ও মূল সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তাহারা কেমন করিয়া ক্ষমতাশালী হইতে পারে এবং তদপেক্ষা উচ্চাসনে থাকিয়া কীভাবে আল্লাহর মারেফত (পরিচিতি) সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে?

এই সমস্ত অজ্ঞ ও মূর্খের দল বোঝে না যে, এই ধরনের মহান সত্যের বাহকগণের ক্ষেত্রে আল্লাহুতায়ালার তাঁহাদের পরিচালনার জন্য যে বন্দোবস্ত এবং সূক্ষ্ম ও গভীর মর্যাদাবোধ রাখিয়াছেন, তাহার কারণে (সত্যের বাহকদের) পার্থিব সৃষ্টির ব্যাপারে (কাশফের মাধ্যমে) কোন অদৃশ্য সত্য উদঘাটিত বা রহস্য প্রকাশের পিছনে লাগিয়া থাকার মত কোন সুযোগ তাঁহাদের ঘটে না এবং আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি বাসনার কল্পনাও তাঁহারা করেন না। জাগতিক অবস্থাসমূহের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহা প্রকাশের প্রতি আসক্ত থাকিলে, উচ্চ মরতবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা অর্জিত হইতে পারে না। সত্যের বাহকগণ যেমন জাগতিক ব্যাপারে উপযুক্ত নহেন, তেমনি কেবল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীগণও সত্যের জন্য উপযুক্ত নহে। কিন্তু সত্যের বাহক হিসাবে যাঁহারা উপযুক্ত যোগ্যতার অধিকারী তাঁহারা যদি আকৃতিগত আত্মিক দর্শনের প্রতি সামান্যতম মনোযোগও প্রদান করেন, তাহা হইলে অন্য যেকোন জন অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইতে পারেন। যেহেতু বাহ্যিক ধোপ-দুরস্তি ও সাধনাকারীগণের যে কোন বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট মূল্যহীন, সেইজন্য বিভ্রান্ত মুসলমান, ইহুদী, নাসারা ও অন্যান্যগণ এই কাজে মিলিত হয়। আল্লাহুওয়ালা ব্যক্তিগণের নিকট ইহার কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব নাই। (এই পর্যন্ত শাইখুল ইসলাম হরবী র. এর বাণীর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হইয়াছে।)

তবে হ্যাঁ, কোন কোন আউলিয়াকে ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতার গুরুত্ব অনুযায়ী গুণ্ড রহস্যাবলী উন্মোচনের কারামত প্রকাশের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে, কারামতের সহিত আল্লাহর জ্ঞান ও পরিচিতির সম্পর্ক হিসাবে তুমি কি এমন ধারণা করিয়া রাখিয়াছ যে এই ধরনের অবান্তর অর্থহীন প্রশ্ন করিয়াছ? আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে কোন অযোগ্য ব্যক্তি কিছু বলিলেও তো তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের মাহাত্ম্যে কোন ক্ষতি সাধিত হইবে না। ইহা এই ধরনের কোন ঘটনার মত যেমন, কেহ যদি বহু মূল্যবান মনিমুক্তা ভক্ষণ করিয়া নিজেই নিজের পীড়াদায়ক অবস্থার শিকারে পতিত হয়, তাহাতে সেই মূল্যবান মনিমুক্তার কোন বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না কিংবা তাহার রূপ ও মূল্য কমিয়া যায় না। সুতরাং এই সম্পর্কে বলা ও লেখা খণ্ডিত হইয়া গেল যে, আল্লাহর পরিচিতি সম্পর্কে চরিত্রহীন লোকেরাও তো বর্ণনা করিতে পারে, যাহা কারামত বা অলৌকিকতার ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

এইসঙ্গে আমি আরও বলিতেছি যে, এই বিষয়টি একটি সাধারণ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। কারামতের মধ্যেও হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) অনুসারী রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা সঙ্গত নহে যে কারামত এই ধরনের নহে। এই প্রসঙ্গে আমি আরও জানাইতেছি যে, আল্লাহর পরিচয় ও রহস্যাবৃত দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে, কাশফের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে— যাহার জন্য দরবেশ সাধকগণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। যদি কোন ভণ্ড, প্রকৃত আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থার যোগ্যতা বলে নয়, কেবল উহার অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বর্ণনা করে, সেক্ষেত্রে তাহা এই আলোচ্য বিষয়ের গণ্ডিবহির্ভূত বলিয়া

বিবেচিত হইবে। যদি বলা হয় যে, অনেক প্রতারক তাহার আধ্যাত্মিক দর্শন (কাশফ) ও অবস্থাকে আল্লাহর পরিচিতি (মারেফাত) বলিয়া নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহার জবাবে বলিতেছি, কোথায় হইতে কীভাবে জানা গিয়াছে যে, যে সমস্ত মারেফাতের কথা মিথ্যাবাদীরা বর্ণনা করে সেইগুলিই আল্লাহর পরিচিতি বা মারেফাত?

শয়তানের দুরভিসন্ধিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড তোমার আমার বোধগম্য সীমানার অনেক বাহিরে থাকে। শয়তানের কাজ-কর্মের ব্যাপারে একজন আর কতটুকুই বা বুঝিতে পারে যে, শয়তান কোন কোন পথ ধরিয়া লোকজনের নিকট আসিয়া হাজির হয় এবং নানা ছল চাতুরির মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্যের সহিত যুক্ত করিয়া মানুষের নিকট পেশ করে এবং যাহা সত্য নয় তাহাকে সত্য বলিয়া প্রকাশিত করে।



মোহাম্মদ মুকীম কাসুরী
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৩

বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সালামুন আ'লা রাসুলাল্লাহ- শুরু করিতেছি আল্লাহর নামে, সালাম জানাইতেছি আল্লাহর রসুলের প্রতি।

তোমার পত্র পাইয়াছি, যাহা আমাকে সন্তুষ্ট করার সঙ্গে সময়কেও আনন্দিত করিয়াছে। আশা করি বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই নগণ্য ফকিরকে মাঝে মাঝে এইভাবে স্মরণ করিবে। আরবী ও ফারসীতে লেখা যে কবিতাগুলি তুমি পাঠাইয়াছ তাহা আমি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সেগুলি খুব সুন্দর এবং উচ্চ শ্রেণীর কবিতার মত হইয়াছে। তোমার এই বিশেষত্ব সম্পর্কে পূর্বে আমার জানা ছিল না। আল্লাহ তোমার এই জ্ঞানের উৎকর্ষতাকে যেন আরও বাড়াইয়া দেন।

বল, হে আমার প্রতিপালক (রব) আমাকে অধিক জ্ঞান (ইলম) দান কর।' (আল কোরআন)।

কিন্তু কবিতার মধ্যে আরবী ভাষার রীতিনীতি ও শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। যে পর্যন্ত না সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিতেছে সে পর্যন্ত আরবীতে কবিতা লেখা কী জরুরী বলিয়া মনে কর?

দেখ, কবিতাই হোক বা ঐ ধরনের ‘বাহ্যিক উৎকর্ষতা বিশিষ্ট’ অন্য কিছুই হোক তাহা যতই উচ্চস্তরে উপনীত হোকনা কেন, বাহ্যিক আকার-আকৃতির মধ্যেই তাহার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ থাকিবে- ভিতরের আসল তাৎপর্যের কাছে এই ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের কোন সমাদর নাই।

যতই সাজাও তুমি শব্দের চাতুর্য
ও চৌকষ পংক্তিমালা কবিতার দেহে
নিহিত ভাবার্থ ও মৌলিক তাৎপর্য
ছাড়া মূল্যহীন হবে তাহা নিঃসন্দেহে।

চেষ্টা কর, যাহাতে প্রকৃত তাৎপর্য পুরাপুরিভাবে আহরণ করিতে পার। প্রকৃত তাৎপর্য অর্জন করার পর শব্দসমূহের মধ্যে মশগুল থাকিলে আর কোন ক্ষতির কারণ থাকে না।

ধর্মভীরু মুক্তপ্রাণ মহৎ সজ্জন
তাহাদের কর্মধারা করছে গ্রহণ।

কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে শব্দাবলীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়া অন্তঃসারশূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবল শব্দ ও শ্রুতি দ্বারা কোন কাজের কাজ হয় না।



জান্না বেগমের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১৪

আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ-কর্ম কখনও দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতা হইতে শূন্য থাকে না। সেই চিরসুন্দর অধিপতির নিকট হইতে যাহা কিছু আসে, সবই মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক।

বিষের শরবত না তিক্ত মদ কিছু নাহি জানি।
এইতো অমৃত-সুধা দিয়েছে প্রেয়সী যাহা আনি।

বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট সবকিছু সেই বন্ধুর তরফ হইতে চাবুকের আঘাত-
যাহা তাহার প্রিয়জনকে কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুর বন্ধুত্ব ও আকর্ষণ
হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং একমাত্র সেই বন্ধুর প্রতি পথের দিক নির্দেশ প্রদান
করিয়া থাকে। বিপদ-আপদ হইতেছে সেই বন্ধুর পাতিয়া রাখা ফাঁদ মাত্র, যাহা
তাঁহার প্রিয়জনের প্রতিটি শিরা-উপশিরার মধ্যে আবর্তিত হইতে থাকে এবং
ক্রমশঃ তাহাকে সেই পরম বন্ধুর দিকে প্রধাবিত করে।

আমি তো নিজের ইচ্ছায় যাই না
তার পেছনে পেছনে,
টেনে নিয়ে যায় সে আমাকে
প্রেমের দুর্বীর আকর্ষণে-
কারণ আমি আটকা পড়ে গেছি
তার অনন্য চুলের মুক্ত ফাঁদে,
সেই ফাঁদ টেনে নিয়ে যায় ক্রমাগত
কোন সুদূরের চাঁদে।

হ্যাঁ, আসলে প্রকৃত মূল হইতেই সব কিছু পরিচালিত হওয়া দরকার- শাখা
প্রশাখা দ্বারা যাহা কিছু সংযুক্ত তাহা কেবল মূল হইতেই উদগত ও বিস্তৃত হইয়া
থাকে। তাই বলিয়া শাখা-প্রশাখা কখনও কোন বিষয়ে নিজস্ব স্বকীয়তার অধিকারী
হইতে পারে না। এই যে প্রেম ও ভালবাসা (ইশক ও মহব্বত), যাহা সেই মূলেরই
শাখা বিশেষ, তাহাও সেই প্রকৃত বন্ধুর তরফ হইতেই আসে এবং তাহা তাঁহারই
দান বিশেষ।

যে গভীর ভালবাসা প্রেমিকের কাছ হতে আসে
সে তো তার অসীম দয়ার দান
প্রেমের ধারায় যদি কাটে কভু দিন দুঃখ-ক্লেশে
তথাপি রহিব আমি এমনি অম্লান।

বন্ধুর প্রেম যদিও কোন দাবীর মুখাপেক্ষী নয় এবং তাহা সবকিছু হইতে মুক্ত
ও বেপরোয়া, তবু গভীরভাবে যদি চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে, এই
প্রেম ও ভালবাসা উভয় পক্ষ হইতেই হইয়া থাকে- প্রেমিক বন্ধুর অভিলাষ তখন
অপর পক্ষের প্রেমযাচিত প্রিয়ার মতই হইয়া পড়ে। জনৈক কবি কী সুন্দরভাবেই
না বর্ণনা করিয়াছেন :-

আহা আশেক তো চায় সদা মাশুকের সঙ্গ
কাছে থেকে দেখিতে সে চায় রূপ-অপরূপ;
মাশুক যে চায় তারে আরও গভীর-গোপনে
জানে না আশেক তাহা, রয় শুধু নির্বাক-নিশ্চুপ।

কিন্তু প্রেমিকের সেই প্রেম কেবল মধুর প্রেমের অবগাহনে ভরা, গোপন প্রেমের
আস্বাদে পরিপূর্ণ।

প্রেমময় প্রেমিকের প্রেমের আঙনে
অহরহ থাকে যে জ্বলিতে প্রিয়া,
বলিতে পারে না কিছু লজ্জার কারণে
পারে না খুলিতে মুখ বলিব বলিয়া।

টীকাঃ জান্না বেগম ছিলেন আবদার রহীম খানখান্না সাহেবের দুহিতা। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা
ও ধর্মীয় পরিপূর্ণতার এমন উচ্চস্থানে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন, যেখানে অনেক পুরুষের
পক্ষেও পৌঁছান সম্ভব নয়। বাদশাহ আকবর নিজ পুত্র দানিয়ালের সহিত তাঁহার (জান্না
বেগমের) বিবাহ দিয়াছিলেন। গুজরাটে দানিয়ালের ইন্তেকালের পর তিনি বিধবা হইয়া
পড়েন। বিধবা অবস্থায় তিনি হজ্জ ও জিয়ারত সম্পন্ন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।
তিনি কোরআন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা (তফসীর) লিখিয়া গিয়াছেন। ফারসী
ভাষায় তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে একটি হইতেছে ঃ—

কেমনে রাখিবে প্রেমিকা তাহার
ভালবাসা সঙ্গোপনে
নয়নের ধারা ঝরে যে বাহিরে
লোকজন নাহি মানে।

জান্না বেগম ১০৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (নুযহাতুল খাওয়াতির, পঞ্চম খণ্ড
দ্রষ্টব্য)।

দিল্লীর সৈয়দ জহরুল হোসেন রচিত মুহজারাতে তাইমুরীয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ৬ ও
৭ পৃষ্ঠায় জান্না বেগম সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখা রহিয়াছে। তাহা হইতে এখানে তিন-চার
লাইন উল্লেখ করা হইলঃ—

জান্না বেগম তাঁহার পিতামাতার একমাত্র কন্যা সন্তান। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও
বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জনশ্রুতি বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রাকৃতিক
ও মৌলিক জ্ঞানের বিষয়গুলির প্রতি তাহার প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল এবং সেই
জ্ঞানের রাজ্যে তিনি মগ্ন ও মশগুল থাকিয়া নিজ জীবনযাপন করিতে ভালবাসিতেন। কোন
ঐশী শক্তি যেন তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক জ্ঞানসমূহের ভাণ্ডার স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ
করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার মৌলিক জ্ঞানসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রকাশ করিবার মানসে
তিনি কুরআন মাজিদের একটি পূর্ণাঙ্গ তফসীর (ব্যাখ্যা) লিখিয়া গিয়াছেন।

আশেকানের ইশকও সমস্ত কিছু হইতে মুখাপেক্ষীহীন ও বেপরোয়া এবং
আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া থাকে।

প্রিয়ার হিয়ার মাঝে গোপনে লুকানো থাকে
আমরণ প্রেমের বৈশাখী বাড়,
আর প্রেমিকের প্রেম-উন্মত্ত মত্ততা থেকে
জেনে যায় সবে প্রেমের খবর।
প্রেমের কারণে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ে
প্রেমিকের দেহ তনুমন—
আর প্রেমের সাযরে নিভতে সঁতার কেটে
ফুটে উঠে প্রিয়া ফুলের মতন।



খাজা মোহাম্মদ ফারুকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং- ১৫

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন আ'লা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা- যাবতীয়
প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

প্রেমিকের কথা যতকিছু বলি
বলার হয়না শেষ
শুনিতে শুনিতে সে কথা শোনার
কাটিতে চাহেনা রেশ।

হে ভ্রাতঃ, আল্লাহুতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য যে পূর্ণতা তাহা শরীয়তের
অবয়ব ও আকৃতির ফল। আর নবুয়তের জন্য যে পূর্ণতা তাহা পরিণামে শরীয়তের
মূল তত্ত্বের নির্যাস। সুতরাং আল্লাহুতায়ালার নৈকট্যের পূর্ণতা ও নবুয়তের পূর্ণতা
প্রাপ্তগণের মধ্যে এমন কোন পূর্ণতাপ্রাপ্তির অধিকারী নাই, যে শরীয়তের বৃন্দের
বাহিরে এবং শরীয়ত হইতে অমুখাপেক্ষী থাকিতে পারে। ওয়াসসালাম।



মাওলানা হোসেন আলীর নিকট
লিখিত । মকতুব নং- ১৬

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম ।

যেহেতু এই সাময়িক অবস্থান স্থল দুনিয়া হইতেছে কাজ করিবার স্থান, যাহার প্রতিফল সম্মুখে আগত আখেরাতে (পরকালে) পাওয়া যাইবে, সেইজন্য সেখানে যাহাতে চিরস্থায়ী বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা হইতে পারে, সেই ধরনের কাজের মধ্যে নিজেকে সবসময় উৎসাহী ও আগ্রহী রাখিতে হইবে। যে ধর্মীয় পদ্ধতি, রীতিনীতি ও আচার-আচরণের জন্য আদেশ করা হইয়াছে দ্বিধাহীনচিত্তে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। আদেশসমূহ বাস্তবায়িত (আমল) করিবার সময় কোন পারিশ্রমিক চাহিলে এবং প্রতিদানের আশায় নিজেকে জড়াইয়া রাখিলে, পুরস্কার প্রাপ্তির পথ হইতেই নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখা হয়। প্রকৃত চিরস্থায়ী আবাস আখেরাত সম্মুখে আগত।

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, আল্লাহর সেই সাক্ষাতের কাল সম্মুখে আগত।’

এই স্থান (অর্থাৎ দুনিয়া) হইতেছে নিজ আশা-আকাজ্জার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবার স্থান- যে আশা-আকাজ্জা অন্তরের গভীর হইতে ভালবাসার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং তাহা ঈঙ্গিত আকাজ্জার মধ্যে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা উত্তম। তাহা এইজন্য উত্তম যে, প্রথমটি অর্থাৎ আকাজ্জিত বস্তুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা উত্তম আমল হিসাবে পরিগণিত হয় এবং উন্নতির বিষয়বস্তু হইয়া থাকে। অপরটি হইতেছে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ব্যাপার- যাহার ওয়াদা পরকালের জন্য করা হইয়াছে। তবে অনুসন্ধানরত আগ্রহী প্রেমিকগণকে সাধুনা দিবার জন্য (কখনও কখনও) বর্ণিত প্রতিজ্ঞার (ওয়াদার) কিছু নমুনা এবং তাহার ছায়া দেখাইয়া (এখানেও) আরাম প্রদান করা হয়। কোন কোন প্রেমিকের ভাগ্যে আবার সেই আরামটুকুও জোটে না যদিও তাহা কৃত প্রতিজ্ঞাসমূহের ব্যাপারে কোন ক্ষতির কারণ হয় না।

টীকাঃ মাওলানা হোসেন আলী র. ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা।



সুলতান মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর
এর নিকট লিখিত মকতুব নং-১৭

বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম- পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন আ'লা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

অতি নগণ্য এই অধম তাহার আরজ পেশ করিয়া জানাইতেছে, অত্যন্ত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কাজের জন্য সাহসের সঙ্গে নিজেকে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক রাখিয়াছে এবং এই সিলসিলার সফরে কঠিন ও কষ্টকর পথসমূহ- প্রকৃতপক্ষে যাহা অন্তহীন প্রাচুর্যের উৎস ও উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণের নিমিত্ত (অসিলা) স্বরূপ- অতিশয় উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। আল্লাহর রসূল স. এরশাদ করিয়াছেন, “জান্নাতের মধ্যে একশত রকমের শ্রেণীবিন্যাস রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের জান্নাতের অধিকারী হইবে যাহারা আল্লাহর রাস্তায় অকপটে সাহায্য করিয়াছে। আর এইসব জান্নাতের ক্রম অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর জান্নাতের মধ্যে এমন ব্যবধান বিরাজমান, যেমন ব্যবধান রহিয়াছে আসমানের সহিত জমিনের” (বোখারী)।

হজরত আবু হোরায়া রা. এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, রসুলুল্লাহ স. বলিয়াছেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় একটি মুহূর্তের জন্য অবস্থান করা মক্কা মোকাররমায় হাজরে আসওয়াদের নিকট শব-ই-কদরের মধ্যে অবস্থান (কিয়াম) করা অপেক্ষা উত্তম (বায়হাকি ও ইবন হাব্বান ফি সাহীহীহী)।’ এই হাদিসের প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ আলেম-ওলামাগণ বলিয়াছেন, এই হিসাব অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় এক মুহূর্তের জন্য অবস্থান করা, একাধিক্রমে দশ কোটি মাস অবস্থান করা হইতে উত্তম- ইহা এইজন্য যে, মক্কাশরীফে শবে-কদরের জন্য অবস্থান (কিয়াম) করা (কমপক্ষে) দশ কোটি মাসব্যাপী অবস্থান করার সমান।

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, ‘যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার (চৌকিদারী) কাজে রত থাকে (মুসলমানদের হেফাজত করার কাজে), তাহা হইলে সেই (সুরক্ষিত)

এলাকার যত লোক (শান্তির সহিত নির্ভয়ে) রোজা রাখে এবং নামাজ পড়িতে পারে, তাহাদের সকলের সমান প্রতিফল সে একাই লাভ করিবে।’ (তাবরানী)। বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলিয়াছেন, বর্ণিত হাদিসটি হইতেছে এই বিষয় সম্পর্কে এমন একটি দলিল যে, কোন শাসনকর্তার আমলনামাতেও আল্লাহুতায়াল্লা এইসব সুন্দর সুন্দর আমলের (কাজের) অনুরূপ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া দেন, যদি তাহার এলাকার লোকজনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সে ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিতে পারে। এই বিরাট অনুগ্রহ কতইনা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মহিমাম্বিত। আফসোস যে, বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই লেখক এই ধরনের উত্তম আনন্দদায়ক নিয়ামত হইতে বাহ্যিকভাবে বঞ্চিত। আবার কেহ কেহ নানা বাধা নিষেধের ওজর-আপত্তি তুলিয়া আল্লাহর রাস্তায় এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও পরিশ্রম করা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

“আহা! আমি যদি উহাদের সহিত থাকিতে পারিতাম এবং বড় ধরনের কোন সাফল্যে কৃতকার্য হইতে পারিতাম।” কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক হইতে আপনার সঙ্গেই আছি এবং দোয়া ও তাওয়াজ্জাহ (মনোযোগ) প্রদানের পথে সহায়ক ও সাহায্যকারী বলিয়া মনে করিবেন। আমার মত ফকিরদের সহায়-সম্পত্তি বলিতে দোয়া আর তাওয়াজ্জাহ প্রদান করা— এইটুকুই পুঁজি। নির্জনবাসী ফকিরগণ যদি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকে এবং চিল্লা (একাধিক্রমে চল্লিশ দিন অথবা তাহারও অধিক সময়ব্যাপী আধ্যাত্মিক সাধনা) দ্বারা পরিশোধনের চেষ্টা করে তবু তাহারা এই প্রকার নেক আমলের (সৎ কাজের) ধারেকাছেও পৌছাইতে পারে না (যাহা আপনি পালন করিতেছেন)। ধর্মের পথে, সকলের মধ্যে থাকিয়া, আশ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আনুগত্যে ও অনুসরণে যে সাফল্য পাওয়া যায় তাহার গুরুত্ব ও মর্যাদা, নির্জনবাসে থাকিয়া যে আনুগত্য অর্জন করা যায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই রাস্তার তসবীহতে অন্যান্য পথের তুলনায় ভিন্ন রকমের পুরস্কার রহিয়াছে। এখানকার নামাজও আলাদা মর্যাদার দাবীদার। এই পথে মিত্রতা ও শত্রুতা বুজুর্গের মাহাত্ম্য রাখে। এই পথে অবস্থানের সময়ে যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে সেক্ষেত্রেও তাহার জন্য ভিন্ন ধরনের প্রতিদান রহিয়াছে।

আল্লাহর রসূল স. বলিয়াছেন, “ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর রাস্তায় অধিক সংগ্রাম (জেহাদ) করে এবং অধিক স্মরণ (জিকির) করে আল্লাহকে; বিনিময়ে প্রতিটি কলেমার জন্য সে পাইবে ৭০ হাজার উত্তম পুরস্কার (সওয়াব)।” (তিবরানী)। তিনি স. আরও বলিয়াছেন, “সীমান্তে পাহারারত অবস্থায় এক রাকাত নামাজ (অন্য সময়ে) বিশ লক্ষ রাকাত নামাজের সমান” (সংক্ষিপ্ত) রসূল

স. ইহাও বলিয়াছেন, “এই রাস্তায় একটি দিনার অথবা একটি দিরহাম ব্যয় করা, অন্যান্য সৎপথে ৭ (সাত) শত দিনার অথবা দিরহাম ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম।” (সংক্ষিপ্ত)। রসূলে মকবুল স. এই বিষয়ে আরও বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদে) অংশ গ্রহণ করিয়া গাজী হিসাবে জীবনযাপন করিয়াছে এবং ক্রীতদাসকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে— আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেইদিন নিজের ছায়ার মধ্যে আশ্রয় দান করিবেন, যেদিন কেবলমাত্র তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না” (আহমদ ও বায়হাকী) তিনি স. আরও বলিয়াছেন, “আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি একদিন অথবা একদিনের কম, এমনকি অল্প সময়ের জন্যও অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার আমলনামায় লেখা হয় এমন ধরনের একলক্ষ গোলামকে আজাদ করিয়া দেওয়ার ছওয়ার (প্রতিদান), যাহার প্রতিটির মূল্য একলক্ষ দিরহাম।”

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আপনি যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের দিকে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্বান্তকরণে সচেষ্ট থাকিয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করারই কাজ।

ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয় সুখে রত প্রবৃত্তি (নফসে আম্মারা) অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা ও মুখে স্বীকার করা সত্ত্বেও, আপন অবিশ্বাস ও অস্বীকার (কুফর ও ইনকার) করার প্রতি অনমনীয় থাকে— যাহা আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহের দিকে মনোযোগী হইতে দেয় না এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর তাবেদারী করা হইতে মানুষকে বিরত রাখে। এই কুপ্রবৃত্তি চায় যে, সবকিছু যেন তাহার বশীভূত হইয়া যায় এবং তাহাকে যেন কাহারও নিকট অবনত না হইতে হয়। তাহার মধ্যে আমিত্বের বড়াই অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার ভিতর হইতে, “আনা রাব্বাকুম”, “আমিই তোমাদের রব” এই ধ্বনি বাহির হইতে থাকে। সুতরাং তাহার সহিত শত্রুতা রাখা অত্যন্ত মনঃপুত ও উত্তম স্বীকৃত কাজ। আর তাহার বিরোধীতা করা, শরীয়তের শীর্ষে থাকিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদের (জেহাদে আকবরের) কাজ। দেশের শত্রুগণের সহিত ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ বা সময় হয়ত কখনও কখনও আসে কিন্তু ভিতরে অবস্থানকারী শত্রুর (কুপ্রবৃত্তির) সহিত সদাসর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হয়। আমাদের প্রতি সেই পরম করুণাময়ের অতিশয় মেহেরবানি যে, তাঁহার অনুগ্রহ (রহমত) দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমান লাভ করার জন্য কেবল অন্তরের (কলবের) বিশ্বাসকেই যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছেন এবং আস্থাভাজন নফসকে (প্রবৃত্তিকে) কোন দুঃখকষ্ট প্রদান করেন নাই।

শুধু এইটুকু আশা
আমার চোখের পানি তোমার কাছে হে প্রভু
যেন মুক্তা হয়ে হয়গো কবুল—
বিনুকের সিক্ত বারিকে মুক্তায়
অভিসিক্ত করিতে তুমিতো কভু
কর নাক ভুল ।

তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বুজর্গও আছেন, যাঁহার প্রবৃত্তি বিদ্রোহ ও অহমিকার সীমানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশান্তিময় মনজিলে পৌছাইয়া যায়, আল্লাহর আদেশসমূহের প্রতি বাধ্য হইয়া যায় এবং তাহাতে কোন রকমের কোন বিরোধিতা করিবার মত সামর্থ্য বাকী থাকে না ও তাঁহার ইচ্ছাতেই সদা সন্তুষ্ট থাকে । আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বোধন :

“হে প্রশান্তিময় আত্মা (নফস), নিজ প্রতিপালকের পানে এমন অবস্থায় উপনীত হও যেন তুমি তাঁহার প্রতি এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন”— এই ধরনের কামেল লোকদের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারে । ঈমানের পরিপূর্ণতা ও ইসলামের মূল তত্ত্ব এই অবস্থিতির মধ্যে উজ্জ্বল ও আলোকময় হইয়া উঠে এবং এই ধরনের ঈমান কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ও পতন হইতে সুরক্ষিত থাকে । পক্ষান্তরে মামুলি ধরনের ঈমান বিশৃঙ্খলা ও পতনের হাত হইতে সুরক্ষিত থাকে না । আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মতের শিক্ষার জন্য, এইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ঈমান সম্পর্কে এই ভাষায় বলিয়াছেন—

“হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার নিকট হইতে এমন ঈমানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি যাহার পরে আর আমি অবিশ্বাসী (কাফের) হইব না ।”

আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র কালাম কোরআনের মধ্যে—“ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু আমিনু”—“ওহে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, পুরাপুরি ঈমান আন”— এর মধ্যে এইরকম ঈমানের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হইয়াছে । আর এই হাদিসশরীফের উদ্দেশ্যেও হইতেছে এই ধরনের ঈমানের জন্য—

“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সময় অবধি কিছুতেই মোমিন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাহার অভিলাষ (খাহিশ), আমি যে শরিয়ত লইয়া আসিয়াছি তাহার অনুগত হয় ।”

সুফী তরিকার সর্বোত্তম ঈঙ্গিত উদ্দেশ্য হইতেছে ইসলামের মূলসত্যকে (ইসলামে হাকীকীকে) গ্রহণ করা যাহা অবিনীত প্রবৃত্তির (নফসে আম্মারার) আনুগত্য হইতে মুক্ত থাকে । কিন্তু প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করার পূর্বে যে ইসলাম কেবল অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা লাভ করা যায় তাহাকে ইসলামের প্রতিচ্ছবি বলা হয় । সুতরাং সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য জরুরী

হইতেছে— আসল কাজের মাধ্যমে নগদ উপার্জন সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করা। যে-কেহ এই আকাজ্জিত সম্পদ অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহার জন্য সুসংবাদ— কেননা, তাহাকে সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল সে তাহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ পাওয়ার যে অধিকার (হক) তাহার ছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইয়াছে। যদি এই সম্পদ (মারেকত) পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে অবিরতভাবে তাহার অনুসন্ধান থাকিতে হইবে এবং কোন স্থান হইতে তাহার খোঁশবু অনুভূতির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলে তাহার তালাশ করতে হইবে।

সে যে আমায় চেনে ওগো, সব কিছু মোর জানে
কী করি আর কোথায় থাকি সব খবরই রাখে,
চেনে জানে বলে যে গো ভয় তো আমার সেইখানে
থাকত না যে দুঃখ কোন না চিনিলে এই আমাকে।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।



মোল্লা মোহাম্মদ আফজলের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৮

শুরু করিতেছি সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌তায়ালার নামে এবং দরুদ ও সালাম রসুলুল্লাহ স. এর উপর ও তাঁহার পরিবার পরিজন সকলের উপর।

একটি হাদিসে আছে— “কবর হইতেছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান।” কবর যে জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়, (বাহ্যিকভাবে) তাহার অর্থ হইতেছে, কবর ও জান্নাতের মধ্যে স্থান ও কালের যে ব্যবধান থাকে তাহা ঘুচিয়ে যায় এবং কবর ও জান্নাতের মাঝে কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকে না। তখন কবরের মাটির সহিত জান্নাত বিলীন (ফানা) হওয়ার পর স্থায়িত্বের (বাকার) সম্পর্ক রচিত হয়। ভাল করিয়া চিন্তা কর— ইহাই হইতেছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত এই হাদিসের অর্থঃ “আমার কবর ও (মিস্বরের) মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান।”

টীকাঃ শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র. যিনি ‘হজরত আল-কুদস’ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পুত্র ছিলেন মোল্লা মোহাম্মদ আফজল।

কেবল বিশেষ বিশেষ মোমিনজনের ক্ষেত্রে কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগানে পরিণত হয়— যাহা সকলের জন্য নয়। মোমিনগণ যখন কবরের জন্য পবিত্রতা ও জ্যোতিঃ সঞ্চয় করিয়া লন এবং তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যাপারে এমন যোগ্যতার সৃষ্টি হইয়া যায় যে, জান্নাতের দীপ্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে— অন্য কথায় কবরের যাত্রী যখন পরিষ্কার আয়নার মত (উজ্জ্বল) হইয়া যান, তখন তাঁহার মধ্যে সেই মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে থাকে, যাহার ফলে কবর তখন জান্নাতের একটি বাগানে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ওয়াস্‌হামদুল্লিলাহী রব্বুল আ'লামীন, ওয়াস্‌সালামু আ'লা রসুলিহী ওয়া আলিহী আজমাদীন— সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালারই প্রাপ্য এবং রসুলুল্লাহ স. ও তাঁহার পরিবার-পরিজনদের প্রতি সালাম।



মোহাম্মদ মোমীন বেগ কাবুলীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-১৯

“তোমাদের উপর সালাম, তোমরা সঙ্কষ্ট থাক।”

নিখাদ প্রেমের বৃন্তে আছে শুধু
আল্লাহর ভালবাসা,
তাহার বাহিরে আছে যাহা কিছু আর—
যদি হয় তাহা মধুমাখা তথাপি লালসা
এবং অনিষ্টের সমূহ কারণ,
আর ক্ষতির আধার।

সেই নিত্য-নিয়ত-চিরসত্য আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত ব্যতীত জাগতিক অস্থায়ী বস্তুনিচয়ের মোহে ও মহব্বতে আবদ্ধ হওয়া অন্তরের ব্যাধিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি। অন্তরকে আলোকিত করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা, যাবতীয় জরুরী কাজকর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জরুরী।

পাগলকে করলে বারণ বাড়ে পাগলামী তার
আরও জোরেশোরে
হৃদয়কে করলে বারণ প্রিয়াকে আঁকড়ে ধরে
আরও বেশী ক'রে।



মোল্লা মোসাফিরের নিকট
লিখিত । মকতুব নং-২০

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহুতায়ালার নামে শুরু করিতেছি। মোল্লা মোসাফির ভাই, শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাকের স্মরণের মধ্য দিয়া যেন তোমার সময় আনন্দে কাটিয়া যায়। তোমার পত্র পাইয়াছি। যে মনঃকষ্ট ও দুঃখ বেদনা মানুষের উপর আসে, তাহা আল্লাহুতায়ালার ইচ্ছানুযায়ী আসে। ইহার প্রতি রাজী থাকা ব্যতীত কোন উপায় নাই। তাঁহার আদেশ-নিষেধের মধ্যে বাধ্য থাকার প্রতি নিজেকে সজাগ রাখ। দুঃখকষ্ট ও রোগ-ব্যাধিতে সবার করিয়া থাক। সুস্থতার জন্য আল্লাহুতায়ালার দয়া-দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করিতে থাক। এই সৃষ্ট জগতের কাহারও প্রতি লক্ষ্য ও মনোযোগ রাখিবে না। সমস্ত বিষয় আল্লাহর তরফ হইতে সম্পন্ন হয় বলিয়া জানিবে। যে কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর— কেন না, আল্লাহুতায়ালার মর্জি ব্যতীত কেহ কাহারও ক্ষতিসাধন করিতে পারে না এবং কেহ কাহারও ক্ষতিকে বিতাড়িত ও দূরীভূত করিতে পারে না। ইহাই হইতেছে দাসত্বের পথ। ওয়াসসালাম।



মওলানা হোসেন আলীর নিকট
লিখিত । মকতুব নং - ২১

আল্লাহুতায়ালার প্রশংসা ও প্রশস্তির পর তাঁহার নামে শুরু করিতেছি। মোল্লা হোসেন আলী ভাই আমার একটি মকতুবের উপর কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার উত্তর চাহিয়াছেন, যাহা আমি আবিদউল্লাহ বেগের নিকট লিখিয়াছিলাম। তিনি যে সন্দেহ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, তাহা হইতেছে, ‘ভাল ও মন্দের ব্যাপারে পার্থক্য নির্ণয় করার জ্ঞান শরীয়তের অবস্থিতির মধ্য হইতেই

পাওয়া যায় কিন্তু তিনি একটি পুস্তিকায় দেখিয়াছেন যে, ‘তরিকতের মধ্যে সকলের সঙ্গে ও প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া থাকে’— যাহা শরীয়তের পরিপন্থী, কারণ শরীয়ত অনুযায়ী শত্রুদের সহিত যুদ্ধ এবং বন্ধুদের সহিত সন্ধি হয়।” আচ্ছা অদ্ভুত এবং আজগুবি সন্দেহ বটে। শরীয়তের সহিত তরিকতের সংঘর্ষের প্রশ্ন কেমন করিয়া আসিতে পারে? আর এই দুয়ের মধ্যে সাম্যই বা কোথা হইতে আসে? শরীয়ত তো সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাদেশ (ওহী) দ্বারা স্থিরীকৃত, যাহাতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। ইহার আদেশ ও বিধানসমূহের মধ্যে কোন রদবদল নাই— যাহার স্থায়িত্ব কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ রহিবে। শরীয়তের দাবী অনুযায়ী আমল করা আম-খাস্ (সাধারণ ও অসাধারণ) নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য অবধারিত ও অবশ্য করণীয়। তরিকতের এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা সে শরীয়তের আদেশসমূহকে রহিত করিতে পারে এবং শরীয়ত প্রতিপালনের জন্য যে কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা হইতে তরিকত পন্থীকে অব্যাহতি দিতে পারে। সুন্নত জামাতের অনুসারীগণের মধ্যে যাহারা ধর্মীয় অনুশাসনের উপর পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী তাহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, বান্দা (সজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায়) কখনও এমন কোন পর্যায়ে উপনীত হইতে পারেন না, যেখানে শরীয়তের বিধি বিধানসমূহ প্রতিপালনের জন্য কষ্ট ও পরিশ্রম করা হইতে কেহ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন। যে ইহার বিপরীতে শরীয়ত বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে, সে ইসলামের গোষ্ঠী হইতে বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। যে দলকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিজের শত্রু হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং সেই ঘৃণিত শত্রুদিগের প্রতি শক্তি প্রয়োগের আদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত সখ্যতা ও বন্ধুত্ব রাখার অর্থ হইতেছে ইসলামের রীতিনীতি হইতে একেবারে খারিজ হইয়া যাওয়া। এই ধরনের (শরীয়ত বিরুদ্ধ) ব্যাপার এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ও তাহার রসুলের প্রতি মহব্বতের দাবী করা— দুই বিপরীতধর্মী বস্তু যাহা কখনও একসঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। কেননা, প্রেমিকের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহার বন্ধুদের সহিত বন্ধুত্ব রাখা এবং শত্রুদের সহিত শত্রুতা করা, ভালবাসার মৌলিক উপাদানসমূহের মূলবস্তু।

হ্যাঁ, অবশ্য কোন কোন প্রেমিকের ক্ষেত্রে এমন ধরনের কিছু কিছু বাহ্যিক ঘটনাবলী ঘটিয়া যায়, যাহা দৃশ্যতঃ ধর্মীয় বিধান ও শরীয়তের বরখেলাপ। এই রকম সময়ে সেই ভক্ত-প্রেমিক শরীয়তের সম্পর্কে কোনক্রমেই তাহার নাগালের বাহিরে যাইতে দিবে না, প্রাণপণে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে এবং অভ্যন্তরীণ তোলপাড় অবস্থা ও প্রেমের আবেগজনিত উন্মত্ততার বিপরীতে সুন্নত জামাতকে অনুসরণ করিয়া তাহার বিশ্বাস ও আমলকে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

কোন কোন সময়ে এই আত্মিক ভ্রমণ পথের (রাহে সুলুকের) কিছু কিছু জঞ্জাল “ইন্নি আনাল্লাহ্” অর্থাৎ “আমিই আল্লাহ্” ধ্বনি তুলিয়া ভক্ত-প্রেমিক বেচারাকে মহৎ উদ্দেশ্যের পথ হইতে লক্ষ্যচ্যুত করিয়া তাহারই আরাধনার জন্য আমন্ত্রণ (দাওয়াত) করিতে চায়। এই রকম সময়ে বিশ্বস্ত প্রেমিকের জন্য ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, সে ইব্রাহীম খলিলউল্লাহ আ. এর মত তখন “লা ইউহিব্বুল আফিলীন” (ধ্বংসশীল কোন বস্তু আমি পছন্দ করি না) বলিয়া “ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজ্জাহিয়া লিল্লাহি” অর্থাৎ “আমি আমার চেহারাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ফিরাইয়া নিলাম”- এর মর্ম অনুযায়ী অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যলোকের (গায়েবুল গায়েবের) উন্মুক্ত ময়দানের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে এবং আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে থাকিবে, যাহাতে কোন দৃষ্টভ্রমের মধ্যে তাহাকে পতিত হইতে না হয়।



শাহ নিয়ামতউল্লাহ্ কাদেরী র. এর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২২

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও প্রশস্তির পর শুরু করিতেছি সেই পরম করুণাময়ের নামে।

যে অনুগ্রহলিপিখানি আপনি এই নগণ্য অধর্মের নিকট পাঠাইয়াছেন, আপনার সেই মূল্যবান পত্রখানি পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত ও ধন্য মনে করিতেছি। দূরে এক কোণে পড়িয়া থাকা স্মরণকারীকে এইভাবে আপনার স্নেহমমতা মাখান নূরান্বিত অন্তরের এক প্রান্তে ঠাঁই দিয়া মাঝে মাঝে এই অভাজনকে আপনি স্মরণ রাখিবেন- এই প্রত্যাশা করিব।

মূল্যবান এই পত্রখানি প্রকৃতপক্ষে আপনার মহানুভবতা ও উদারতার আন্তরিক নিদর্শন, যাহা আমার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র পাওয়ার পূর্বেই আপনি লিখিয়াছেন। আমার নিকট ইহা যেন এক অভাবিত পরম নিয়ামত। পত্রখানি পাওয়ার পর হইতেই আমি চেষ্টা-চরিত্র ও উন্নতির ব্যাপারে খুব আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। নেতৃত্ব ও পরিচালনা অবশ্যই বুজুর্গ ও গুরুজনগণের তরফ হইতেই হইয়া থাকে এবং যাহাকিছু দয়া-দাক্ষিণ্য সব সেই মহান দাতার পক্ষ হইতেই আসে।

নবুয়তের জমানা হইতে বর্তমানকাল বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছে। সুন্নতের নূরের যে পরিপূর্ণতা ছিল তাহা ম্লান ও ক্ষীয়মান হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের নামে ধর্ম-বিরোধিতার (বেদাতের) ভয়াবহ অন্ধকার চারিদিক কোলাহলে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থার মাঝে, তবু আশার কথা, রাজ-রাজাদের সঙ্গে যাঁহাদের কাজকর্ম ও সম্পর্ক, আপনার মত সেই ধরনের ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্বের উপস্থিতি এখন আশীর্বাদস্বরূপ। আমার মত সাধারণ অচল মানুষ যতই একাকীত্ব এখতিয়ার করিয়া, নির্জনে বসিয়া পরিশ্রম করুক না কেন এবং সাধনায় মগ্ন থাকুক না কেন, তাহা আপনার একটি সঠিক বাণীর সমতুল্যও নয়— যে বাণী সুলতানদের অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। আমাদের এই পরিশ্রম ও সাধনা হয়ত তাহার ধারে-কাছেও যাইতে পারিবে না। সুলতানদের সুলতানী-জগতে আল্লাহতায়লা এমন উচ্চ মর্যাদা রাখিয়াছেন যেমন আত্মার সহিত দেহের সম্পর্ক বিদ্যমান। আত্মার সংশোধন যেমন দেহের সংশোধনের এবং আত্মার ক্ষতি যেমন দেহের ক্ষতির কারণ, তেমনিভাবে সুলতানদের সংশোধন দ্বারা তামাম আলমের সংশোধন সাধিত হয়। ইহা অপেক্ষা এমন কী আর ভাল কাজ আছে যাহা এই কাজের ধারেকাছেও পৌঁছিতে পারে?

শায়েখ মোহাম্মদ সালেহ মজলিসে ও মহফিলে প্রায় আপনার প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মহত্বের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং আপনার সুন্দর ব্যবহার ও অনুগ্রহের কথা হরহামেশা বলিয়া থাকেন। তিনি আপনার ওইদিকে যাইতেছেন জানিয়া—নিজ অযোগ্যতা সত্ত্বেও সামান্য দু'চার কথা আপনার স্মরণ-পটে থাকিবার অভিপ্রায়ে, তাহার মাধ্যমে লিখিয়া পাঠাইতেছি। আপনার মূল্যবান সময়ের কিছু অংশ হয়ত ইহার দ্বারা বিয়িত হইবে।

উপকার ও হেদায়েতের ছায়া সর্বত্র সুপ্রশস্ত হউক।

টীকাঃ শাহ নিয়ামত উল্লাহ কাদেরী ছিলেন শায়েখ আতাউল্লাহ নারনুলী র. এর পুত্র। তিনি বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বহু দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি জৈনপুর গিয়াছিলেন শিক্ষাজীবনের পরে তিনি ফিরোজপুরে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি তাহার জমানায় কাদেরীয়া তরিকাভুক্ত মাশায়েখ গণের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত শায়েখ ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ও স্বীকার করানোর ক্ষমতা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বাদশা শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা সুজা তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীর র. এর রাজদরবারের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত কেতাবসমূহের মধ্যে কোরআন শরীফের তফসীর অন্যতম, যাহা জালালায়েন ধারায় রচিত হইয়াছিল। 'তফসীরে জাহাঙ্গীর' নামে কোরআনের একটি অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের কাজ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, তিনি দিল্লীতে থাকিয়া করিয়াছিলেন। আল্লামা মাহমুদ বিন মোহাম্মদ জৈনপুরী তাহার নিকট হইতে তরিকতের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১০৭২ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। (নুযহাতুল খওয়াতির ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য— লেখক, মাওলানা হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাই ইবনে সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আল হাসানী র.।



মিরযা তাহের বেগের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৩

আল্লাহ্‌তায়াল্লা যেন তোমাকে অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করেন এবং নৈকট্য প্রাপ্তির উর্ধ্বারোহণে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন। যে সর্বক্ষণ জিকিরের সঙ্গে আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল বা অমনোযোগী হয় না এবং প্রবৃত্তির দাসত্বে সময় অতিবাহিত করে না, সে আল্লাহর মকবুল বান্দা হইতে পারে। তাঁহার স্মরণকে নিজের উদ্দেশ্য সমূহের সহিত যেন সংমিশ্রিত না করা হয়। এমন অকপট হইতে হইবে যে, নিজ অবস্থা ও সঙ্গতি কোন কিছুই কল্পনাও জিকিরের সহিত মনে আসিবে না। যদি এই রকমভাবে তাঁহাকে স্মরণ করা হয় তাহা হইলে, প্রয়োজন মত সেই পরম করুণাময়ের দয়ায় “তুমি আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাকে স্মরণ করিব”-বাক্য অনুযায়ী ঐ পক্ষ হইতেও তাহাকে স্মরণ করা হইবে। কোন পথে তিনি স্মরণ করিবেন এবং কিভাবে দীনের মহিমা দ্বারা শূন্য পাত্রকে তিনি পূর্ণ করিয়া দিবেন তাহা ধারণাও করা যায় না। জিকিরের সময় সমস্ত কিছু হইতে অন্তরকে খালি রাখিবে এবং বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে নিষ্ঠা ও একাত্মতার সহিত সর্বদা হাজির থাকিবে। উপস্থিতির প্রকৃতি এমনতর হইবে যেন প্রবৃত্তিও কোন অবকাশে সেখানে প্রবেশ করিতে না পারে এবং তাহার নিজের অস্তিত্বের অবস্থিতি যেন সে অস্তিত্বহীনতার মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

যে কাজ রয়েছে আহা সম্পদে ভরপুর
কাকে তুমি দিবে তুলে সেই পুতঃপূর।

যাঁহারা হেদায়েতের অনুগামী ও মোস্তফা স. এর অনুসারী তাঁহাদের সকলের প্রতি অফুরন্ত দরুদ ও সালাম।



শায়েখ আব্দুল হামিদ বোরহান পুরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-২৪

বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম। শুরু করিতেছি পরম দয়ালু ও দাতা
আল্লাহুতায়ালার নামে।

বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই দীনহীন নগণ্যের তরফ হইতে সালাম ও কুশল
কামনার বার্তা যেন সম্মানিত ভাই শায়েখ আব্দুল হামিদের নিকট পৌঁছায়।
তোমার চমৎকার পত্রখানি, যাহা তুমি মুলতান নগরী হইতে লিখিয়াছ, পাইয়া
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পত্রে সুন্নত প্রতিপালনের ফলে বিকশিত অবস্থা এবং
উচ্চ পর্যায়ের অবস্থান সম্পর্কে লিখিয়াছ। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই,
আল্লাহুতায়ালার তাঁহার কোন কোন দাসকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য
প্রদান করিয়া অভিজাত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত কোন উচ্চাসনে সমাসীন করেন।
“নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অনুগ্রহকারী ও মহব্বতকারী।” কিন্তু তাহার জন্য শর্ত
হইতেছে সুন্নতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ধর্মের নামে বিভিন্ন বেদাত হইতে দূরে থাকা।
দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে, বান্দার ইচ্ছা-অভিলাষ সমস্ত কিছুতে শরীয়তের আদেশ-
নিষেধের প্রতি একান্ত অনুগত থাকা। হাদীস শরীফে আছে- “তোমাদের মধ্যে
কোন ব্যক্তি ঐ সময় অবধি কিছুতেই মোমিন হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না
তাহার অভিলাষ আমি যে শরীয়ত লইয়া আসিয়াছি- তাহার অনুগত হয়।”

হক সোবহানাহুতায়ালার যেন তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য উর্ধ্বারোহণের দিকে
উন্নতি দান করেন এবং নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি
অটল রাখেন। বন্ধুগণের নিকট হইতে শুভ পরিণতির জন্য শান্তিপূর্ণ দোয়ার
প্রত্যাশা করি।



খাজা মোহাম্মদ হানিফের নিকট
লিখিত । মকতুব নং-২৫

বিসমিল্লাহীর রহমানীর রহীম- পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহুতায়ালার নামে
আরম্ভ করিতেছি ।

বন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য ও আনুগত্যের প্রকৃত অবস্থা তখনি অর্জিত হইতে পারে
যখন যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে পূর্ণ মনোযোগ থাকিবে কাবাসরীফের দিকে এবং
মূল আশ্রয়স্থল কেবলমাত্র আল্লাহপাকের দরবার ব্যতীত আর কিছুই হইবে না ।
প্রবৃত্তির তাড়নাজনিত ভোগবিলাসকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত কাজ কর্ম সেই
চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী প্রভুর নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে । সেখানে অস্থায়ী ও
ধ্বংসশীল কোন বিষয় বা বস্তুর উপর কোন পিছটান থাকিবে না । অন্যথায়
(আল্লাহকে পাওয়ার মত) সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ।

হে ভ্রাতঃ, দুনিয়াতে কাহারও মুখাপেক্ষী হওয়া ও কাহারও উপর ভরসা করার
কারণ তো ইহাই হইতে পারে যে, সে অভিভাবক এবং লালন-পালনের ব্যাপারে
তাহার সহিত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রহিয়াছে । (এখন চিন্তা করিয়া দেখ)-
“বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার ” (সুরা নাস)- এর
উৎস হইতেছে, প্রকৃত অভিভাবক হইতেছেন একমাত্র হকতায়াল্লা এবং বাহ্যিক ও
অভ্যন্তরীণভাবে লালন-পালনের বিষয়ে সত্যিকার মৌলিক সম্পর্ক আসলে তাঁহার
সহিত বিদ্যমান । পীর-মোর্শেদ, উস্তাদ ও পিতামাতার প্রতি শরীয়ত অনুযায়ী
মনোযোগ প্রদান করিতে ও বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতে হয়- তাহা এই জন্য
যে, তাঁহারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন ।
যেহেতু এই ধরনের ব্যবহার আল্লাহুতায়ালার আদেশের উপর ভিত্তি করিয়া পালন
করিতে হয়, সেই জন্য এইগুলিকেও মূলতঃ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং
মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে । আসলে প্রত্যাবর্তনের ভিত্তি
তো সেই বাদশাহী ও সাম্রাজ্যের জন্যই হইয়া থাকে, আর বাদশাহী ও সাম্রাজ্য
অর্থাৎ মালিকিন্ নাস- “মানুষের অধিপতি” এর উৎস সূত্রে কেবলমাত্র আল্লাহর

জন্যই যথার্থ। আবার আল্লাহর উপাসনা ও তাঁহার প্রভুত্বের কারণেও এই প্রত্যাবর্তন হইয়া থাকে, কেননা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিচয়ের সূত্রে তাঁহার প্রভুত্ব ও উপাসনাতে প্রত্যাবর্তন। বিশ্বাস তো বিনয় ও নম্রতার ব্যাপার, যাহা পুণ্যার্থে প্রশংসনীয় এবং অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বাধ্যতামূলক। আর এই প্রভুত্ব ও উপাস্য (মাবুদিয়াত) অর্থাৎ ইলাহিন্ নাস- ‘মানুষের মাবুদ’ এর দাবী অনুযায়ী সেই মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র সত্তা ও অভিন্ন মূলের সহিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মানুষের কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের প্রলোভন ও কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার আদেশ আল্লাহ্‌তায়ালার এই শব্দ গুচ্ছের মাধ্যমে এইভাবে প্রদান করিয়াছেনঃ “তাহার অনিষ্ট হইতে, যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে মানুষের অন্তরে, জীনের মধ্য হইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে (সুরা নাস)।”

এই উভয় শব্দ অত্যন্ত চতুরতার সহিত ধূর্ত শিকারীর মত গুপ্তভাবে মানুষের পিছনে লাগিয়া থাকে। তাহারা যে কোন উপায়ে বান্দাকে তাহার অধিপতি, তাহার একমাত্র মাবুদ ও তাহার প্রকৃত মালিক হইতে দূরে রাখিবার ও গোপন করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে এবং তাহাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের ফাঁদে ফেলিয়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশীবাদিত্বের (শিরকে জলি ও খফির) দিকে পরিচালিত করে। এই সমস্ত দুঃমনগণের পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা অত্যন্ত জরুরি কাজ। সকল সময় তাঁহার নিকট আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে থাক এবং যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিষয় এই কল্যাণকর সুরার (সুরা নাস) মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে- পূর্ণতাপ্রাপ্তির উচ্চশিখরে আরোহণের জন্য সেই পবিত্র জাতের মধ্যে এই সব ধ্যানধারণায় নিজেকে নিমজ্জিত রাখ- যাহাতে দুঃমনদের অনিষ্ট হইতে শংকামুক্ত হইতে পার এবং সেই পবিত্র বিচারালয়ের রাস্তার সন্ধান লাভ করিতে পার।

“হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে তোমার রহমত দ্বারা প্রতিপালন কর এবং আমাদের কাজকর্মের মধ্যে তুমি মঙ্গল বর্ষিত কর।”



খাজা আব্দুস সামাদের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৬

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমিক বান্দাগণের প্রেমের পথ পরিক্রমার জন্য এই আয়াতে করিম (আল্লাহর বাণী) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ- “তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে তাহা ধ্বংশশীল এবং আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে তাহা অফুরন্ত ও চিরস্থায়ী।” মহান সত্যের অনুসন্ধানকারী যে পর্যন্ত না সমস্ত কিছুর সম্পর্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিবে, সেই অনন্ত স্থায়ী জ্যোতির সহিত তাহার স্থায়িত্ব (বাকা) ঘটিবে না। যদিও এই ব্যাপারে প্রকৃত বিষয় গোপন থাকে এবং বিলীনতা ও স্থায়িত্ব (ফানা ও বাকা) প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ গুণাবলী- তবু বাহ্যিক বিষয়বস্তুর ক্ষয়ক্ষতি, জীবিকার উপায় উপকরণ ও সহায়-সম্পদের জন্য উৎকণ্ঠা ও অসুস্থতা এবং দৃশ্যতঃ আকস্মিক দুর্ঘটনাসমূহ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সহায়ক ও মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক উন্মতির কারণ হইয়া থাকে।

ইহার জন্য নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তির প্রয়োজন, যে আল্লাহর এই বাণীর অতল রহস্যসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া ‘মা ইনদাকুম’ (তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে) এবং ‘মা ইনদাল্লাহ’ (আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে)- এর এই কলেমানিঃসূত-মা- অর্থাৎ “যাহা কিছুর সাধারণ আলোকে, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারিবে। ওয়াসসালাম।

টীকাঃ খাজা আবদুস সামাদ কাবুলী, কাবুল হইতে দুই ক্রোশ দূরে দিবাইয়াকুবী নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। হজরত খাজা মাসুম র. এর প্রধান খলিফাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। খেলাফত দান করিবার পর হজরত মাসুম র. তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমিতে পাঠাইয়া দেন। সেখানে বহু ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হইতে সমৃদ্ধশালী হইয়াছেন। (রওজাতুল কাইউমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড।)



শায়েখ তাহের বদখসী (পরবর্তীকালে জৌনপুরী)
এর নিকট লিখিত । মকতুব নং-২৭

বিসমিল্লাহীর রহমানির রাহীম- পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার নৈকট্যের পথে যেন ক্রমশঃ উন্নতি দান করেন। আশা করি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-রাজ্যের রাজা আমাদের মত দূরে পড়িয়া থাকা নগণ্য ব্যক্তিদের ভুলিয়া যান নাই। “যে লোক যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গী”- এই হাদিস শরীফের সূত্র অনুযায়ী, প্রেমের আকর্ষণ যত প্রগাঢ় হয়, বন্ধুত্বের বন্ধনও ততবেশী সুদৃঢ় হয়। আশা করি, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান আগের সেই সম্পর্কের মধ্যে কোন ফাটলের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বরঞ্চ আশা করি ভালবাসার বন্ধন আরও শক্তিশালী হইয়াছে। বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতেও এই প্রত্যাশা করি যে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরও মজবুত হইয়াছে।

এই জামাতের লোকজন যাহারা, কুতুবুল মোহাক্কিকীন, আল্লাহর অনুসন্ধানকারী প্রেমিকবৃন্দের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মহান ব্যক্তিত্ব হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি র. এর আকর্ষণীয় সঙ্গ ও সাহচর্য দ্বারা সম্মানিত ও ভাগ্যবান হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এই নগণ্য ফকীর একটা আলাদা ধরনের ভালবাসা ও মর্যাদা পোষণ করে। তাঁহারা আমার নিকট একক ও অবিচ্ছিন্ন এবং

টীকাঃ শায়েখ তাহের বদখসী ছিলেন হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি র. এর অন্যতম খলিফা। তিনি দীর্ঘকাল যাবত সেহিন্দ শরীফের খানকাতে অবস্থান করিয়া নিজ পীর ও মোর্শেদের নিকট হইতে প্রচুর ফয়েজ ও বরকত হাসিল করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি র. তাঁহার উপস্থিতিতে যখন মারেফতের জ্ঞান ও সহস্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাহা শুনিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন। হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতার সহিত তখন বলিতেন- মারেফতের এই রহস্য ও জ্ঞান যেন মাওলানা তাহেরের উপর বর্ভাইয়াছে, আমি যেন উহার কেবল ব্যাখ্যাকারক। হজরত মোজাদ্দের র. তাঁহাকে তরিকত সম্পর্কে তালিম দিবার এজাজত দান করিয়া জৌনপুরে পাঠাইয়া দেন। (জবদাতুল মাকামত হইতে সংগৃহীত)।

১০৪৭ হিজরীর ৭ই রজব তিনি জৌনপুরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহার মাজার শরীফ অবস্থিত। (নুহহাতুল খাওয়াতির-পঞ্চম খণ্ড- প্রণেতা সৈয়দ আব্দুল হাই র.।)

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জামাত হিসাবে নজরে আসিতেছেন। তাঁহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহা এই কারণে যে, তাঁহারা হইতেছেন প্রেমাস্পদের আরশীসমূহ হইতে এক একটি আরশী এবং যে মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন সেই মরহুম র. এর অনেক স্মৃতি-বিজড়িত চিহ্নস্বরূপ। প্রেমিকের খাদেমগণ সেই প্রেমিকের অস্তিত্বহীন অনুপস্থিতিতে বিশেষভাবে আরও অধিক প্রিয় ও বঞ্চিত হইয়া থাকেন। প্রণয়ে আসক্ত প্রেমিকগণের দৃষ্টিতে তাই এই জামাতের কদর অপরিসীম— এমনকি এই জামাত যদি বেপরোয়া হইয়া যায় এবং বন্ধুত্বের উপাদানসমূহ হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তবু আমার নিকট তাঁহারা অতিশয় প্রিয় ও বাঞ্ছিত। তাঁহাদিগকে মহব্বত করা ও খেদমত করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

পরিশেষে আরজ এই যে, দোয়া করা হইতে আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন না, সেই সঙ্গে আপনার তাওয়াজ্জাহ্ দ্বারা আমাদিগকে বাধিত করিবেন, যাহাতে কাল কেয়ামতের পুনরুত্থান দিবসে হজরত মোজ্জাদ্দের আলফে সানি র. এর খাদেম ও স্নেহের পাত্র হিসাবে আমরা সকলে একসঙ্গে একস্থানে মিলিত হইতে পারি। “হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে নূর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও— সন্দেহাতীতভাবে তুমি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।”



শায়েখ হামিদের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৮

ভালবাসার প্রতীক যে জন, সেই শায়েখ হামিদকে দোয়া ও সালাম জানাইতেছে। নিজের অবস্থাসমূহ লিখিয়া জানাইতে কখনও অলসতা করিও না। আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে সদা মশগুল থাকিও। মাওলাতায়ালার খেদমতে নিজেকে সাহসের সহিত সর্বদা প্রস্তুত রাখিও। আজকের দিনটি হইতেছে কাজের দিন, আর আগামী কালকের দিন পুরস্কারপ্রাপ্তির দিন। কাজের সময় পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায় বসিয়া থাকা আসলে নিজেকে পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার নামান্তর। খেদমত করার মধ্যে সুখানুভূতির অনুসরণকারী হইও না। যদি সে সুখী হইয়া আনন্দ দান করে তাহা নিয়ামত স্বরূপ, যদি না দেয় তাহা হইলে আনুগত্যের বন্ধনকে কখনও শিথিল করিও না।

ইবাদত-বন্দেগীর জন্য এমনভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইবে যাহা প্রবৃত্তিজাত খেয়াল ও খুশীর বিপরীতধর্মী হইবে। সেখানে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের কোন আকাঙ্ক্ষা মনের কোণে উঁকি দিবে না। দাসত্বের মধ্যে যে আনন্দের স্বাদ কৃপাবশতঃ দান করা হয় তাহার আশ্বাদই আলাদা- প্রবৃত্তিলব্ধ (নফসের) কামনা-বাসনার কোন প্রবেশাধিকার সেখানে নাই।

সেই আনন্দের অনুভূতি ও তৃপ্তির স্বাদ কেবলমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁহার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন আনুগত্যকারী যদি তাহা না পায় তবু সে আনুগত্যের পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে না। সেই বশ্যতা ও আনুগত্য লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং মুক্তির আশায় আল্লাহর রহমতের প্রতি মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। এই আনুগত্যকেও তাঁহার রহমতের প্রভাব ও সুফল বলিয়া মনে করিবে এবং আনুগত্যের এই সম্পর্ককে তাঁহার অনুগ্রহের দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। নিজ শক্তি সামর্থ্যকে কদাপি এই বিষয়ের সহিত এখতিয়ারভুক্ত করিও না; অহঙ্কার ও আত্মগরিমা হইতে দূরে সরিয়া থাকিও। যদি কখনও শক্তি সামর্থ্যকে নিজের দিকে ফিরিয়া আসিতে দেখ (এবং সেগুলিকে নিজস্ব বলিয়া মনে কর) সেক্ষেত্রে লজ্জিত ও অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আনুগত্য করার সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে হইবে। নিজ আনুগত্যকে কখনও সেই মহান ও পবিত্র দরবারের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে না। অন্তরের এই অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা ধীরে ধীরে আত্মগরিমা ও অহঙ্কারজনিত অবস্থার জন্য চিকিৎসার কাজ করিবে এবং সৎকর্মসমূহকে কবুল করার যোগ্য করিয়া তুলিবে। কোন এক বুজুর্গ বলিয়াছেন- সৎকর্ম কর এবং সেই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। এইভাবেই দাসত্ব করিতে হয়।

হে আল্লাহ, আপনার রহমত আমার গুনাহ হইতে অনেক বেশী; এবং আমার আমল অপেক্ষা আমি আপনার রহমতের অধিক প্রত্যাশী।

দিলাম তোমাকে আমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের
দিক-চিহ্ন আর পূর্ণ পরিচয়-
যদি না পারি পৌছাতে কখনো সেখানে আমি
পৌছে যাবে হয়ত তুমি নিশ্চয়।

ওয়াস্ সালাম।



মাওলানা হোসেন আলীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৯

প্রশংসা, দরুদ ও দ্বীনের দাওয়াতের পর প্রার্থনা করিতেছি যে, ভাই হোসেন আলী মাওলানার সৌভাগ্য যেন বিকশিত হইয়া উঠে। এখানকার ফকিরগণের অবস্থা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসার যোগ্য। বহুদূরে অবস্থানকারী আমার বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিতেছি।

তোমার উচিত, তুমি যখন যেরকম অবস্থায় থাকনা কেন তাহা লিখিয়া জানাইবে। নিজের সময়ের প্রতি সবসময় লক্ষ্য রাখিবে এবং তাহা অত্যন্ত জরুরীভাবে করণীয় কাজগুলির জন্য কাজে লাগাইবে। অন্তরালে ও সর্ব সমক্ষে ধর্মভীরুতার সহিত থাকিবে। যৌবনের সামর্থ্যকে আনুগত্যের মধ্যে মশগুল রাখিবে। জাগরণের মাধ্যমে রাত্রিকে জীবিত করিয়া তোলা, আল্লাহর দান ও প্রাচুর্যের উপকরণ বলিয়া মনে করিবে। নির্জন রাত্রির অন্ধকারকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোল— স্মরণে ও ধ্যানে, অন্তর্নিহিত ক্রন্দনের বিলাপে, নিজ কৃতকর্মের আক্ষেপে এবং সেইসঙ্গে কবর ও কিয়ামতের জন্য চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। মোটকথা সুনুতকে কোন সময়ের জন্য হাতছাড়া করিবে না। ধর্মের যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও কুসংস্কার হইতে যেমন দূরে থাকিবে, তেমনি যাহারা ঐসব কাজ করে তাহাদের (বেদাতীদের) নিকট হইতেও সর্বদা দূরে সরিয়া থাকিবে। অবিরত চেষ্টা করিবে যাহাতে অপরিচিতির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রাজ দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জন করিতে পার। মোদ্দাকথা, মুক্তি যদি তোমার নিকট বাঞ্ছিত ও কাংখিত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাসমূহকে নিজ ইচ্ছাগুলির উপর প্রাধান্য দিবে এবং নিজেকে সমস্ত কিছু হইতে সম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে করিবে। ইহাই হইতেছে তাঁহার দাসত্ব করিবার নিয়ম।

“তিনি সকল দুঃখকষ্টের নিরসনকারী, যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা করিতে সক্ষম এবং প্রার্থনার জবাব দানে তিনি অতি তৎপর।”

আশা করি এই দীন-হীনকে শেষ পরিণামের জন্য শান্তির সহিত প্রার্থনা দ্বারা স্মরণ রাখিবে। অদৃশ্য প্রার্থনা কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী হইয়া থাকে।



খাজা মোহাম্মদ ফারুকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৩০

মানব জাতিকে সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, আদমসন্তানগণ তাহাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও সঠিক জ্ঞান লাভ করিবে। আর তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে হইলে সেই পরিচয়ের জন্য নিজেকে বিলীন করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা প্রকৃত পরিচয় (মারেফাত) লাভ করা যায় না। আমাদের মত পথভ্রান্ত ও বিচ্যুত মানুষের জন্য যাহা সর্বাধিক জরুরী তাহা হইতেছে, এই অমূল্য জীবনকে মারেফতের সেই দৌলত হাসিল করিবার জন্য সর্বাঙ্গিকভাবে নিয়োজিত রাখা এবং এই নশ্বর জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া চিরস্থায়ী মূলসত্য অমরত্বের দিকে জীবনকে প্রধাবিত করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মানুষের নিকট হইতে যাহা চাওয়া হইয়াছে অর্থাৎ যাহা করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে তাহারা তাহা প্রতিপালন না করিয়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। এমনকি, এমন সব বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠিত করিবার পিছনে লাগিয়া থাকে যাহার কামনা ক্ষতিকারক এবং জীবনের মূল্যবান মূলধন সময়কে ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসসমূহ অর্জন করিবার কাজে ব্যস্ত রাখে। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, “আনন্দ-উল্লাসময় আয়েশী জিন্দেগী হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ, কেননা আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দাগণ আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্মৃতির জন্য কখনও পাগল হন না।”

ইহা খুবই লজ্জার কথা যে, মানুষ এই অনিত্য জীবনের স্বল্পপরিসর সময়ে প্রকৃত আরাধ্যবস্তুর আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে না—তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলে না যে, এই তো আমি তোমার আরাধনার জন্য হাজির হইয়া আছি, লাঝ্বায়েক, লাঝ্বায়েক। পরিণামে যবনিকা শেষে ভয়ানক দোজখের যে ভয়ঙ্কর শাস্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিজেই নিজেকে নিষ্কিণ্ড করে এবং সান্নিধ্যও মিলনের পুতঃ আশ্বাদ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

“অতঃপর তাহার জন্য আক্ষেপ, যে আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং আপেক্ষ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যায়।”

ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, দ্বিতীয়বারের মত এই পৃথিবীতে আর কেহ আসিবে না।

“যে ব্যক্তি এই জগতে অন্ধ হইয়া থাকিল পরকালেও (আখেরাতেও) সে অন্ধ হইয়া উঠিবে এবং সে চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্ট ।”

সে যে আমার চেনে ওগো, সবকিছু মোর জানে,
কী করি আর কোথায় থাকি সব খবরই রাখে
চেনে জানে বলে যে গো ভয় তো আমার সেইখানে
থাকত না যে দুঃখ কোন না চিনিলে এই আমাকে

আসল কথা হইতেছে, কাজ করিতে হইবে । তর্ক-বিতর্ক কিংবা বাদানুবাদ দ্বারা কোন পথ পাওয়া যায় না । আশা করি, বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই দীনহীনের প্রতি তাওয়াজ্জাহ ও দোয়ার জন্য ওখানকার সৎকর্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিবে । ওয়াসসালাম ।



মিরযা লুৎফুল্লাহর নিকট
লিখিত । মকতুব নং-৩১

বিসমিল্লাহীর রহমানির রাহীম- আরম্ভ করিতেছি মহান দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে । আলহামদু লিল্লাহি ওয়াসালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার, আর তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম ।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি । যৌবনে, আনন্দ উল্লাস ও ভোগ-বিলাসের কালে যদি প্রকৃত ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা অন্ধকার অন্তরের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সেই নিত্য ও চিরন্তন প্রেমাস্পদের ইশকে আত্মার সৌভাগ্য প্রকাশিত হইতে থাকে, তবে তাহা হইবে সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশতি নিয়ামত (অনুগ্রহ) । অলি-আল্লাহ ও ফকির-দরবেশগণের সহিত ভালবাসা রাখা সেই মূল ভালবাসারই নিদর্শন । আবার তাঁহাদের সহিত ভালবাসার সম্পর্ক রাখার বিষয়টি হইতেছে, সত্যিকার অর্থে প্রকৃত ভালবাসার স্পষ্ট দলিলস্বরূপ । পীর আনসার কুদ্দিসা সিররুহ বলিয়াছেন, “হে আল্লাহ, তুমি তোমার বন্ধুগণের সঙ্গে লেনদেনের কী আশ্চর্য ধরন যে জুড়িয়া রাখিয়াছ, যাহার ফলশ্রুতিতে যে তাঁহাদেরকে চিনিতে পারিয়াছে সে তোমাকে পাইয়াছে এবং যে পর্যন্ত সে তোমাকে পায় নাই সে পর্যন্ত তাঁহাদেরকে সে চিনিতে পারে নাই ।” এই দলের সহিত যাহারা ভালবাসা স্থাপন করে তাহারাও এই দলের সঙ্গী বিশেষ । “যে লোক যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গী” এই হাদিস তুমিও শুনিয়া থাকিবে ।

হে সৌভাগ্যের চিহ্নধারী, যৌবনকালের এই মৌসুম এবং বর্তমানের এই অবসরকে আল্লাহর দান বলিয়া মনে করিও আর প্রকৃত মাওলার আনুগত্যের জন্য যৌবনের এই সময়কে খরচ করিও। এই সময়টা কাজ করিবার জন্য প্রকৃষ্ট সময়। অন্যথায় কেবল ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া জীবন অতিবাহিত করা ও চলিয়া যাওয়াতে অথবা বার্ষিকের সামর্থ্যহীন দুর্বল সায়াহে আর কাজের কাজ কী হইতে পারে? হাদিস শরীফে আছে, “সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহতায়াল্লা নিজের ছায়ার মধ্যে সেই সময়ে আশ্রয় দান করিবেন যখন কেবলমাত্র তাঁহার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকিবে না। সেই (৭) শ্রেণীর মানুষ হইতেছে :- (১) ন্যায় বিচারক নেতা (২) এমন জওয়ান যে আল্লাহতায়াল্লা এর এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে রত থাকিয়া ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করিয়াছে (৩) এমন ব্যক্তি যাহার অন্তর মসজিদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিত (৪) এমন দুইজন লোক যাহারা কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে মিল-মহব্বত রাখিত, আল্লাহর প্রতি ভালবাসার খাতিরে তাহারা একসঙ্গে সমবেত হইত এবং সেই একই কারণে নিজ নিজ গৃহে ফিরিবার জন্য পৃথক হইয়া যাইত (৫) সেই ব্যক্তি যাহাকে প্রভাবশালী অভিজাত ঘরের কোন রূপসী রমণী খারাপ কাজের জন্য আমন্ত্রণ জানায় আর সে তাহার প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া বলিয়া দেয় যে, আমি ভয় করি আল্লাহকে (৬) সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নামে (প্রচুর) দান-খয়রাত করে গোপনীয়তার সঙ্গে— এমনকি দান হাত দ্বারা যাহা সে দান করে তাহার খবর বাম হাতকে পর্যন্ত জানিতে দেয় না এবং (৭) সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে বসিয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বহিতে থাকে। (বোখারী, মুসলিম)।

চেষ্টা কর, যাহাতে শুভ পরিণামবাহী (শেষের) ছয়টি আমলের উপর কায়েম থাকিতে পার এবং ইমামের (ধর্মীয় নেতা যাঁহারা নবী করিম স. এর পরে ধর্মে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন) প্রতিনিধি হিসাবে আদালতে নিজেকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পার। ইহা ভালভাবে জানিয়া রাখিবে যে, আমাদের বুজুর্গগণের এই তরিকা হইতেছে সুন্নতের প্রতি অনুগত থাকা, বেদাত (ধর্মে কোন বিকৃতি বা রদবদল) হইতে দূরে সরিয়া থাকা এবং মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহর নিকট নিজ অসহায়তা ও অস্তিত্বহীনতার দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে তাঁহার মনোযোগ ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে অবস্থান করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর বর্জনকে অর্জন করিতে হইবে— এমনকি সর্ব প্রকার বস্তুজাত জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষার সম্পর্কও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং এক আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় বস্তুর দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। মন কদাপি বিষয়-বৈভব-অর্থ-সম্পদ-বস্তু-সামগ্রীর খুশীতে উচ্ছল কিংবা তাহার শোকে কাতর হইবে না। এমনকি ঈঙ্গিত মূলসত্যের সহিত নিজ অন্তরের উপস্থিতির খবর এইরকম হইবে যেখানে পরে আর কোন গোপনীয়তা থাকিবে না।

এমন ধরনের কোন উপস্থিতির সম্পর্ক নয়, যাহার পর কোন অনুপস্থিতি থাকিবে— তাহা বুজুর্গ ও মহাত্মাগণের নিকট বিশ্বস্ত নহে। যে পর্যন্ত না সেই উপস্থিতির সমাচার নিজের যোগ্যতা ও গুণের সমন্বয়ে একাত্ম হইয়া যায়— যেমন, শ্রবণ করা হইতেছে শ্রবণ শক্তির গুণ এবং দেখা হইতেছে দৃষ্টিশক্তির গুণ— সেই অবধি এই অভিজাত সম্পর্ক প্রতিবিম্বিত হইবে না ও তাহার সম্পর্কে ধারণা করা যাইবে না।

আমি তো কেবল বুজুর্গগণের তরিকা কীভাবে হাসিল করিতে হয় সেই সম্পর্কে বলিয়াছি— প্রকৃত সত্য তো এই আলোচনার বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। ইহা এমনই রহস্যময় যে, এই ধরনের আলোচনা দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করা অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। “যে ইহার আশ্বাদ গ্রহণ করে নাই সে ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই।” সাধু-সজ্জনদের স্বল্পকালীন সাহচর্য দ্বারা ইহার আশ্বাদন ক্ষমতা ও প্রেমের ব্যাপ্তি লাভ করা খুবই কঠিন— ইহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ওয়াস্ সালাম।



মীর মোহাম্মদ নোমান আকবরাবাদী র.
এর নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩২

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

এই পত্রখানি একটি স্মরণীকা। সম্মানিত জ্ঞানী বন্ধুগণের প্রতি এই ভগ্ন-হৃদয় নগণ্য ফকিরের আরজ— ‘হে অন্তর চক্ষুর মালিকগণ, তোমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা কর।’ মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিচয় সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা— তাহা ভালভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এই বিষয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সূফী-সাধকগণ এই বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে যে একমত পোষণ করেন এবং নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অবধারিতরূপে যাহা অত্যন্ত জরুরি হিসাবে তাঁহাদের নিকট বিবেচিত— তাহা হইতেছে, পরিচয়ের মধ্যে বিলীন হওয়া ব্যতীত মারেফত প্রকাশযোগ্য ও শুদ্ধ হয় না।

না পারিলে এবাদতে নিজ অস্তিত্ব করিতে
তুমি সম্পূর্ণ বিলীন
পাবে না খুঁজিয়া কভু আল্লাহর দরবারে
যেতে পথ কোনদিন।

বুদ্ধিমান বন্ধুগণের জন্য জরুরী হইতেছে, কাজ হাসিল করা ও নগদ রোজগার করিবার বিষয়ে যেন তাহারা ভালভাবে চিন্তাভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করে। যে কেহ এই আধ্যাত্মিক গুণ লাভ করিতে পারিয়াছে “তাহার জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ।” তাহার উচিত সে যেন মারফতের এই সফলতাকে তাহাদের জন্য কাজে লাগায়, যাহারা তাহা লাভ করিতে পারে নাই। যে ব্যক্তির জন্য এখনও পর্যন্ত মারফতের পথ উন্মুক্ত হয় নাই এবং এই দৌলতের জন্য অনুসন্ধানের ব্যাপারে যাহার কোন দরদ নাই “তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃসংবাদ।” কেননা, মানবজাতি হিসাবে তাহাকে সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সে সম্পন্ন করে নাই এবং দুনিয়াতে তাহার নিকট হইতে যে জিনিস চাওয়া হইয়াছিল তাহা সে পরিপূর্ণ করে নাই। নিজের খায়েশ-খুশী ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কাজে জীবনের মূল্যবান সময়কে ব্যয় করিয়াছে এবং পূর্ণ যোগ্যতা সত্ত্বেও উর্বর মানব জমিনকে সে হেলাফেলায় নষ্ট করিয়াছে।

টীকাঃ নিজ সন্তানগণ ব্যতীত, মীর মোহাম্মদ নোমান আকবরবাদী ছিলেন হজত মোজাদ্দের আলফে সানি র. এর প্রথম খলিফা। তাঁহার পিতার নাম ছিল সৈয়দ শামসুদ্দীন এহিয়া- যিনি মীর বুজুর্গ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। মীর মোহাম্মদ নোমান ৯৭৭ হিজরিতে সমরখন্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্নে আদিত্ত হইয়া হজরত ইমামে আজম র. এর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার নাম নোমান রাখা হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে দরবেশশুলভ কার্যকলাপ পরিদৃষ্ট হইত। তখন হইতেই তিনি ফকীর দরবেশগণের নিকট যাওয়াত করিতেন। হিন্দুস্তানে আসার পর তিনি বহু সাধু-দরবেশের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। এমন কি হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ নকশবন্দী দেহলবী র. এর খেদমতে তিনি দিল্লী আসিয়া পৌছেন এবং তাঁহার মধ্যে সীমাহীন সৌন্দর্য ও দয়ার সমাবেশ দেখিয়া তিনি নকশবন্দীয়া তরিকায় দাখিল হন। হজরত খাজা র. যখন হজরত মোজাদ্দের র. কে বায়াত ও হেদায়েত করিবার অনুমতি প্রদান করেন এবং নিজের মুরিদদিগকে তাঁহার উপর সোপান করেন, তখন সেই মুরিদগণের মধ্যে মীর মোহাম্মদ নোমানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যখন হজরত মোজাদ্দের র. এর খেদমতে হাজির হন তখন হজরত মোজাদ্দের র. তাঁহাকে বলেন, “তুমি আমাদেরই একজন। কিন্তু আরও কিছুদিন তুমি আমাদের পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা র. এর খেদমতে থাকিয়া যাও” হজরত খাজা র. এর ইন্তেকালের পর যখন হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি র. দিল্লীতে তশরীফ আনেন তখন মীর সাহেব তাঁহার খেদমতে একটি লিখিত আরজি পেশ করেন, যাহাতে তিনি তাঁহার মনে অসহায় অবস্থা, দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতা সম্পর্কে জানান এবং সেইসঙ্গে ইহাও লেখেন, আমি হজরত সাইয়েদুল মুরসালীন হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর, একমাত্র ইহা ব্যতীত নির্ভর করিবার মত আমার নিকট আর কোন ওসিলা নাই। তাঁহার এই লিখিত আরজি পাঠ করিয়া হজরত মোজাদ্দের র. এর অন্তর ভাবাবেগে আপ্ত হইয়া উঠে এবং তিনি বলেন, “মীর তুমি কোন চিন্তা

বর্ণনা করা হইয়াছে, ওস্তাদ আবুল কাসেম কুশায়েরী রহমতুল্লাহ আলাইহি একদা হজরত বু আলী দাক্কাক কুদ্দিসা সিররুহকে, তাঁহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিতে পান যে, তিনি অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় আছেন এবং কাঁদিতেছেন। ইহার কারণ জানিতে চাহিয়া ওস্তাদ কাসেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘জনাব আলী; আপনার এই অস্থিরতা কি জন্য? আপনি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চান?’ উত্তরে বু’আলী তাঁহাকে জানান, “হ্যাঁ, তাই চাই। কিন্তু শুধু উপদেশ দিবার জন্য নয় এবং এই জন্যও নয় যে, সেখানে মজলিস জমাইব; বরঞ্চ এই জন্য যে, সেখানে যাওয়ার পর লাঠি হাতে প্রস্তুত হইয়া যাইব এবং সমস্ত দিন ধরিয়া প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে হাজির হইয়া হাতের লাঠি ও দরজার শিকল দ্বারা দরজাগুলি খটখট করিয়া লোকজনদের ডাকিয়া তুলিব এবং বলিব, ‘হে লোকসকল, এমনভাবে গাফেল হইয়া থাকিও না— তোমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছ না যে, কোন আসল জিনিস হইতে তোমরা গাফেল হইয়া আছ।

বলে দেব গৃহবাসী প্রভুদের সাবধান করে

এখনো কিসের আশায় রয়েছ অঘোরে তোমরা

মোহাচ্ছন্ন বেখবর?

দুনিয়ার লোভে মেতে শত ভাবনায় ছুটাছুটি

করেছ জনম ভোর,

এবার স্বীকার করে নিজের সকল দোষত্রুটি

নেমে পড় বাকী জীবনটা নিয়ে সৎকাজে

সহজ মুক্তির খোঁজে।

করিও না।” পরে তিনি নিজের সঙ্গে তাঁহাকে সেরহিন্দে লইয়া আসেন। সেখানে তিনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মোজাদ্দেরিয়া আস্তানায় অবস্থান করেন এবং উচ্চ স্তরের মাকামসমূহের আনুকূল্য লাভ করিয়া ধন্য হন। অবশেষে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়া বরহানপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মীর সাহেব দুইবার বিভিন্ন অজুহাতে বরহানপুর শহর হইতে চলিয়া আসেন; কিন্তু তৃতীয়বারেও তিনি বরহানপুর যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হন। এইবার তিনি বরহানপুর আসিয়া পৌঁছাইলে তিনি সেখানকার রূপ ও পরিবেশের পরিবর্তন দেখিতে পান। তখন হইতে তাঁহার মজলিশে বিশ্রামের অবস্থাসমূহের প্রকাশ ঘটিতে থাকে।

অনেক লোক তাঁহার নিকট নকশ্বন্দীয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছিলেন। বহু পাপী ও অসৎ ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে সংশোধিত হওয়ার পর সৎ ও ধার্মিক জীবনযাপনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ‘জবদাতুল মাকামাত’ গ্রন্থ-প্রণেতা মাওলানা মোহাম্মদ হাসেম কাশমী র. তাঁহারই প্রদর্শিত পথে হজরত মোজাদ্দেরি আলফে সানি র. এর নিকট শিষ্যত্ব ও মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। যদিও পুণ্ডিগত জাহেরী বিদ্যা তিনি খুব কমই জানিতেন তথাপি হজরত মোজাদ্দেরি র. এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়সমূহ বুঝিবার ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। স্বয়ং হজরত মোজাদ্দেরি র. আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পর্কে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। মকতুবাতে মোজাদ্দেরিয়ার মধ্যে তাঁহার নামে বহু মকতুব রহিয়াছে। (জবদাতুল মাকামাত)।

অতএব আমাদের মত বিদ্রাস্তজনদের জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, মূল্যবান জীবনকে তাহার প্রকৃত তাৎপর্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অতিবাহিত করি এবং এই নশ্বর জীবনকে আল্লাহুতায়ালার অসীম জ্ঞান ও রহস্যের জগতে নিয়োজিত রাখার ইচ্ছা পোষণ করিয়া সর্বাস্তুরণে তাহা কবুল করিয়া লই; সত্যবাদীদের স্বভাব-চরিত্র এবং পুণ্যাত্মাগণের প্রশংসা ও গুণাবলী দ্বারা এই গুঢ়তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও হাদিসের ব্যাখ্যা খুঁজি; এই জ্ঞানরহস্যের বিষয়গুলিকে আমল করার জন্য তাহার অনুসন্ধানের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা করি এবং যে কোন স্থান হইতে যদি তাহার খোশবু আসিয়া পৌঁছায় তাহার সন্ধানে যেন সেখানে উপস্থিত হই। পাওয়ার আশায় পাতিয়া রাখা লালসার হস্ত যদি এই ধনাগারের নগদ প্রাপ্তি হইতে খালিও থাকে, তবুও তাহার সন্ধান হইতে ও তাহাকে হারানোর ব্যথা হইতে যেন কখনও বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ি এবং যাহারা অবাধ্য তাহাদের দলের বাহিরে যেন থাকিতে পারি।

কোন এক দরদী কী সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ

খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছ—

চোখ দুটি শুধু তোমারে খুজিয়া মরে

মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

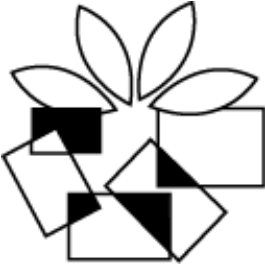
ওয়াস্ সালাম।

তাজকিরাতুল আশিয়া গ্রন্থের বর্ণনা মতে, তিনি আকবরাবাদে (আধ্বায়) ১০৫৮ হিজরিতে পরলোক গমন করেন। কিন্তু তারিখে মোহাম্মদী (রেজা লাইব্রেরী, রামপুর) গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি ১৮ই সফর ১০৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। কেহ কেহ ১০৬১ হিজরিতে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে তাঁহার ওফাতের তারিখ ১৮ই সফর ১০৬০ হিজরি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।



মোহাম্মদ ফারুক্কের নিকট লিখিত ।
(খাজা আবদুল গফুর সমরখন্দীর পুত্র)
মকতুব নং-৩৩

উন্নতিকামী ও সৌভাগ্যের পরিচয় বহনকারী, তোমাকে দোয়া জানাইতেছি ।
দ্বীনের এলেম ও জ্ঞান অর্জন করিয়া তুমি বাগী হওয়ার চেষ্টা কর । তোমার সকল
কার্যকলাপ যাহাতে এলেম অনুযায়ী হয় তাহার জন্যও চেষ্টা ও পরিশ্রম করিও ।
বেআদব, বিভেদ সৃষ্টিকারী ও পথভ্রষ্ট বেদাতী ব্যক্তিগণের সহবত হইতে নিজেকে
দূরে রাখিও । তুমি যে সংযোগ (নেসবত) গ্রহণ করিয়াছ, তাহার মধ্যে নিজ অন্তরকে
পরিপূর্ণ রাখিও; তাহার অধ্যাবসায়ে রত থাকিও এবং যাহাকিছু সেই অধ্যাবসায় ও
স্থায়ীত্বের পরিপন্থী তাহা বর্জন করিও । সত্যি, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার যে কি সুন্দর
নেয়ামত, যাহার বাহিরের সবকিছু শরীয়তের আদেশ-নির্দেশ দ্বারা সুসজ্জিত এবং
ভিতরের সবকিছু উন্নত সম্পর্ক (নেসবত) দ্বারা সমৃদ্ধ । তোমার বড় ভাইয়ের
সহবতকে মূল্যবান ও মর্যাদাদায়ক বলিয়া মনে করিবে । তাহার মজলিশের সহিত
নিজের সংশ্রব রাখিবে এবং যেভাবে সে পরিচালনা করে তাহার প্রতি তুমি
যথাসাধ্য মনোযোগ দিবে । নিজ অবস্থার কথা সকল সময় লিখিতে থাকিবে এবং
ফকিরদের এই সম্পর্কের সহিত নিজেকে কায়ম রাখিবে । ওয়াস্ সালাম ।



খাজা মোহাম্মদ ফারুক্কের নিকট
লিখিত । মকতুব নং-৩৪

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম- পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌তায়ালার নামে
আরম্ভ করিতেছি । রসুলে করিম স. এর উপর এবং দৃঢ়ভাবে তাঁহার তরিকা
অনুসরণকারীগণের উপর অশেষ দরুদ ও সালাম ।

জানিতে পরিলাম যে, তুমি সময়ে নিজেকে বাগী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার
চেষ্টা করিতেছ এবং সাধ্যমত অর্থহীন কাজে নিয়োজিত থাক না । ইহার জন্য

আল্লাহুতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সত্যিই ইহা এক আশ্চর্য নেয়ামত যে, এই যৌবনকালে সহায়-সম্পদে ভাগ্যবান হওয়া সত্ত্বেও সেই পবিত্র সত্তার দিকে মনোযোগ রাখিতেছ এবং সেইসঙ্গে সকল সময় একাগ্রচিত্ততার জন্য চেষ্টা করিতেছ। এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং এই ঐশী দান যাহাতে আরও অধিক মাত্রায় লাভ করিতে পার তাহার জন্য চেষ্টা কর। আল্লাহুতায়ালার বলেন— ‘তোমরা শোকর আদায় (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিলে আমি তোমাদের জন্য নেয়ামত আরও বর্ধিত করিয়া দিব।’

ইহা জানিতে হইবে যে, আকৃতিগত একাগ্রতা যাহা কেবল বাহ্যিক দিক হইতে সম্পর্কযুক্ত, তাহা এই মৌলিক নেসবতেরই (সম্পর্কেরই) প্রভাবে হইয়া থাকে— যাহার নিয়ামক সেই অদৃশ্য বাতেন। তবে ইহা এমন নহে যে, অদৃশ্য সংযোগ (নেসবতে বাতেন) পূর্ণমাত্রায় বাহ্যিকভাবে উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইয়া যাইবে। ইহা এই কারণে যে, অদৃশ্য সংযোগ হইতেছে সেই নির্দিষ্ট মনজিলের জন্য প্রেমিকস্বরূপ আর বাহ্যিক অবয়ব হইতেছে তাহার প্রেমিকাসদৃশ্য এবং সেই প্রেমিকার বন্ধনে প্রেমাস্পদ সহজে ধরা দেয় না। মনোহর ইঙ্গিত ও প্রেমের বিচিত্র লীলাখেলা হইতেছে প্রেমিকের জন্য প্রেমউদ্দীপক উপকরণ। প্রণয়াসক্ত প্রেমিকা প্রেমের ব্যাপারে যত বেশী আশান্বিতা ও ব্যাকুল হইয়া উঠে, প্রেমিক সেই পরিমাণে তাহার প্রেমের কলাকৌশল বাড়াইয়া দেয়। অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে, বাহ্যিক অবয়বধারীরূপ যত বেশী অশরীরী অরূপ-রতন-মানসে নিজেকে উৎসর্গ করিতে থাকে এবং তাহার সমৃদ্ধির জন্য আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অরূপের নাগাল পাওয়ার জন্য যত বেশী চেষ্টা করে, অশরীরী অরূপ তাহার নিকট তত বেশী অপরিচিত হইয়া যাইতে থাকে এবং সুদৃশ্য অবয়বধারী রূপের বাহু-বন্ধনের নাগাল হইতে তত দূরে সরিয়া যাইতে থাকে।

বাহ্যিক আনুগত্য ও সাধনা, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও সজীবতাকে সমৃদ্ধ করিবার উপায় ও উপকরণ। লক্ষণীয় যে, বাহ্যিক প্রচেষ্টাসমূহ অদৃশ্য বন্ধুত্বের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে— যেহেতু প্রেমের গর্ব ও অমুখাপেক্ষিতা তাহার প্রয়োজনীয় উপাদান— সফলতার শেষপ্রান্তে পৌছাইয়া দেয়। এই কারণেই শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার পর সেই অদৃশ্য সংযোগ নিজ জ্ঞান ও বোধশক্তির সীমানার বাহিরে চলিয়া যায়।

জনৈক বুজুর্গ বলিয়াছেন, অদৃশ্য যোগাযোগ যত অজানা থাকে তত সুন্দর। সিদ্দীকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন—

“জ্ঞানের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্পর্কে অসামর্থ্য প্রকাশ করাও জ্ঞানের পরিচয়।” বাহিরের এই তৃষ্ণা ও অপ্রাপ্তি সেই অবধি থাকে যে পর্যন্ত বাহ্যিক কার্যকলাপ কায়ম থাকে। বাহ্যিক শৃঙ্খলার মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা ও বিপত্তি দেখা দিবে এবং তাহার মহাপ্রস্থানের ধ্বনি উচ্চকিত হইয়া উঠিবে, গোপন অভ্যন্তর তখন ময়দান খালি পাইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ্যে পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।

ইহা এই জন্য যে, ভিতরের পর্দা যাহা বাহিরের সম্পর্কের সহিত যুক্ত ছিল, তাহা অপসারিত হইয়া গিয়াছে এবং যেহেতু মৃত্যু হইতেছে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায়, এই জন্য এই সময়ে যে অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তাহা উত্তম ও সুন্দর— এমন কি তাহা প্রতিবিশ্ব হইতে দূরে এবং মূলের অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকে। আর যেহেতু ঘুমের সহিত মৃত্যুর ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান, এই হিসাবে কোন কোন ভাগ্যবানের ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে এই ধরনের অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, যে অবস্থা মৃত্যুকালের অনুরূপ হইয়া থাকে এবং জাগ্রত অবস্থায়ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।

এই অধম অন্য একটি পত্রে বিশদভাবে এই বিষয় সম্পর্কে লিখিয়াছে, তাহা দেখিয়া লইবে।

যখন সাময়িক বিচ্ছেদের কাল শেষ হইয়া আসিবে এবং দীর্ঘস্থায়ী (মৃত্যু হইতে পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত) বিচ্ছেদের যবনিকা উন্মোচিত হইবে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ, ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ হাড়গোড় একত্রিত করা হইবে, হিসাব-নিকাশের বাধা-বিপত্তি ও ক্ষতির আশংকা হইতে সব কিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন (পাক-সাফ) হইয়া যাইবে— সেই সময়ে মৌলিক উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত দেহের আসল অবস্থায় নৈকট্যের দৌলত হাসিল হইবে এবং দেহ তখন এই আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিতে থাকিবে— “আমি চাই যে, আমার নিয়ামতকে আমি ঐ সমস্ত লোকদিগের জন্য বেশী করিয়া দিই যাহাদিগকে পৃথিবীতে দুর্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমি (এখন) নেতা করিয়া দিব এবং আমার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) বানাইব।”

এই হতভাগ্য শরীরের উপর যাহারা পার্থিব জগতের কঠিন আঘাতসমূহ সহ্য করিয়াছিল, অত্যাচারীর উৎপীড়ন বরদাস্ত করিয়াছিল, প্রতিকূল আদেশ ও নিষেধের চাপে পিষ্ট হইয়াছিল এবং দুঃসহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল ও পরে মাটির কবরের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, একাকী বিচ্ছেদের অনলে ও বাসনার জ্বালায় জ্বলিয়াছিল— অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে, ভরা মজলিশে সমস্ত লোকের সম্মুখে, তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের মসনদে বসানো হইবে এবং পূর্ণ মর্যাদায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া আনন্দ আহলাদে ভরপুর ও আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ সেই জগতের নেতা ও পুরোধা করা হইবে।

ইহার বিপরীত ব্যাপার পার্থিব জগতের জন্য। এখানে অভ্যন্তর (বাতেন) নৈকট্য লাভের ব্যাপারে প্রধান আর বহিরাঙ্গ (জাহের) তাহার অনুগত। অবশ্য এমন ব্যাপার হইবে না যে, বাতেনের নিকট হইতে সংযোগ কাড়িয়া লইয়া তাহা জাহেরের নিকট অর্পণ করা হইবে। না, তাহা নয়, বরঞ্চ অবস্থা এমন হইবে যে, অশরীরী বাতেন তাহার পূর্ণ মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সত্ত্বেও রূপময় অবয়বের (জাহেরের) প্রতি অনুগত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে এবং নিজ সংযোগকে তাহার (জাহেরের) সংযোগের বাহু-বন্ধনে একাকার হইয়া যাইতে দেখিবে।



মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত । মকতুব নং-৩৫

শুরু করিতেছি আল্লাহর নামে । যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য, রসুলে
করীম স. এর প্রতি দরুদ ও সালাম ।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি । আল্লাহপাকের কাছে হাজার হাজার
শোকর যে, ফকিরদের স্মরণ করা হইতে তুমি গাফেল হইয়া থাক নাই এবং
তোমার লক্ষ্যকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তুমি একমাত্র আকাজ্জিত বস্তুর দিকে
কেন্দ্রীভূত করিয়াছ । তুমি চিঠিপত্রে প্রায় মৃত্যুর প্রভাবজনিত আতঙ্কের কথা লিখিয়া
থাক । ইহা তো এমন এক শোক-দুঃখের ব্যাপার যাহা কবর পর্যন্ত সঙ্গী হইয়া
থাকে । কোন মুসলমানের পক্ষে এই দুঃখ-চিন্তা ভুলিয়া থাকা উচিত নয়- কম-
বেশী কিছু না কিছু তাহা থাকিতে হইবে । যাহার এই দুঃখ অধিকমাত্রায় আছে
তাহার জন্য ইহা পূর্ণ ঈমানের আলামত । তুমি সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা
পালন কর- “তোমরা শোকর আদায় করিলে আমি তোমাদের জন্য নেয়ামত
আরও বর্ধিত করিয়া দিব ।”

তুমি লিখিয়াছ যে, পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করার ব্যাপারে কোন সুসংবাদ তুমি
লাভ করিতে পার নাই । আল্লাহপাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যে, তুমি
পূর্ণ ঈমানের ব্যাপারে সুসংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছ- যেমন তুমি
লিখিয়াছ যে, সব সময় আল্লাহুতায়ালার নিকট তুমি অনুনয়-বিনয়ের সহিত প্রার্থনা
করিয়া থাক, যেন তিনি তোমাকে সামান্য পরিমাণ ঈমান নসীব করেন । বিশেষ
করিয়া রমযান মাসে যখন তুমি অসুস্থ ছিলে, তখন তোমার প্রতি এলহাম
হইয়াছিল যে, ‘আমার ভাঙারে কোন কিছুর কমতি নাই, তুমি পূর্ণ ঈমানের জন্য
প্রার্থনা কর ।’ সেই পরম দাতা ও দয়ালু যখন এই ধরনের বস্তু পরিপূর্ণতার সঙ্গে
তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিবার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করেন- যাহা তাঁহার নিকট
সর্বদা মজুদ আছে- সেক্ষেত্রে এই আদেশ তাঁহার করুণার দান ও বখশিশের
দলিল হইয়া যায় । এমনিতে বিশ্বাসের দৃষ্টিতেও যদি দেখ তবু সুসংবাদ প্রাপ্তির
খবর সঠিক, তবু যেহেতু একেবারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না (কেননা ওহী
বা প্রত্যাদেশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে) সেইজন্য প্রবৃত্তিজনিত সন্দেহ থাকিয়া যায় এবং
ভয় ও আশাও থাকে ।

তুমি তোমার মুরিদ সূফী মোহাম্মদ শরীফের দুর্ব্যবহারের বিষয়ে বারবার লিখিয়াছ। দেখ, সে যাহাকিছু বেআদবী ও অসম্মান করিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র তোমার সঙ্গে নয়, এই সিলসিলাভুক্ত সমস্ত বুজুর্গের সঙ্গেই করা হইয়াছে। তুমি তাহার পীর এবং তাহার উপর তুমি বিরক্ত হইয়াছ। সেক্ষেত্রে তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক কোথায়? সাধু-ফকিরদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা খুব কম থাকে। তোমার মুরিদকে এই সঙ্গে পৃথকভাবে এই ধরনের অসদাচরণের পরিণতি ও বিপদ সম্পর্কে দু-চার কথা লিখিয়া দিলাম। ইহাতে যদি তাহার বোধোদয় হয় তাহা হইলে উত্তম— অন্যথায় সে যাহা কিছু বুঝিবে বা করিবে তাহার প্রতিফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে।

তুমি জানিতে চাহিয়াছ, তোমার মধ্যে যে আত্মদাহীন নির্লিপ্ত অবস্থার প্রকাশ তাহা কি বুলন্দ হিম্মতের জন্য নাকি যোগ্যতার ক্ষেত্রে অপূর্ণতাজনিত কারণে? দেখ, অদৃশ্য সংযোগ যত বেশী উচ্চস্তরের দিকে পৌছাইতে থাকে তত বেশী অজ্ঞাত থাকিয়া তাহা বাহ্যিক বলয়কে স্বাদহীন করিয়া রাখে— কেননা রূপ ক্রমশঃ অরূপের নাগালের বাহিরে বহুদূরে থাকিয়া অপরিচিত হইয়া যায়। কোন আরিফ মারেফতের ক্ষেত্রে যত বেশী উর্ধ্বে আরোহণ করিবে, এই স্বাদহীনতার অবস্থা তাহার তত বাড়িতে থাকিবে এবং সেই অদেখার যত নিকটে আসিতে থাকিবে ততই যেন সে আরও দূরে, আরও দূরে সরিয়া যাইবে। ইহা যেন সেই রশি পাকানেওয়ালা এক শিষ্যের গল্পের মত, যে তাহার ওস্তাদকে বলিয়াছিল ‘আমি রশিতে যত বেশী পাক দিয়া যাইতেছি, আপনার নিকট হইতে তত বেশী দূরে চলিয়া যাইতেছি।’ তুমি লিখিয়াছিলে, তোমার এইরকম মনে হয় যে, সৃষ্টিসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করা কোন ব্যক্তির জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্তির দলিল হইতে পারে না। নিঃসন্দেহে তাহাই বটে, কারণ সৃষ্টিসমূহকে স্বীকার করা শ্রষ্টাকে স্বীকার করার দলিল নয়। কেননা, বাতিল বা মিথ্যাচার দ্বারাও কখনও কখনও সম্মান লাভ হইতে পারে— তাহা ইহলে সৃষ্টির মধ্যে এই প্রত্যাবর্তন কেমন করিয়া পূর্ণতার দলিল হইতে পারে? ওয়াস্ সালাম।

টীকাঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খলিফাগণের মধ্যে মাওলানা খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারী র. ছিলেন অন্যতম প্রবীণ খলিফা। তাঁহাকে খেলাফত প্রদান করিয়া পেশোয়ারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে জনসাধারণ তাঁহাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টায় বহু ব্যক্তি পথদ্রষ্টতার আবর্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মুক্তির তীরে পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেকে খেলাফতও লাভ করিয়াছিলেন।



শায়েখ মোহাম্মদ শরীফ কাবুলীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩৬

সকল প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার প্রেরিত রসুল স. এর প্রতি দরুদ ও সালাম।

ইহা জানিতে পারিলাম যে, তুমি তোমার পীর ও মোর্শেদ মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীককে ব্যথিত ও পীড়িত করিয়াছ। তাঁহার মান-মর্যাদা তুমি ক্ষুণ্ণ করিয়াছ। তাঁহার প্রতি তোমার দারুণ ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছে এবং তোমার আগেকার আমলসমূহ বদলাইয়া গিয়াছে। মাওলানা তোমার প্রতি এত বেশী নারাজ হইয়াছেন যে, তিনি তোমার নিকট হইতে সমস্ত কিছু ছিনাইয়া লওয়ার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। যে অখণ্ড মনোযোগ, অস্তিত্বহীন অবস্থা ও আল্লাহকে পাওয়ার আকুতি তোমার মধ্যে দেখা যাইত তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। পীর-মোর্শেদের সহিত যে সম্পর্ক তুমি ছিল করিয়াছ এখন কাহার সহিত তাহা জোড়া লাগাইবে? অত্যন্ত আফসোস যে, অনুগ্রহের জন্য ঋণ স্বীকার করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মত সাধারণ বোধটুকুও দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তোমার মত লোকের নিকট হইতেও যদি এই ধরনের রুঢ় আচার-আচরণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে অন্যান্য মানুষের উপর আর কতখানি ভরসা রাখা যায়। এইরূপ হইলে তো ভবিষ্যতে যে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া সৃষ্টজগতে স্বীকৃতি অর্জন করিবে অথবা নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বেশ কিছু ভাল বলিয়া মনে করিবে- সে অনুরূপভাবে তাহার পীর-মোর্শেদের নিকট হইতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিবে- ‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।’

টীকাঃ শায়েখ মোহাম্মদ শরীফ কাবুলী ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট হইতে খেলাফতপ্রাপ্ত হজরত মাওলানা খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারী র. এর খলিফা। তাঁহার পীর ও মোর্শেদ তাঁহার উপর একসময় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পীরের নিকট হইতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। (রওজাতুল কাইউমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড)।

অথচ তাহার পরিবর্তে তো এইরকম হওয়া উচিত ছিল যে, এই ধরনের উন্নতির লক্ষণসমূহ দেখা দেওয়ার পর মোর্শেদের সঙ্গে তাহার ভালবাসার সম্বন্ধ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আরও অধিক হইতে থাকিবে এবং বিনীত ও নমনীয় মনোভাব আরও বহু গুণে বাড়িয়া যাইবে। কেননা, এই রূহানী দৌলত এবং তাহার পবিত্রতা ও স্বীকৃতি কেবলমাত্র মোর্শেদের নূর ও বরকতের গুণেই পাওয়া যায়— কোন রকম অশোভন আচরণ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ সেখানে ঘটবে না। জনৈক দরবেশ বলিয়াছেন, “কোন ব্যক্তি যদি তোমার মোর্শেদকে অসন্তুষ্ট করে আর সেই ব্যক্তির সহিত যদি তুমি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখ, তাহা হইলে সে তোমা অপেক্ষা অনেক উত্তম।” আর মুরিদ খোদ যেখানে তাহার মোর্শেদকে দুঃখ দেয়, তাহার কথা আর না বলাই ভাল। তুমি যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তাড়াতাড়ি নিজ অপকর্মের প্রতিকার কর এবং যেমন করিয়া পার মাওলানাকে সন্তুষ্ট কর। ইহা ছাড়া আর অন্য কোন বিকল্প নাই। যদি মাওলানা সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমরাও সন্তুষ্ট— অন্যথায় আমরাও তোমার প্রতি নারাজ। আমাদের সন্তুষ্টি মাওলানার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।

কোন এক ব্যক্তি জানাইয়াছিল যে, তোমার নাকি সেরহিন্দে আসার ইচ্ছা আছে। কিন্তু মাওলানাকে সন্তুষ্ট করিয়া না আসিলে তোমার সিরহিন্দ আসা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। তবু যদি এখানে আস, তাহা হইলে পুনরায় পেশোয়ারে ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে (মাওলানা সিদ্দীককে) সন্তুষ্ট করিতে হইবে। মাওলানা যখন লিখিবেন যে, আমি অমুকের উপর সন্তুষ্ট আছি, তখন আমরাও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাইব— তুমি সেরহিন্দে আস অথবা না আস। যাহা কিছু লিখিলাম তাহা তোমার মঙ্গলের জন্যই, সে জন্য মনে কিছু করিও না।

যাহা কিছু ভাল আমি করিয়াছি মনে
জানায়েছি লিখে তাহা তোমার নিকটে,
সৌভাগ্য লভিতে পার সুশিক্ষা গ্রহণে
হও যদি ক্ষুণ্ণ তাহা মন্দ অতি বটে।

উপদেশ সাধারণতঃ তিক্ত ও বিষাদ হইয়া থাকে— কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান যে এই তিক্ততাকে কৃতজ্ঞতায় রূপান্তরিত করিতে পারে এবং তাহার মৌলিক আশ্বাদ গ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে।



মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ৩৭

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম- পরম মেহেরবান ও দয়াবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। তোমার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মোল্লা মোহাম্মদ শরীফ কাবুলী সম্পর্কে লোকজন বলিতেছে যে, এখন তাহার অনেক কিছু সংশোধন হইয়াছে এবং সে তাহার পূর্বের ত্রুটিপূর্ণ কার্যাবলীর পরিবর্তন করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া তাহার আগের ভুলত্রুটিসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া যায়।

তোমাকে ও তোমার নিকটে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সকলকে ওয়াস্ সালামু আলাইকুম।



মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ৩৮

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তুফা- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

তুমি যে সুন্দর পত্রখানি পাঠাইয়াছ তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সত্য, সুন্দর ও পবিত্র তরিকাতে আল্লাহতায়ালা তাঁহার ইচ্ছামাফিক তোমাকে অটল থাকার সৌভাগ্য দান করুন এবং আকাংখিত প্রিয়তমকে লাভ করার পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি লিখিয়াছ যে, নির্দেশ অনুযায়ী, শিক্ষাদীক্ষার কাজ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সম্পাদন করিতেছ এবং এই পথের সন্ধানে আগত কোন পথিক তাহার শুভ-প্রভাব হইতে

বঞ্চিত থাকে না। আরও লিখিয়াছ যে, তাহাদের অধিকাংশই প্রথম মনোযোগের আকর্ষণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে— আলহামদু লিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহুতায়ালার প্রাপ্য। তোমার প্রতি এই মহান অনুগ্রহের জন্য তুমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে থাক, তবে আত্মগর্ব ও অহঙ্কার হইতে অবশ্যই সতর্ক থাকিবে। এই কাজ দাওয়াতের পর্যায়ভুক্ত, ইহাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিবে। সেইসঙ্গে সকল সময় এই কথা স্মরণ করিতে থাকিবে যে, আমি যথাযথভাবে এই মহৎ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেছি না।

শিক্ষার্থীদের অবস্থাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া তাহার পরিমাপ করিবে ও তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাহাদের প্রতি সঠিকভাবে মনোযোগ প্রদান করাকে উচ্চ শ্রেণীর ইবাদত বলিয়া মনে করিবে। তুমি এই কাজকে সহজ সাধারণ কাজ বলিয়া মনে করিও না। এই কাজ ও অন্যান্য হক আদায় করিবার পর সাধ্যানুযায়ী অধ্যয়ন ও স্মরণ (দরস ও জিকির) করিবার মত আনুগত্যের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে আল্লাহকে প্রিয় করে তোলে এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহর ভালবাসার সৃষ্টি করে।



মাওলানা মোহাম্মদ আমিনের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩৯

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা - যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি (সামগ্রিকভাবে এবং বাক্যাকারে) নিম্নবর্ণিত দুইটি আয়াতের সমতা কীভাবে বোধগম্য হইতে পারে তাহা জানিতে চাহিয়াছ— (১) “আপনি বলিয়া দিন যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহর তরফ হইতে হয়”; (সুরা নেসা)।

(২) “যে নিয়াতম তুমি লাভ কর তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে এবং যে কষ্ট ও বিপদে তুমি পতিত হও তাহা তোমার প্রবৃত্তির (নফসের) পক্ষ হইতে।” (সূরা নেসা)।

(ইহার জবাব হইতেছে) অন্ধকারকে (যাহা হইতে এই স্থানে বিপদসমূহের অর্থ প্রযোজ্য) সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌তায়ালারই কাজ কিন্তু তাহা বান্দার বদ আমলের শাস্তি। সে নিজের খারাপ কাজের কারণে বালা-মসিবতের মধ্যে পতিত হয়। যেমন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলেপাক স. বলিয়াছেন— একজন মুসলিমের উপর কোন মসিবত পৌঁছিলে, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধিলে বা জুতার ফিতা ছিড়িলেও, তাহা সেই মুসলিমের কৃত গোনাহর শাস্তি স্বরূপ— আর আল্লাহ্‌ যাহা ক্ষমা করিয়া দেন তাহার পরিমাণ তো বহুত বেশী। এখন বিপদের সৃষ্টি ও বিপদে পতিত হওয়াকে লক্ষ্য করিয়া— কুল্ কুল্লুম মিন “ইনদাল্লাহি— “বলিয়া দিন যে প্রত্যেক কাজ আল্লাহর তরফ হইতে হয়” ঘোষণা করা হইয়াছে এবং গোনাহর মাধ্যমে বান্দা যে সমস্ত বিপদ আপদকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া “ফামিন নাফসিকা” অর্থাৎ “তাহা তোমার প্রবৃত্তির পক্ষ হইতে” বলা হইয়াছে। এখন ইহার মধ্যে আর কোন বৈপরীত্য থাকিল না। পক্ষান্তরে “হাসানাতিন” (নেয়ামতসমূহ) সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালকের অনুগ্রহ বিশেষ। বান্দাগণের যাবতীয় পুণ্যকর্ম শুধু তাঁহার অস্তিত্বের যে অনুগ্রহ তাহার সমান হইতে পারে না— উপরন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার আরও কত যে অগণিত নেয়ামতসমূহ রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রসুলে খোদা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, “জান্নাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না, আল্লাহর রহমত ব্যতীত। বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহা কি আপনার ক্ষেত্রেও? তিনি স. বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, আমিও আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব।”

বান্দাগণের সৎকর্মসমূহের পুরস্কার হিসাবে ইহকাল এবং পরকালের যে সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে— তাহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের দান— যাহা বান্দার আমলকে সেই পর্যায়ে পৌছাইয়া দেয়।

শুধু এইটুকু আশা

আমার চোখের পানি তোমার কাছে হে প্রভু

যেন মুক্তা হয়ে হয় গো কবুল,

ঝিনুকের সিন্ধু বারিকে মুক্তায়

অভিষিক্ত করিতে তুমি তো কভু

করনাক ভুল।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪০

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা- সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। তোমার মূল্যবান পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়াছি। হকতায়াল্লা তাঁহার নৈকট্য লাভের আরোহণ ক্ষেত্রে তোমাকে ধারণাতীত উন্নতি দান করুন।

তুমি নূতন রচনার পাণ্ডুলিপিসমূহ চাহিয়াছ। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবকে বলিয়া দেখিব, তাহাদের নিকট নকল উপযোগী কোন অধ্যায় থাকিলে তাহার অনুলিপি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। নিজ মুরিদগণের অবস্থা সম্পর্কে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা অবগত হইয়া খুব খুশী হইয়াছি। তাহাদের অবস্থাসমূহ বিবেচনার উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্‌তায়াল্লা তাহাদিগকে উন্নতি দান রক্ষন এবং মূল লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছাইয়া দিন। যেহেতু এই সময়ে এতেকাফে রত আছি এবং সম্মুখে জরুরী কাজসমূহ রহিয়াছে, সেইজন্য বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। জরুরী যে বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব বর্তাইয়াছেঃ “ হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করিয়া দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ”



মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ৪১

সম্পর্ক স্থাপন করাই হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার জন্য জ্ঞানের দরকার, কেননা ইহা এক স্বতন্ত্র বিষয়। যদি এই জ্ঞান দান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি উত্তম। আর যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তখন অত্যধিক কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্পর্ক অর্জন করা হয়, তখন তাহার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারা যায়। আর যদি বিনা কষ্টে, অনায়াসে তাহা পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাহার যথেষ্ট মূল্য ও মর্যাদা থাকে না। যদি কেহ এই সিলসিলায় থাকিয়া তাড়াহুড়া করিতে চায়, সে সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থী নয়—তাহাকে লোভী বলা যায়। এই ধরনের লোকের একসাথে উঠাবসা করার মতোও যোগ্যতা থাকে না। দুনিয়াদারীর ধান্দায় মানুষ কী না করে? আল্লাহ্‌তায়ালাকে চাওয়ার ব্যাপারে তো দুনিয়াদারীর অপেক্ষা আরও অনেক বেশী কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। ধার্মিক ও সাধক ব্যক্তিগণ তো কঠিন সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম সহ্য করিয়া তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

কত দুঃসহ যাতনা কত সীমাহীন ক্লেশ
ওয়াহেদীর এ ক্ষুদ্র জীবনে ঘিরেছে,
তবে না একদা গভীর নিশীথে সে-অশেষ
সৌভাগ্যের ধারা ভাগ্যের কূলে ভিড়েছে।

সমস্ত শায়েখের সরদার (শায়েখুশ্ শায়েখ) হজরত শিহাবউদ্দিন সোহরাবদী তাঁহার ‘আওয়ারিফুল মা’আরিফ’ গ্রন্থে অলৌকিকত্ব ও কারামাত প্রসঙ্গে বর্ণনা করার পর লিখিয়াছেন, “এই অলৌকিকত্ব ও কারামাত হইতেছে আল্লাহ্‌তায়ালার দান। কখনও কখনও তিনি কোন কোন জামাতকে ইহা দ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন। আবার কখনও কখনও এমন হয় যে, ঐ জামাত অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ বা উন্নত কোন জামাতের নিকট অলৌকিকত্ব বা কারামতের বিন্দু-বিসর্গও থাকে না।” ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, অলৌকিকত্ব ও কারামতের কাজ আল্লাহর জিকির ও জাখত হৃদয়ের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির (হুজুরি কলবের) তুলনায় নিম্নপর্যায় ভুক্ত।



হাফেজ আব্দুল গফুরের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৪২

তুমি অসহায় অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যেভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা রাখিয়াছ, তাহাতে আশা করা যায় যে, আখেরে তোমার এই ভালবাসা ফলদায়ক প্রমাণিত হইবে এবং তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। নিজ সত্তাকে সেই পরম সত্তার অস্তিত্বের সহিত বিলীন করিয়া দেওয়া এবং পরে সেখানে স্থায়ীত্ব লাভ করিবার (ফানা ও বাকার) পূর্বে যে চিত্র-বিচিত্র বিবিধ বর্ণাঢ্য অবস্থা যাহা শিক্ষার্থীগণের ক্ষেত্রে ভ্রমণপথের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা উদ্দেশ্য বহির্ভূত ও সত্য বিবর্জিত। সত্যের অনুসন্ধানকারীদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু হইতে বিমুখ হওয়া অত্যাৱশ্যক— যাহাতে তাহার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে। তবে, যাহার নিকট শুধু অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ও মত্ততাই কাম্য, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ। হ্যাঁ, অবশ্য অস্তিত্বের বিলোপ সাধন ও স্থায়ীত্বপ্রাপ্ত হওয়া হইতেছে উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত বস্তু— যাহা হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা, এমনকি তাহার জন্য দ্বারে দ্বারে হাত পাতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ— কেননা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তি (বেলায়েত), অস্তিত্বের বিলোপসাধন (ফানা) ও স্থায়ীত্বের (বাকার) সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ যাহা কিনা মানবসৃষ্টির লক্ষ্য তাহা এই অবস্থিতির (মাকামের) সহিত সম্পৃক্ত। যে ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমের বহিঃশিখা এই রূপময় বিশ্বে প্রকাশ পায়, সত্যের মৌলিক পথে তাহার দরকার নাই। প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসার সঙ্গে আল্লাহর সেই একক সত্তার সম্পর্ক যাহা মত্ততা ও রূপের উর্ধ্বে অবস্থিত— অরূপ ও নিরাকার। এই ভালবাসার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে অস্থিরতার অবস্থা বিরাজমান থাকে। এই কারণে কেহ কেহ এই ভালবাসাকে ‘আনুগত্যের অভিপ্রায়’ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কখনও কখনও এমন হয় যে আসল ভালবাসাও ‘রূপ ও মত্ততার’ বেশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আবেগ উত্তেজনাৱশতঃ চিৎকার ও বিলাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার কখনও এমনও হয় যে, এই ধরনের কোন

বাহ্যিক প্রকাশ থাকে না, মন্ততাহীন অবস্থা তখন কেবল সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আবার এমনও হইতে পারে যে, কোন কোন সময় ভালবাসার অস্বীকৃতি অনুভূত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা তখন পূর্ণতর পর্যায়ে থাকে।

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, পার্থিব জগতে কোন ব্যক্তির নিকট নিজ সত্তা ও বাসনা (নফস) অপেক্ষা অন্যকিছু অধিক প্রিয় নয়। সে নিজের মা, স্ত্রী, পুত্রকন্যা অথবা যে কোন বস্তুর সহিত যতই ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখুক না কেন, তাহা কেবলমাত্র নিজ সত্তার ভালবাসার কারণেই করে। তথাপি তাহার সেই আপন আমিত্বের মধ্যে, ভালবাসার জন্য, কোন চীৎকার অথবা আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। নিজ কামনা-বাসনা ও আমিত্বের সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার ব্যাপারে আমি যাহা বলিলাম তাহা রূপে গন্ধে বর্ণে ভরা এই দুনিয়া সম্পর্কে। অন্যথায় চিরস্থায়ী জগতে আপন আত্মা ও আমিত্ব অপেক্ষা প্রকৃত প্রেমাস্পদ অধিক প্রিয় হইয়া থাকে। অস্তিত্বের বিলোপ সাধন (ফানা) সেই চিরস্থায়ী ভালবাসার পরিচায়ক।

যদি পার এই জীবনের বিনিময়ে
সে-ধন তুমি কিনিতে,
তথাপি জানিবে হয়েছে অনেক সত্তা
পেরেছ তাহা চিনিতে।

আল্লাহর প্রিয় রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসাও এইরূপ ভালবাসার সমতুল্য। যেমন হাদীস শরীফে আছে— “তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি সেই অবধি পূর্ণ মোমিন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত আমি, তাহার জন্য, তাহার কামনা-বাসনা (নফস), তাহার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক আপন ও প্রিয় না হইতে পারি।” যেহেতু এই উচ্চমর্যাদসম্পন্ন তরিকত সম্মানিত রসুল স. এর প্রতিনিধিত্বকারী এবং আল্লাহপাকের দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার মাধ্যমে- তাঁহার প্রতি ভালবাসার ব্যাপারও সেইরকম মর্যাদাবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ওয়াসসালাম।



মাওলানা হোসেন আলীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪৩

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তুফা- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। মহান আল্লাহ তোমাকে মোস্তফা আলাইহি আস্‌সালাতু ওয়া সালামের শরীয়ত ও সুন্নতের পথে বিশ্বস্ত ও সুদৃঢ় রাখুন।

দেখ, আমাদের বুজুর্গগণ সুন্নতের আমলকে অবলম্বন এবং বেদাতকে বর্জন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কার্যাবলী যাহা ধর্মের মধ্যে (ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা যদিও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের (বাতেনের) জন্য লাভজনক বলিয়া মনে হয় তবু তাঁহারা সে সমস্ত কাজ করিতেন না। অন্যদিকে সুন্নতের আনুগত্যকে যদিও বাহ্যিকভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের জন্য লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না তবু তাহা কোনমতেই হাতছাড়া করিতেন না।

ওয়াস্‌সালামু ‘আলাইকুম ওয়াআ’লা মিনদিকুম।

টীকাঃ সম্ভবত হাফেজ আবদুল গফুর পেশোয়ারী মোজাদ্দেরী, হাজী ইসমাইল পেশোয়ারীর খলিফা ছিলেন এবং শায়েখ শাদী মোজাদ্দেরী লাহোরীর মুরিদ ছিলেন। প্রথমে বর্ণিত মোর্শেদের সম্মানের জন্য দুই দিক হইতে এবং শেষ দিকে শায়েখ আদম বিনুরী র. এর মুরিদ ছিলেন। তিনি পরিপূর্ণতা ও বহু সঙ্গুণের অধিকারী ছিলেন। ১১১৬ হিজরির মহিমাম্বিত ১৪ই শাবান ছিল তাঁহার ওফাত দিবস। তাঁহার মাজারশরীফ পেশোয়ারে অবস্থিত। (দ্রষ্টব্যঃ খাযীনাতুল আসফীয়া- পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৭)।



শায়েখ আলীম জালালাবাদীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪৪

প্রশংসা, দরুদ ও দ্বীনের দাওয়াতের প্রতি আহবানের পর জানাইতেছি যে, এখানকার ফকিরদের অবস্থা আল্লাহুতায়ালার ইচ্ছায় প্রশংসার যোগ্য। আশা করি দূরের বন্ধুগণও ‘নির্বাচিত উত্তম পথে’ এবং সৃষ্টির গৌরব ও সর্বোত্তম আশীর্বাদ, সর্বাসুন্দর ও সর্বোতভাবে অভিনন্দিত সেই বিশ্বনেতা হজরত মোহাম্মদ স. এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আনুগত্যে বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্যের জন্য কয়েকটি শ্রেণী ও মর্যাদার স্তর রহিয়াছে। হজরত কেবলা মোজাদ্দের আলফে সানি র. তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৪ নম্বর মকতুবে এই আনুগত্যকে ৭ (সাত)টি স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

প্রথম স্তর দুইটি পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করা যায়— যাহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমলগুলির (কার্যাদির) সহিত সম্পর্কিত। ইহার তৃতীয় স্তরটি, একদিকে অন্তরের অখণ্ড মনোযোগ দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে, অন্যদিকে তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে— তাহা এইজন্য যে, এই স্তরের আরম্ভ অর্জনের মাধ্যমে সূচীত হয়। চতুর্থ স্তরে এই আনুগত্য দান করা হইয়া থাকে—কিন্তু বিশ্বাস ও আমল অর্জনের ক্ষেত্রে তাহার যোগ্যতা থাকে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তর ইহা অপেক্ষা আরও বহু উন্নত ও উর্ধ্ব অবস্থিত। সপ্তম স্তর সম্পর্কে আর কি লিখিব— তাহার মর্যাদা ও উন্নত অবস্থার কথা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ওয়াসসালাম।

টীকাঃ শায়েখ আবদুল আলীম জালালাবাদী ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা।



মোহাম্মদ কাশফের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৪৫

প্রশংসা, দরুদ ও দ্বীনের দাওয়াতের দিকে আহ্বানের পর জানাইতেছি যে, তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি পুনরায় জানিতে চাহিয়াছ, বিতির নামাজের পরে সিজদা করা শুদ্ধ না অশুদ্ধ? তোমার প্রশ্নের উত্তর এই ফকির বহু পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহা তুমি পাও নাই। উত্তরের সারমর্ম হইতেছে যে, ইহা আমাদের এবং আমাদের হজরতের (হজরত মোজাদ্দের আলফে সানি রহমতুল্লাহর) আমলের মধ্যে নাই। উলামাগণ ইহা করার জন্য নিষেধ করিয়াছেন— কাজেই এইরূপ করা ঠিক নয়। সুন্নতের কিতাব আল হুদাতে (হুদা অর্থ সৎপথ প্রদর্শন) আছে, “বিতির নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিয়া যে দুইটি সিজদার প্রথা হিন্দুস্তানে চালু আছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য বা উৎস পাওয়া যায় না। ফিকাহ্ (ইসলামী শরিয়ত বিষয়ক আইন) গ্রন্থেও এই নামাজ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। আরবের লোকজনদের মধ্যেও এই ধরনের কোন আমল নাই। হয়ত শাফেয়ীগণ ইহার মহত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু অধিকাংশ হানাফীগণ এই সম্পর্কে একেবারেই কিছু জানেন না। আমি মদীনার ফিকাহবিদগণের নিকট হইতে এই দুই সিজদার ব্যাপারে জানিতে চাহিয়াছিলাম— তাহারাও এ সম্পর্কে অপছন্দের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

টীকাঃ খাজা মোহাম্মদ কাশফ কাশগড়ী হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খলিফা ছিলেন। তাহাকে খিলাফত দেওয়ার পর কাশগড়ে প্রেরণ করা ইহা ছিল। (রওজাতুল কাইউমিয়া)।



মোহাম্মদ আশুর বোখারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪৬

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। মহান আল্লাহ্‌তায়ালার তোমাকে অন্যান্য সমস্ত কিছুর বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তির পথে উন্নতি দান করুন এবং কলেমা তৈয়বের প্রাচুর্য দ্বারা অভিসিক্ত করিয়া দিন। আল্লাহ্‌ প্রেমিক ব্যক্তির জন্য এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত যে, অন্তর্লোককে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলার জন্য এই মোবারক কলেমা অপেক্ষা অধিকতর ভাল আর কোন কলেমা নাই। ইহার প্রথম অংশ দ্বারা প্রত্যয়দীপ্ত ভক্ত (সালেক) ইঙ্গিত মূলসত্য ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কিছুর প্রতি অস্বীকৃতি জানায় এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বারা চিরসত্য মাবুদের (আল্লাহর) প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে— ইহাই হইতেছে সমস্ত পথের (সুলুকের) সারসংক্ষেপ।

না করলে ভাই ঝাড়ু দিয়ে সব
‘লা’ এর রাস্তা সাফ
পাবেনাক খুঁজে তুমি ‘ইল্লাল্লাহ
দালানের ধাপ।

তুমি এমন সব উপদেশ চাহিয়াছ যাহা সুন্দর স্বভাব ও উত্তম আচার ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আসলে, শরীয়ত ও নবী করিম স. সম্পর্কিত হাদিসের কিতাবসমূহ হইতেছে সুন্দর আচার ব্যবহার ও উত্তম স্বভাবের জন্য পরিপূর্ণতার প্রতীক ও প্রতিভূ। প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ (শরীয়ত) পালন কর এবং মোস্তফা আলাইহি সলাতু ওয়া সালামকে সমস্ত কাজকর্মে নেতা ও পুরোধা হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ কর। পরকালের মুক্তি এবং আল্লাহ জালা শানুহর নৈকট্য প্রাপ্তির শ্রেণীসমূহ ইহার সহিত সম্পর্কবদ্ধ। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, কেননা সময় হইতেছে অতিশয় মূল্যবান বস্তু— ইহাকে অর্থহীন কাজে ব্যয় করা উচিত হইবে না। মানুষজনের সহিত প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত

পরিমাণে মেলামেশা করিবে। এই পথে মাত্রা অতিরিক্ত মেলামেশা করা হিংস্র পশুর মত মারাত্মক। রাত্রিকে জীবিত রাখা এবং উষাকালে ক্রন্দনরত থাকাকে উত্তম বলিয়া মনে করিবে। অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়ার মধ্যে তৃপ্তিকর আশ্বাদে ডুবিয়া থাকা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে— এই কাজ অন্তরকে অনুজ্জ্বল ও বিবর্ণ করিয়া দেয়। প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে ও খোলামনে কথা বলিবে। সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার বিষয়গুলি ভালভাবে পালন করিবে— কখনও এই ব্যাপারে অসতর্ক হইও না।

আহারে, নিদ্রায় ও কথায় মধ্যম পস্থা অবলম্বন করা ভাল।

গলায় গলায় খেয়ে যেন ফের
বের করিস না বমি ক'রে,
অল্প খাওয়ার দুর্বলতায় দেখিস
প্রাণ-পাখি না ঝিমিয়ে পড়ে।



মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং—৪৭

কি সুখ, কি দুঃখ, সর্বাবস্থায় প্রশংসার মালিক আল্লাহ। যাহা কিছু আসে সেই প্রকৃত বন্ধু ও মহামর্যাদাশালী আল্লাহর তরফ হইতে আসে এবং তাহা প্রিয়জনের দৃষ্টিতে অন্তর্লোকে অত্যন্ত মনোহর ও আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত ব্যথা-বেদনা আসিয়া উপস্থিত হয় প্রিয়জন তাহার মধ্যেও এমন আশ্বাদ প্রাপ্ত হয় যেমন তাঁহার পুরস্কার হইতে পাইয়া থাকে। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পুরস্কারকে সৌন্দর্যের বিকাশ এবং দুঃখ বেদনাকে মহিমার প্রকাশ বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ উভয় বস্তুকেই তাঁহার পরিপূর্ণ গুণ ও প্রশংসার বস্তু হিসাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া লয় গুণাবলীকে প্রশংসার সোপান বলিয়া মনে করে অর্থাৎ গুণাবলী হইতে প্রশংসার দিকে আসক্ত হইয়া পড়ে।

সন্তান ও প্রিয়জনের মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া লও এবং ধৈর্য অবলম্বন কর। যেহেতু এই কাজ সেই মহান বন্ধুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, সেজন্য ইহার আশ্বাদে আশ্বাদিত হও এবং এই কার্য প্রতিপন্থকারীকে লাভ করিবার জন্য ইহাকে

আরোহণের সোপান হিসাবে গ্রহণ কর। আত্নাদ করিয়া ভাগ্যকে দোষ দেওয়ার এবং অধৈর্য হওয়ার অবকাশ কোথায়? সন্তানের জীবিত অবস্থায় যেক্রপ আনন্দ উপভোগ করিতে এবং তাহাকে আল্লাহপাকের প্রকাশ্য দান বলিয়া মনে করিতে— তাহাকে হারনোর পরেও ঠিক সেইমত আনন্দিত থাক এবং নিজের জন্য এক মহৎ শিক্ষা বলিয়া ইহাকে মনে কর। এমনকি এই ব্যথা বেদনা যাহা সেই প্রকৃত বন্ধুর সম্মতি লাভে বাতায়নস্বরূপ, তাহাকে নিজ সৌভাগ্যের অন্তর্নিহিত বিষয় বলিয়া মনে কর। এই দুনিয়ার বিপদাপদ যদিও বাহ্যিকভাবে হৃদয়বিদারক ও গভীর ক্ষতের কারণ, তবুও প্রকৃত দৃষ্টিতে তাহা উপশম ও মুক্তির হেতু— নৈকট্য ও উন্নতি প্রাপ্তির নিমিত্তস্বরূপ। কোন এক কবি কত সুন্দরভাবেই না বলিয়াছেন :

তোমার সকল মর্মদাহ, সকল দুঃখ বেদনা
পরিশুদ্ধ ঔষধ ছাড়া তো আর কিছু নয়
জীবনে কাহারো মুখ চেয়ে যেন কখনো থেকো না
কিসের ভাবনা আর আমি যদি তব বন্ধু হই।
ইশকের পথে যদি হয়ে যাও গুম খুন
তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাও হে প্রিয় বান্দা মোর
যে রক্তের ধারা বয়ে যায় গাও তার গুণাগুণ,
প্রেমের এ দরিয়ায় বেঁধে রাখ মোর প্রেম ডোর।



মীর মোহাম্মদ খাফীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৪৮

আল্লাহুতায়ালা আমাদিগকে ও তোমাদিগকে, সাইয়েদুল মুরসালীন হজরত মোহাম্মদ স.-কে যথার্থভাবে অনুসরণ করিবার তওফিক দান করুন।

হে নম্রতার লক্ষণবাহী! এই দুনিয়াতে জীবনের আয়ুষ্কাল নেহায়েত কম কিন্তু অনন্তকালের অফুরন্ত জীবনের ফলাফল এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আয়ুর সহিত সম্পর্কযুক্ত ও কার্যপরম্পরায় আবদ্ধ। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে এই অল্প সময়ের অবকাশকে আল্লাহর দান হিসাবে গ্রহণ করিয়া পরকালের উপায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং একটি দীর্ঘ সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার

মকতুবাতে মাসুমীয়া/৮৭

গড়িয়া তোলে। আল্লাহ্‌তায়ালার তাঁহার সৃষ্টিজগতের মধ্যে তোমাকে একটি বড় জামাতের আশ্রয়স্থল হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে থাক এবং সেইসঙ্গে আল্লাহর সৃষ্টির প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করিবার জন্য সাহসের সহিত ভালভাবে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়। নিজ সৃষ্টিকর্তার বান্দাগণের খেদমত করাকে ইহকাল ও পরকালের উন্নতির জন্য সফলকাম হওয়ার উপায় বলিয়া মনে করিবে।

উত্তম আচরণ, সকলের হিতার্থে হাসিমুখে আচার ব্যবহার করা, স্বভাবে নম্রতা এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি কোমল ও সহনশীল থাকাতে হকতায়ালার রেজামন্দী লাভ করিবার উপায়, মুক্তিলাভের ভিত্তি ও উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত বলিয়া মনে করিও।

হাদীস শরীফে আছে : “মখলুক হইতেছে আল্লাহ্‌তায়ালার পরিবার। অতএব আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের সে, যে তাঁহার সৃষ্টিজীবের সহিত সদ্যবহার করে।”

এখন মুসলমানগণের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার শ্রেষ্ঠত্ব তথা উত্তম আচরণ ও বিনয়ের মহত্ব সম্পর্কে লিখিতেছি। এইগুলি সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করিবে, যদি কোন হাদীসের অর্থ বোধগম্য না হয় সেক্ষেত্রে কোন দ্বীনী আলেমের নিকট হইতে বুঝিয়া লইবে।

আল্লাহর পয়গম্বর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন— মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে নিজের ভাইয়ের প্রতি কোন জুলুম করে না এবং অন্য কাহাকেও তাহার প্রতি জুলুম করিতে দেয় না। যে ব্যক্তি তাহার নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ্‌তায়ালার সেই ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি তাহার কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ দূর করে, আল্লাহ্‌তায়ালার তাহার প্রতিদানে শেষ বিচারের দিনে তাহার দুঃখ দূর করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে খুশী করিবে, আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিনে তাহাকে খুশী করিবেন (বোখারী ও মুসলিম)।

হাদীস গ্রন্থ মুসলিম শরীফে আছে— আল্লাহ তাঁহার বান্দার সাহায্যের জন্য থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তাহার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য থাকে।

হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে— আল্লাহর মখলুকে (সৃষ্টিতে) এই ধরনের কিছু লোক থাকেন, যাঁহাদিগকে তিনি এই কারণে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা মানুষের অভাব পূরণ করিবে আর মানুষ হতবুদ্ধি অবস্থায় নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের নিকটে আসিবে (সংক্ষিপ্ত, তিবরানী)।

হাদীস শরীফে ইহাও আছে— আল্লাহ্‌তায়ালার কিছু ব্যক্তিকে ধন-দৌলত দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা বান্দাদের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের

ধন-সম্পদ যে পর্যন্ত তাঁহারা আল্লাহর বান্দাদের জন্য ব্যয় করিতে থাকেন, আল্লাহতায়াল্লা তাঁহাদিগকে ধন-সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর যখন তাঁহারা দান সামগ্রী বিতরণ করা বন্ধ করিয়া দেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সমস্ত ধন-দৌলত কাড়িয়া লন এবং অন্যজনের দিকে তাহা স্থানান্তরিত করিয়া দেন (ইবনে আবীদ দুনিয়া, তিবরানী)।

আর একটি হাদীস হইতেছে— যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে তাহার সেই সৎকর্ম দশ অপেক্ষা উত্তম। (তিবরানী ও হাকেম হইতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত)।

অন্য একটি হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে ছুটাছুটি করিবে, আল্লাহতায়াল্লা তাহার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য ৭০টি করিয়া নেকী লিখিবেন এবং ৭০টি করিয়া ঋণটি মুছিয়া দিবেন এবং তাহার এই আমল ঘরে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত জারি থাকিবে। আর যদি তাহার সেই ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া যায় সেক্ষেত্রে চেষ্টাকারী সেই ব্যক্তি তাহার গোনাহসমূহ হইতে এমনভাবে পরিস্কার হইয়া যাইবে যেন সে কেবলমাত্র আজই জন্মগ্রহণ করিল। আর যদি চেষ্টায় রত থাকাকালে তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (ইবনে আবীদ দুনিয়া)।

অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে— যে ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভাইয়ের নির্ধারিত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের জন্য নিমিত্তস্বরূপ হইবে, সেক্ষেত্রে পুলসিরাত অতিক্রম করিবার সময়ে আল্লাহতায়াল্লা তাহাকে সহায়তা প্রদান করিবেন যখন লোকদের পদযুগলগুলি পুলসিরাতের উপর অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান থাকিবে (তিবরানী)।

আর একটি হাদীসে আছে, ফরজসমূহ পালন করার পর, আল্লাহতায়াল্লা নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় কাজ হইতেছে, কোন মুসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করা (তিবরানী)।

আঁ-হজরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন কাজের মাধ্যমে অধিকাংশ লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে। জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও উত্তম আচরণ। পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সেই বিষয় সম্পর্কে যাহার কারণে বেশীর ভাগ লোক দোজখে প্রবেশ করিবে। তিনি জবাব দিয়াছিলেন, মুখ ও গোপন অঙ্গ। (তিরমিযি, ইবনে হাক্কান ও বায়হাকি)।

ইহাও হাদীসে বলা হইয়াছে— ঈমানের দিক হইতে অধিক পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি যাহার আচার-আচরণ সবচেয়ে ভাল এবং যে জনসাধারণ ও পরিবার-পরিজনের সহিত দয়া ও উদারতা প্রদর্শন করে। (তিরমিযি)।

অপর একটি হাদীসে আছে— আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সীমান্তে ঘর পাওয়ার ব্যাপারে জামিন হইতেছি, যে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে, যদিও তাহা

ন্যায্যের জন্য হয়। আর জান্নাতের মধ্যভাগে ঘর প্রাপ্তির ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির জন্য আমি জামিন হইতেছি, যে মিথ্যাকে ত্যাগ করে, এমনকি তাহা যদি ঠাট্টাচ্ছিলেও বলা হয় এবং জান্নাতের উপরের অংশে ঘর লাভ করার ব্যাপারে আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন হইতেছি, যে নিজের আচরণকে ভাল করে। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা ও তিরমিযি।)

অন্য একটি হাদীস হইতেছে— নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সদয় ব্যবহারকারী এবং সমস্ত কার্যে তিনি সদয় ব্যবহার পছন্দ করেন। (বোখারী ও মুসলিম)।

অপর একটি হাদীসে আছে— আল্লাহ্‌তায়ালার কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমলতার জন্য তিনি যে সাহায্য করেন, কঠোরতার ক্ষেত্রে তাহা করেন না (তিব্রানী)।

হাদীস শরীফে আরও বলা হইয়াছে যে— রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন ধরনের ব্যক্তির কথা বলিব না, যে ব্যক্তির জন্য দোজখের আগুন হারাম অথবা দোজখের আগুন তাহার জন্য হারাম? (শোন) সেই ধরনের প্রতিটি ব্যক্তি সেই যে (কষ্ট, সমস্যা ইত্যাদি) আসান (সহজ) করে এবং নম্র স্বভাবের হয়। তাহার জন্য দোজখের আগুন হারাম। (তিরমিযি।)

আর একটি হাদীসে আছে— বান্দা বিনয় ও ধৈর্যের মাধ্যমে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা কেহ দিনে রোজা রাখিলে ও রাতে (এবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান থাকিলে কাহারও জন্য হইয়া থাকে। (ইবনে হাব্বান)।

হাদীস শরীফে আছে— রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে সেই কথা বলিয়া দিব না, যাহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার উন্নতি দান করেন এবং উচ্চশ্রেণীর সামিল করেন? সাহাবা রা.গণ আরজ করিলেন, অবশ্যই আপনি তাহা বলিয়া দিন। রসুল স. বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের সহিত রক্ষা ব্যবহার করিবে তোমরা তাহার প্রতি সহনশীল থাকিবে, যে জুলুম করিবে তাহাকে মাফ করিয়া দিবে, যে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবে তোমরা তাহাকে দান করিবে এবং যে তোমাদের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবে তোমরা তাহা সংযুক্ত করিবে ও সহানুভূতির সহিত প্রতিদান দিবে (তিব্রানী)।

হাদীসে বলা হইয়াছে— সেই ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কাহাকেও নীচে ফেলিয়া পরাজিত করে। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময়ে নিজকে সংযত রাখিতে পারে (ধৈর্য অবলম্বন করিয়া) (বোখারী ও মুসলিম)।

আর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে— ইহাও এক ধরনের সদকা (আল্লাহর ওয়াস্তে দান), যদি তুমি হাসিমুখে মানুষজনকে সালাম কর (ইবনে আবীদ দুনিয়া)।

আর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে— কোন মুসলমান ভাইকে দেখিয়া তোমার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিলে তাহা সদকা স্বরূপ। তুমি যদি সৎকাজের জন্য আদেশ কর এবং অসৎ কাজের জন্য নিষেধ কর তাহা সদকায় পরিণত হয়। কোন পথভ্রান্তকে সোজা পথ বলিয়া দেওয়া সদকা। রাস্তা হইতে পথের কাঁটা কিংবা হাড় সরাইয়া দেওয়াও সদকা। নিজের পায়ে পানি ভরিয়া তাহা ভাইয়ের পায়ে ঢালিয়া দিলে সদকার কাজ হয় (তিরমিযি)।

অপর একটি হাদীস হইতে জানা যায়— জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বালাখানা থাকিবে যাহার বাহিরের অংশ ভিতর হইতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হইতে (স্বচ্ছ হওয়ার কারণে) দেখা যাইবে। হজরত আশয়ারী রা. জানিতে চাহিলেন, হে আল্লাহর রসুল, তাহা কাহার ভাগ্যে হইবে? তিনি স. বলিলেন, সেই ব্যক্তির জন্য যে সদালাপী, যে ক্ষুধার্ত লোকদিগকে আহার করায় এবং রাতে মানুষজন যখন শুইয়া থাকে তখন যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দণ্ডায়মান থাকে (তিবরানী ও হাকেম)।

এই কয়েকটি হাদীস ‘তারগীব ও তারহীব’ হাদীস গ্রন্থ হইতে এখানে লেখা হইল— যাহা হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলিকে অনুসরণ করিয়া চলার মত তওফীক যেন আল্লাহ্‌তায়াল্লা আমাদিগকে দান করেন। নিজের অবস্থাকে এই সমস্ত হাদীসের বিষয়গুলির সহিত যাচাই করিবে। যদি তাহা এইগুলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে থাকে তাহা হইলে আল্লাহপাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি তদনুযায়ী না হয় তাহা হইলে কাকুতিমিনতির সহিত, নিজের অবস্থা যাহাতে এই হাদীসগুলির অনুরূপ হয়, তাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা কর ও আবেদন জানাও। প্রকৃতপক্ষে যদি এইরূপ আমল করার সামর্থ্য কাহারও না থাকে, সেইক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে নিজ অক্ষমতার স্বীকারোক্তি অবশ্যই থাকিবে। আল্লাহ্‌ না করেন, যদি কাহারও এই অনুযায়ী আমল করার সামর্থ্য না থাকে এবং নিজের আমলকেও অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে না করে; সেই সকল ব্যক্তি অতি দুর্ভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

এ জগতে মহৎ কাজের লাগি সকল প্রয়াস

ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে রয়েছে ভরা,

মন্দ কাজে না রহিলে বিবেকের দংশন প্রকাশ

পাপের চাতুর্যে তা থাকে যে ভরা।



এরশাদ পানাহ মীর মোহাম্মদ নোমানের
নিকট লিখিত। মকতুব নং- ৪৯

আল্লাহ্‌তায়াল্লা আপনার প্রাচুর্যময় অস্তিত্বকে করুণাধারায় পূর্ণ রাখিয়া আদেশের সমুজ্জ্বল আলোক প্রভায় বিভূষিত রাখুন।

“জলে স্থলে মানুষের কৃতকর্ম সমূহের দরশন নানা প্রকার বালা মুসিবত ছড়াইয়া পড়িতেছে” (সূরা রুম)। আমাদের অপকর্মসমূহের কারণে দ্বিতীয় বৎসরের মত মখলুকের মানুষ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ কবলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মানুষজন এই বিপদ ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে ইস্তিসকার নামাজের জন্য (অতি অনাবৃষ্টির সময় যে নামাজ পড়া হয়) জঙ্গলের দিকে যাইতেছিল এবং আমিও তাহাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি আমার পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, দুর্ভিক্ষের আকার এই বালা-মুসিবতের আবির্ভাব কেবল আমারই মন্দ কাজের প্রতিফল। লোকজন শুধু শুধু আমার নিকট হইতে দোয়া ও বরকতের সন্ধান করে এবং আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণের মাধ্যম বলিয়া মনে করে। তাহারা আমার আসল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তাহারা প্রশাসন কর্তৃক জুলুম ও অত্যাচারের বিষয়েও অভিযোগ করে— কিন্তু আমি যখন আমার আমলসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি যে, ঐ প্রশাসনের তুলনায় আমার আমল বলিতে কিছুই নাই।

এই সমস্ত অপরাধের ভারী বোঝা সত্ত্বেও বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রত্যাশা রাখি যে, তাহারা আমার করুণ অবস্থার জন্য করুণা প্রদর্শন করিবে, আমার অপরাধসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবে এবং আমাকে আমার অগুণিত পাপের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না। যদিও আমি পাপী তবু আমি আল্লাহর সেই রহমতের প্রত্যাশী—আর হামার রাহেমীন—পরমদাতা ও দয়ালু, তাঁহার সেই রহমতের আশায় আশান্বিত হইয়া চাহিয়া থাকা পাপীদের অবস্থার প্রতি তিনি রহম করেন এবং সম্মুখে আগত কাল কেয়ামতের দিনে পাপীর নসিবে শাফায়াতের সৌভাগ্য লাভ করিবে, এমন আশাও করি। ওয়াস্ সালাম।



মোল্লা নিয়ামত উল্লাহর নিকট
লিখিত। মকতুব নং- ৫০

কীরকম আশ্চর্যজনক আদান-প্রদান দেখ, একজন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক যত বেশী শক্তিশালী হইতে থাকে, শরীয়ত সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর ব্যাপারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি তত বেশী নির্মল ও আলোক-উজ্জ্বল হইতে থাকে। তাহার কারণ, কামনা-বাসনার সম্মুখে রত উদ্ধত প্রবৃত্তি যাহা শরীয়তের নির্দেশাবলীকে মূলতঃ অস্বীকার করে- তাহা এই সময়ে বশীভূত হইয়া যায় এবং আলোকপ্রাপ্ত পরিপূর্ণ দীপ্তি, পূর্ণরূপে প্রশান্ত প্রবৃত্তির (কামালে এতমিনানে নফসের) সম্পর্কের সহিত সংযুক্ত থাকে। শরীয়তের ব্যাপারে যাহারা অমনোযোগী তাহারা মূল সংযোগের বিষয়ে অতিমূঢ় ও দরিদ্র- তাহারা ভিতরের শাঁস হইতে সরিয়া আসিয়া কেবলমাত্র আবরণের মধ্যে জড়িত হইয়া আছে। সংযোগের (নেসবতের) পরিপূর্ণতা প্রশান্তির মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে এবং প্রশান্তির চিহ্ন হইতেছে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহের প্রতি পূর্ণরূপে আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করা। আনুগত্য না থাকিলে প্রশান্তিও থাকে না। পূর্ণ আনুগত্যের অধিকারী ও শরীয়তের ধারক রসুলে মকবুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহুতায়াল্লা তোমাদিগকে এবং আমাদিগকে যেন অটল রাখেন। ওয়াসসালাম।



মাওলানা আব্দুল গফুর সমরকন্দীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫১

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

আহা, ইহা আল্লাহুতায়ালার কী আশ্চর্য দান, যদি কোন আলেম শিক্ষা গুরু হইয়া আনুগত্যের অলংকারে সুসজ্জিত থাকিতে পারে, বৃদ্ধকালেও করণীয়

কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে সমর্থ হয়, আল্লাহর অনুগত ও ভক্ত থাকিতে পারার মত স্বীকৃতির চিহ্নসমূহ তাহার আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তাহার পেশানীর আলো প্রকৃত অবস্থার সাক্ষ্য দিতে থাকে। এই ধরনের প্রিয় বান্দার সামর্থ্যের সংবাদ আনন্দ ও সন্তুষ্টির কারণ, আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভিত্তি এবং এই অনুগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দোয়ার উপকরণ হইয়া যায়। এই সমস্ত নূর আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় বন্ধুগণের বরকতের নূর। আর দাসত্বের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার নিয়ম-কানুনসমূহ পালন করিবার জন্য যে বাহ্যিক একাগ্রতা বহিরাঙ্গন পাইয়া থাকে তাহা এই মৌলিক সংযোগেরই প্রভাব, যাহা সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুজুর্গগণের অভ্যন্তর হইতে আপনার অন্তরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

যে সমস্ত ভক্ত ও সহচরবৃন্দ হজরত খাজা মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর সাহচর্যে ছিলেন এবং তাঁহার সেবায়ত্ত্ব ও কদমবুসি করার সৌভাগ্য দ্বারা মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা আজও আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও আদরণীয়, অভিজাত ও আনন্দদায়ক হইয়া আছেন। কারণ, ঐ সকল ব্যক্তি হইতেছেন বন্ধুত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার আয়না এবং সেই সুন্দর মহৎ আত্মার নিদর্শন স্বরূপ। যখনই আমি এই দলের সাক্ষাৎ লাভ করি তখনই আমার মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়— যেন মনে হয় সম্মানিত হজরত রহমতুল্লাহি আলাইহির সৌন্দর্য অবলোকন করিতেছি। ঐ সকল সমাবেশ ছিল কেবলমাত্র আল্লাহুতায়ালার উদ্দেশ্যে, যাহার দৃষ্টান্ত আজকাল পাওয়া যায় না। আমার মনের মধ্যে যখন ঐ সমস্ত স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়ায় তখন আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত এবং হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। ইহাই কামনা করি যে, এই জামাতের সহিত অবস্থান করিব এবং তাঁহাদের সহিত মেলামেশা ও উঠাবসা করিব। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এই দলের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে এবং হ্রাস পাওয়া ছাড়াও এই জামাতভুক্ত বিভিন্ন লোকজন একে অপরের নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন।

পড়ে আছি আমি বহুদূরে আজ বন্ধুহীন একা
সহেনা সে তীব্র মর্মজ্বালা হৃদয়ে আর সহেনা,
দহনে দহনে তগু হিয়া তবু নাহি তার দেখা
অস্থিমজ্জা হল অঙ্গার এ প্রাণ তো আর রহে না।

টীকাঃ মাওলানা আব্দুল গফুর সমরকন্দী ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর অন্যতম খলিফা। বাহ্যতঃ তিনি সেনাদলে থাকিলেও আসলে তিনি ছিলেন আলোকিত খানকার অধিবাসী। (যবদাতুল মাকামাত- পৃঃ ৩৮৯)।

আল্লাহ যাহা কিছু করেন তাহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকে। যে কোন স্থানেই এই সম্মানিত ব্যক্তিগণ থাকেন না কেন তাহাই আল্লাহপাকের আশীর্বাদস্বরূপ।

তাহাদের সেই সুখময় অতীত দিনের স্মৃতি
হৃদয় আকুল করি আনে সুরভিত প্রেম-প্রীতি।

ওয়াস্ সালাম।



মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫২

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। - সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

লাহোর হইতে জৈনক বন্ধুর মাধ্যমে যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছি তাহা হস্তগত হইয়াছে এবং তাহার বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ভালবাসার আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশে এবং হৃদয়ের বিকশিত উত্তাপে ভরপুর ছিল তোমার পত্রখানি। ইহার জন্য আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সালাম পেশ করিতেছি।

যতটুকু উত্তাপ ও আকর্ষণ হাসিল করা যায় তাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দান বলিয়া মনে করিবে। চিঠিতে তুমি এই অঞ্চলে (সেরহিন্দ) আগমনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছ এবং সেই সঙ্গে আমার আবহাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকিবে এমন অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছ।

দেখ, এখানকার অধিবাসীগণ তাহাদের অন্তরে পরকালের প্রতি খেয়াল রাখে আর ইহার দূরত্বের কারণে সদা বিমর্ষ থাকে এবং বন্ধুগণের নিকটেও সেই মিলন-গৃহের কথা বলিয়া থাকে। যদিও সেই গৃহের কোন নিদর্শন এখনও পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে গোচরীভূত নহে। কেবলমাত্র বিরহ ও দূরত্বের ব্যথা এবং হৃদয়ের উত্তাপ ও দ্রবণ ব্যতীত হিসাবে আর কিছুই নাই। তুমি যদি এই অঞ্চলে আসিতে চাও এবং প্রবাসীগণের (হিজরতকারীগণের) শোকে ও বিচ্ছেদ-ব্যথা বেদনায় শরীক হইতে চাও ও হারানোর জ্বালায় দহন যন্ত্রণার মহফিলে দক্ষীভূত হইয়া বিবর্ণ ব্যথার চুমুক সহ্য করিতে চাও, তাহা হইলে আর অসুবিধা কি, এখানে

চলিয়া আস। কিন্তু আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি— এই দূরত্বের বেদনা ও বিরহের যন্ত্রণা সত্ত্বেও ওইদিকের অনুগ্রহের পরিমাণ বেশীর চেয়ে আরও বেশী এবং স্বাদেগন্ধে, সৌন্দর্যে তাহা পূর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম ও মনোরম। হে ভ্রাতঃ, ইহাও তো চিরস্থায়ী অনুগ্রহ বটে যে, বিরহ-বেদনার সহিত জড়াইয়া সম্পর্কের সহিত যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং হৃদয়ের এই উত্তাপ হইতে আনুকূল্য প্রাপ্তির হিম্মত প্রদান করা হইয়াছে।

রয়েছি এখানে বেঁচে শুধু এই আশা নিয়ে বুকে
মৃদুমন্দ বায়ে সেখান থেকে পড়বে এসে ঝুঁকে
আমোদিত গন্ধরাজি, নিব প্রাণভরে তাহা শুঁকে।

ওয়াস্ সালাম।



শায়েখ মহসিনের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৫৩

আরম্ভ করিতেছি পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

ভ্রাতৃসম প্রিয় শায়েখ মহসিনের নিকট এই প্রেমিক দরবেশ সালাম জানাইতেছে ও সর্বাস্থান কুশল কামনা করিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের খবর, প্রেমের পথ অন্বেষণকারীগণের আবেগ ও উদ্যম, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের দৃঢ়তা ও সচেতনতা এবং বর্তমানে সমবেতভাবে বৃত্তাকারে স্মরণে ও ধ্যানে (হালকায়ে জিকির ও ফিকিরে) রত থাকার বিষয় সম্পর্কে অবগত হইয়া অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই সমস্ত বিষয় অধিকতর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভিত্তি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া-আসা কেয়ামতের এই জামানায় এই ধরনের ধর্মীয় সমাবেশ এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তে সকলে মিলিয়া মিশিয়া একসঙ্গে উপবেশন করা- আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ দান।

মকতুবাতে মাসুমীয়া/৯৬

সেজদার লাগি দূর আসমান পড়ে
এই জমিনের বুকে নুয়ে
যে-জমিনে আছে কিছু আল্লাহ্ প্রেমিক
ঐ নূরের প্রেমে মগ্ন হ'য়ে।

নিজের কাজে সদা নিরলস থাকিবে এবং আল্লাহ্‌পাকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে থাকিবে। তিনি আমাদেরকে অবহিত করিয়াছেন— ‘যদি তোমরা আমার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আমি সেই দানের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া দিব।’ সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালার কর্তৃক পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত শিথিলতার ব্যাপারে ভয়ে কম্পিত থাকিবে এবং শয়তানী চক্রান্ত সম্পর্কে সদা সজ্ঞত রহিবে। কামনা-বাসনা-সম্ভোগজনিত প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও সূক্ষ্ম অংশীবাদীত্বের জটিলতা সম্পর্কে সতত সজাগ ও সতর্ক থাকিবে।

আসল কথা হইতেছে, সম্মানিত বুজুর্গব্যক্তিগণের সহিত মূল ও মৌলিক সম্বন্ধকে সুরক্ষিত রাখিবে এবং নবী করিম স. এর সুনুতের মজবুত রশিকে কখনও হাতছাড়া করিবে না। আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র দরগাহে সব সময় কাতরতার সহিত প্রার্থনা করা এবং কান্নাকাটির মাধ্যমে অনুনয়-বিনয় করাকে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করিবে। বন্ধুগণের নিকট হইতে এই প্রত্যাশা করি যে, বহুদূরের এই দ্বীনহীনকে মঙ্গল কামনায় দোয়ার সহিত তাঁহার স্মরণে রাখিবেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার তোমাদের মদদদার ও সাহায্যকারী হউন।



শায়েখ আব্দুল লতিফ লস্করখানির
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫৪

নিজের সম্পর্কে এবং বন্ধুগণের সম্পর্কে এই মিসকিনের যে কামনা তাহা হইতেছে, নিজেকে যেন সম্পূর্ণরূপে সেই অখণ্ড মূলের সহিত নিয়োজিত রাখা যায় এবং এই সর্বোচ্চ সম্পদের ব্যাপারে কোন কথা বা কাজ যদি বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতে যেন একেবারে বিমুখ থাকিতে পারা যায়। কিন্তু এমনও যেন না হয় যে, আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করিতে গিয়া বাহ্যিক কার্যধারার মধ্যে কোন গাফলতী আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে কোন এক

দরবেশ বলিয়াছেন, “কর্তব্যপরায়ণ কোন ব্যক্তি সারাজীবন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকিয়া মুহূর্তের জন্য যদি সে অমনোযোগী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে যাহা পাইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হারাইয়া ফেলিবে।” কিন্তু কি আর করা যায় বল, সব সাধ তো আর কখনও পূর্ণ হয় না। দৈহিক চাহিদা ও লোকজনের সহিত ঘনিষ্ঠতা ব্যতীতও তো কোন উপায় নাই। তবে মনে হয়, বাহ্যিক দিক হইতে যে সমস্ত শিথিলতা বা অমনোযোগিতা একান্ত অপরিহার্য তাহা যদি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়, সেক্ষেত্রে এই বাহ্যিক শিথিলতা আর গাফলতীর কার্য কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় না— তাহা অবিরত জিকিরের সহিত মিলিত হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে নিদ্রা গাফলতীর চূড়ান্ত নমুনা, তাহার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার পর এবাদত-বন্দেগী করিতে কোন অলসতা আসিবে না সেক্ষেত্রে এই নিদ্রা তখন জিকির হিসাবে পরিগণিত হয়। ‘উলামাগণের নিদ্রাও এবাদত’— ইহা তুমিও শুনিয়া থাকিবে (তাহা এই ধরনের সৎ উদ্দেশ্যের কারণেই এবাদত হইয়া যায়)। লোকজনের সহিত যদি এই উদ্দেশ্যে মেলামেশা করা হয় যে, তাহা দ্বারা তাহাদের অধিকারসমূহ ঠিকমত পূরণ করা হইবে, সেক্ষেত্রে তাহা এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা বিশুদ্ধ ধারণা প্রসূত। স্মরণের ব্যাপার (জিকির) শুধু মুখের (জবানের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না— যে সমস্ত কাজ দ্বারা মাওলার রাজী থাকার বিষয়কে বাঞ্ছিত ও অনুমিত বলিয়া মনে হয়, তাহার সব কিছুই জিকির হিসাবে বিবেচিত হইয়া যায়। “নিঃসন্দেহে ইহা হইতেছে একটি উপদেশ, যাহার মন চায় সে যেন তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ তৈরী করে।” (সুরা মুজাম্মেল)।

ঐ সমস্ত মহান বুজুর্গ ব্যক্তি যাঁহারা বিশুদ্ধ মূলতত্ত্বে পৌছাইয়া গিয়াছেন এবং বানোয়াট ও কৃত্রিমতা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা যাহা কিছু করেন সব আল্লাহর জন্য করেন। আর তাঁহাদের দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহাও আল্লাহর জন্যই হইয়া থাকে— তজ্জন্য তিনি কোন ইচ্ছা (নিয়ত) করেন অথবা না করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা শক্তির ভিতর হইতে উৎসারিত হইতে থাকে— কোন নির্ধারিত বিষয়ে সংশোধিত উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তাঁহার কামনা-বাসনা (নফস) সব কিছুকে উৎসর্গ করা হইয়াছে সেই মাওলার প্রেমে— সেই জন্য তিনি যাহা কিছু করিয়া থাকেন তাহা আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন করিয়া থাকে। যেন বর্তমান অবস্থিতিতে (মাকামে) সাফল্য লাভ করিবার পূর্বে তিনি যাহা কিছু করিতেন প্রবৃত্তির (নফসের) প্ররোচনায় করিতেন এবং সেই সময়েও তাহার জন্য কোন নিয়তের প্রয়োজন হইত না। ইহাও জানা দরকার যে, এই প্রকার আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মাহাত্ম্যে কোন ঔদ্ধত্য ও অনাচার করা হইলে তাহা (সত্যের পথে) আল্লাহর মাহাত্ম্যের (শানের) প্রতিই ঔদ্ধত্য করার সামিল হয়।



তরবিয়ত খানের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৫৫

তোমার মূল্যবান পত্রখানি, যাহার প্রতি ছত্র বিরহ ব্যথার গাঁথায় আচ্ছন্ন ছিল, পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। হে ভ্রাতঃ, আমাদের কী-ই বা আর করার আছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই বিশ্ব কেবল বিচ্ছেদ আর বেদনার আবাসস্থল। দর্শন প্রাপ্তির স্থান তো আখেরাত। আল্লাহুতায়াল্লা যেন পরকালের সওদায়, আখেরাতের মঙ্গলের জন্য পুণ্য কাজের মধ্যে তোমাকে সদা উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত রাখেন— যাহাতে সেখানে ঈঙ্গিত দর্শন প্রাপ্তি বন্দোবস্ত হইয়া যায়। আকাংখিত সত্যের রূপদর্শন যখন সেখানকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেক্ষেত্রে অপরাপরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ তো তাহার শাখা-প্রশাখা মাত্র! হকতায়াল্লাকে দর্শনের জন্য যে উত্তাপ সহ্য করিবার মত শক্তির দরকার, পার্থিব জীবন তাহার জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিশ্ব চরাচরে প্রেমিকের হৃদয় কেবল দক্ষীভূত হইতে থাকে, চক্ষুদ্বয় থাকে অশ্রু-সিক্ত, সময় জড়াইয়া থাকে বিরহের বিলাপে। হৃদয়ের উত্তাপে দ্রবীভূত অন্তর থাকে ব্যাকুল, বেকারার। আসল সূর্যের উদয়ের অপেক্ষায় প্রেমিকের প্রতিটি রাত কাটে জাগ্রত অবস্থায়, আর সেই মনোলোভা চাঁদের কিরণের জন্য প্রতিটি দিন সে অধীর আগ্রহে থাকে অস্তির আকুল।

এই পথ দিয়ে যে সামগ্রী যায় ঐ অনন্ত লোক
সে তো শুধু শুষ্ক দুটি ঠোঁট আর অশ্রু ভেজা চোখ।

বাঞ্ছিত মূল বস্তু ব্যতীত প্রেমিকের অন্তরে শান্তি থাকে না, সেই পরম সত্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সহিত তাহার আসক্তি ও ভালোবাসা থাকে না— কেবলই সেই রাগ ও সুরের মুহূর্তে সে তন্ময় থাকে।

টীকাঃ একজন তরবিয়ত খান জৌনপুরের ফৌজদার ছিলেন, যাহার সম্পর্কে মায়সর আলমগীরী পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, ১০৯৫ হিজরীতে তাহার মৃত্যু হয়। অন্য একজন তরবিয়ত খান ফকরুদ্দীন আহমদে বরলাস সম্পর্কে যিনি শাহজাহানের রাজত্বকালে অন্যতম উমরা ছিলেন— তারিখে মোহাম্মদীর রচয়িতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ১০৫২ অথবা ১০৫৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহুতায়াল্লাই ভাল জানেন, তিনি কোন তরবিয়ত খান ছিলেন।

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু—
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুঁজিয়া মরে
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

আল্লাহর এই ধরনের দাসানুদাসগণের অবস্থা পাগল ও আত্মহারার মত— বিশ্বে থাকিয়াও তাঁহারা বিশ্ব-বর্হিভূত, সৃষ্টির মাঝে থাকিয়াও তাঁহারা সৃষ্টির বাহিরে অবস্থান করেন। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বমাঝে এইসব লোক তবু রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্বের কারণে জগতের সমস্ত প্রাণীর স্থায়িত্ব বজায় রহিয়াছে। আসলে এই সমস্ত ব্যক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্যশালী ও প্রকৃত স্বাধীন— তাঁহারা না কোন লোকের সহিত সম্পর্ক রাখেন, না সম্পর্ক রাখেন নিজের কোন কামনা-বাসনার (নফসের) সহিত।

তোমার চোখের একটি মাত্র পলকে
কত রাজা-বাদশাহ হল ক্রীতদাস,
তোমার ঐ অধর ছোঁওয়া সুরা চেখে
কত জ্ঞানী হ'ল যে হায় পাগল খাস্ ।

যদি তাঁহাদের কোন মূলধন থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পবিত্র প্রভুই তাঁহাদের মূলধন। আর যদি কোন কথাবার্তা তাঁহারা বলিতে চান বা কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে চান, তাহাও সেই প্রভুর সহিত করেন।

তুমি ভাল জান কোথায় তোমাকে পৌঁছিতে হবে তা,
পথে যেতে যেতে ছিটকে কখনো পড় যদি দূরে
তাড়াতাড়ি উঠে পড় দেবী আর না করে অযথা
ফিরে যাও পুনঃ সেই গন্তব্যের সোজা পথ ধরে।

সেই সমস্ত বলবান জওয়ানদের জন্য দুঃখ হয়, আহা, তাহারা তাহাদের বুদ্ধি ও কলাকৌশলকে কেবল জাগতিক স্বার্থের ব্যাপারে নিয়োজিত রাখিয়া থাকে এবং এই রকম হীন প্রতারণামূলক কাজে আসক্ত হইয়া থাকে। তাহারা আসল ও অমূল্য মনি মুক্তাকে ত্যাগ করিয়া কতিপয় মৃৎপাত্র বিন্দু বিন্দু বারি দ্বারা পূর্ণ করিবার মোহে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আলোক সম্ভারে দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল, তাহার আসা-যাওয়ার পথ অত্যন্ত উন্মুক্ত ও প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মত নীচ মনোভাবাপন্ন লোকেরা এই অপরূপ সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে জন তোমার আসল প্রেমিক নিত্য যারে চাও
সে এইখানেতে থাকে তোমার দেখার চক্ষু নাই
রয়েছে সাজানো পান পাত্র পারনাক নিতে তাও
অন্ধের মত চলিছ যে শুধু, চলার লক্ষ্য নাই।

কবি বলিয়াছেন –

পাখি ডাকা ভোরে মনের কপাট খুলে তুমি এলে
ছন্দময় কথার বিন্যাস আহা কী যে ভাল লাগে
অপলকে চেয়ে আছি দেখ শরম-ভরম ভুলে
কেন রাখিলে ফিরায়ে মুখ, মনে যে জোয়ার জাগে।

তোমাদের মধ্যে যাহারা নৈকট্য প্রাপ্ত তাহাদের প্রতি জানাই সালাম।



মীর জিয়াউদ্দীন হোসেনের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৫৬

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহুতায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি
সালাম। তোমর মনোরম পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আমার প্রহরগুলি কেটেছে যেমন
তোমার কারণে নিবিড় সুখে-আনন্দে
উঠুক ভরিয়া তব প্রবাহিত ক্ষণ
মাতিয়া তেমন পুলক জোয়ার ছন্দে।

তুমি নিজের আমল সম্পর্কে যে হতাশা ও উৎকর্ষা ব্যক্ত করিয়াছ এবং
আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করার বিষয়ে
প্রাঞ্জলভাষায় বিষদভাবে যাহা লিখিয়াছ তাহা অবগত হইলাম। কোন সন্দেহ নাই
যে, নিজ আমলের ব্যাপারে নিরাশা ও উৎকর্ষা যত প্রকট হইবে আল্লাহর অনুগ্রহের

টীকাঃ ইনি হইতেছেন সেই মীর জিয়াউদ্দীন, যাঁহার সম্মানিত খেতাব (পদবী) ছিল
‘ইসলাম খান।’ অন্যত্র তাঁহার সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

মকতুবাতে মাসুমীয়া/১০১

উপর নির্ভরশীলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হজরত রাবেয়া বসরী র.কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, সমস্ত ব্যাপারে আপনার এত যে আশাভরসা তাহা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া আপনি পোষণ করেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, নিজের আমল সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার (এবং তাহার উপর কোন ভরসা না থাকার) কারণে।

এই পত্রে মৃত্যু ও পরকাল, মনিব-গৃহের বাসনা সম্পর্কে হৃদয়ের আকুতি এবং আল্লাহুতায়ালার সহিত সুন্দর ধারণা সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছ তাহা অত্যন্ত নেক ও মোবারক (মঙ্গল জনক ও কল্যাণ কর)। হাদীসে কুদসীতে আছে— “আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে রহিয়াছি”— এই সত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। ওয়াস্ সালাম।



মোহাম্মদ কাশফের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৫৭

গুরু করিলাম সেই পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহুতায়ালার নামে। অন্যান্য সমস্ত কিছুর দাসত্ব হইতে তিনি তোমাকে মুক্তি প্রদান করুন। “যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের (নিয়ামতের) পরিমাণ নির্ধারণ করিতে চাও, তাহা তুমি গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।” আল্লাহুতায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাগণের প্রতি আবহমানকাল হইতে চিরস্থায়ী দান ও পুরস্কার প্রবাহিত হইতেছে। যদি এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, স্বাভাবিক ও মৌলিক দানসমূহ এক মুহূর্তের জন্যও বান্দাগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন বান্দার নাম-নিশানা পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অতএব, বান্দার জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, এক লহমা অথবা চোখের পলকের জন্যও সেই মহান ও পবিত্র একত্ববাদের উৎস হইতে অমনোযোগী না হয় এবং নিজেকে যেন সে সেখানে হাজির রাখিয়া তাঁহার গুণ-গানে রত থাকে। ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অসম্মানজনক যে, মহান দাতা তাঁহার দানের হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, আর যাহার জন্য সেই অনুগ্রহ দান করা হইতেছে সে তাহার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে।

ক্ষণেকের তরে যে রয় গাফেল তাঁহার স্মরণ হতে,
ততক্ষণ শুধু ডুবে রয় সে যে গোপন-কুফরি স্রোতে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদিও অদৃশ্য লোকের (বাতেনের) জন্য নিজেকে স্থায়ীভাবে সর্বদা হাজির রাখা সম্ভব— এমন কি ইহা অত্যন্ত সত্য ঘটনা এবং আমাদের এই পদ্ধতিতে (তরিকায়) আল্লাহুতায়ালার দয়ার বিশেষ এই উচ্চমর্যাদা অতি সহজেই স্থায়ীভাবে হাসিল হইয়া থাকে এবং প্রারম্ভেই তাহা লাভ করা যায়— কিন্তু দৃশ্যতঃ এই সার্বক্ষণিক চিরস্থায়িত্ব অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এইজন্য যে, দৃশ্যমান দিকগুলি অহরহ নানা কাজের ঝঞ্জাটে জড়িত থাকে এবং এইসব কারণে স্থায়ীভাবে সর্বদা হাজির থাকার বিষয়ে অমনোযোগী না হইয়াও পারা যায় না। নিদ্রা হইতে এবং মানুষজনের সহিত মেলামেশায় নিয়োজিত রাখা হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। অবশ্য এই দৃষ্টিগ্রাহ্য গাফলতীর সহিত সৎ উদ্দেশ্যের সংযোগ স্থাপিত হইলে অমনোযোগিতা তখন সর্বক্ষণের জন্য উপস্থিতির উৎস হইয়া যায়— ক্লান্তি ও অবসাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই নিদ্রা তখন আনুগত্যের অন্তর্গত হইয়া যায়—‘আলেমগণের নিদ্রাও এবাদত’ এই উক্তি তুমি শুনিয়া থাকিবে। এইভাবে লোকজনের অধিকার ও দাবী পূরণ করার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত মেলামেশা করা শরীয়তের আদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে কোন ব্যক্তি যে কোন কাজ আল্লাহুতায়ালার আদেশের প্রতি অনুগত থাকিয়া পালন করিলে সে আল্লাহকে স্মরণকারী হিসাবে বিবেচিত হইবে।

এইভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়া সর্বক্ষণিকভাবে এবং চিরস্থায়ীভাবে হাজির থাকা বাহ্যিক ক্ষেত্রেও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে— আর তাহার ভাণ্ডে তখন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট (জাহের ও বাতেন) উভয়ক্ষেত্রে এই পরিচিতি ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় সাধন প্রশংসার ও সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

ওয়াস্ সালাম

www.AmarIslam.com

ISBN 70240-0025-0

www.AmarIslam.com